AYURVEDA BIJNAN PARISHAD

(Regd. under Act XXI of 1860)

Estd. 1931.

FOUNDER PRESIDENT
Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Majumder, M.A.
AYURVEDACHARYA

62, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta 7. 8. 1963.

THE AYURVEDA - BHARATI -

A MULTILINGUAL QUARTERLY JOURNAL

1ST YEAR, 1ST VOLUME

(Sraven, 1368 B.S. - Baisakha, 1369 B.S.)

with other matters.

Presented to :- Prof: Satish Chandra Ghosh, Offg. Vice-Chancellor, Calcutta University to find a suitable place in the glorious shelves of the University Library for use and reference by Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Majumder, M.A., Ayurvedacharya, Founder-Editor, Ayurveda-Bharati, Calcutta.

Bagala Kumar Majumder,

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.

আয়ুর্বেদ-ভারতী

(আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র)

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম. এ. আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়—৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা ৭৫ নঃ পঃ | শ্রাবণ ১৩৬৮ | বার্ষিক —সডাক ৬৲

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক—ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, এম, আর, এস

১৩৩৮ ও ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীকমলা কুমার মজুমদার

সহ-সভাপতি—কবিরাজ শ্রীতুলসীচরণ গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর সান্যাল

সদস্যবৃন্দ—কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ মজুমদার, কবিরাজ শ্রীপ্যারীলাল শর্ম্মা, ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

আয়ুর্বেদ-ভারতী সূচীপত্র—শ্রাবণ ১৩৩৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ভারতী-জাগরণ—		১
২। সম্পাদকীয়—		৩
৩। আয়ুর্বেদ প্রচারক যাত্রা—	অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	৬
৪। Antiquity of Ayurveda—	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭
৫। Heart Disease বা হৃদরোগ চিকিৎসা—	কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ	৯
	আয়ুর্বেদ-দুরবস্থা	১
৬। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষৎ—	কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ আয়ুর্বেদাচার্য্য, এ, এম, সি	১৪
৭। ভারতের অবনতীকালে 'আয়ুর্বেদের' ভূমিকা—	কবিরাজ শ্রীতুলসীচরণ গুপ্ত	১৭
৮। প্রজ্ঞা—	কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮
৯। ইংরাজী চিঠির বাংলা অনুবাদ—	কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র নাথ অধ্যাপক, বাঙ্গিবীভূষণ প্রাচ্য আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়	২১
১০। গীতায় আয়ুর্বেদ—	অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী এম, এ	২৪
১১। দুষ্টব্রণ বা সর্পদষ্ট চিকিৎসা—(চরকপাঠি)		২৭
১২। আয়ুর্বেদের উক্তি—(প্রাচীনাচার্য)		২৮
১৩। শিরোরোগ ও তাহার প্রতিকার—	ডাক্তারী কবিরাজ শ্রীকমলাকুমার মজুমদার এম, এ আয়ুর্বেদাচার্য	২৯
১৪। মন্তব্য, কবিতা ইত্যাদি—		৩৩

আয়ুর্বেদ-ভারতীর নিয়মাবলী

১। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' মূলত ও প্রধানত আয়ুর্বিজ্ঞানের কথা-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ও যথাসম্ভব উহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। উহার বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৭৫ নং পঃ।

৩। বাঙ্গলা বৎসর অনুসারে উহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে উহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সম্পাদক "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad. *Baidyanath* medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE

Baidyanath

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD.

CALCUTTA • PATNA • JHANSI • NAGPUR • ALLAHABAD

Use

DABUR

AYURVEDIC MEDICINE

DABUR (DR. S.K. BURMAN) PRIVATE LTD.

স্মরণাতীত কাল হইতে

স্মরণাতীতকাল হইতে কুন্তলীন মাথরোগের অমোঘ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার বহুবিধ গুণাবলী প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথা সকলেই জানেন। আমাদের মহাভৃঙ্গরাজ তৈল উৎকৃষ্ট উপাদানাদি সংযোগে সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত প্রণালীতে বিশেষজ্ঞের নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। কাজেই ইহার বিশুদ্ধতা ও উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এ, বি, এস, (লণ্ডন) এফ, বি, এস (আয়ুর্বেদিয়া) ভারতের সকলের সম্মান লাভের যুগযুগী অধ্যাপক।

আয়ুর্বেদ-ভারতী

"যো দেবো অগ্নৌ, যো দেবো অপ্সু,
য দেবো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

ত্রৈমাসিক
১ম বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৬৮

১ম সংখ্যা
জুলাই, ১৯৬১

শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ এস. রাধাকৃষ্ণান্
লিখিতেছেন :

Vice-President
India,
New Delhi.
Camp Madras,
The 14th April, 1961.

My dear Sri Majumdar,

It is good to know that you are starting a quarterly Journal early in June.* There are many Magazines now for the cause of spreading knowledge of Ayurveda and I hope your Journal will also contribute to the spread of knowledge and practice of Ayurveda.

Yours Sincerely,
(Sd./) S. Radhakrishnan

Kaviraj Bagala Kumar Majumdar
Ayurveda Bijnan Parishad,
52. Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-9.

* অনিবার্যকারণবশতঃ আষাঢ় মাসে বাহির হইল।
সম্পাদক

৪ঠা আগষ্ট, ১৯৬১

জাতীয় অধ্যাপক

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, এস্‌. আর্‌. এস্‌ মহোদয়

লিখিতেছেন—

কবিরাজ শ্রীবলাইকুমার মজুমদার, এম্‌. এ

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, আয়ুর্বেদ-ভারতী

কবিরাজ মহাশয়,

বাংলার কবি গেয়েছিলেন—

'বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।'

আজকে বন্য জন্তুদের হয়ত স্বপনে এনেছে বাঙালী কিন্তু রোগে ও অনশনে সে জর-জর। গায় জলবৃদ্ধি করে যেখানে, সেখানকার মাটি থেকেই রস টানে—আলো ঘিরেই চলার সৃজনের কাজ। সেই পরিবেশের জল-হাওয়াই যোগায় তার ঘাস-ফসল। গাছের বিষয়ে যা খাটেছে সব প্রাণীর বেলাও প্রকৃতির সেই নিয়ম গুলো খাটবে—এই মেনে নেওয়া ও সেই মত চলাই সত্যকারের স্বধর্ম।

যেখানে আহার সেইখানেই ঔষধ মিলবে, অন্যথা প্রাণরাধা প্রাণান্তকর হয়ে দাড়ায়। আমার মনে হয়, সেই বিশ্বাস থেকেই আয়ুর্বেদের উৎপত্তি। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, জীবক, নাগার্জুন প্রভৃতি পূর্বাচার্যরা সকলে সেই সাধনাই করেছেন—যে দেশের মাটি-ফসলে গাছ-গাছড়ার নির্যাসেই সব রোগের উপশম হবে।

এ দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশের আহার হতে দেখেই ঐদিকে ঝুঁকেছিলেন। অন্য দিকে নষ্ট পুঁথির উদ্ধার, দেশের চিরাগত বিধি ব্যবস্থাকে বর্তমানের উপযোগী করে তুলে রোগ শান্তির ব্যবস্থা করা। তাই আজকে আপনি 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রকাশ করে অনুসন্ধান ও প্রচারকার্যে আত্মদান করেছেন শুনে আমার মনে আশা জেগেছে। এটা জরুরী-কর্তব্য বলে আমি মনে করি। মহাযুদ্ধের পর থেকে আমরা বুঝেছি—প্রয়োজন কত আবশ্যিক, তবে সঙ্গে সঙ্গে চাই সত্য ভাষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন সমুদ্র পারের জাহাজ আসার দিকে চেয়ে থাকা ভুল, তেমনি দেবদত্তর ঘরিয়া আমাদের জন্য সব লিখে গেছেন, বলে গেছেন শেষ কথাটি পর্যন্ত সব বিষয়ে—এই স্থির বিশ্বাস সম্বল করে আজকাল আয়ুর্বেদ প্রকারে নানা ভুল হবে। এখন চাই নির্ভীক সত্যানুরক্ত চোখ, চাই দুর্জয়ের অনুসন্ধানের উত্তেজনা, কর্তব্যে ধৃতি।

'হারুন-অল-রসীদের দরবারে এ দেশী কবিরাজী চলবে'—যা পাশ্চাত্য প্রাচ্য-বৈজ্ঞানিকদের এ কাজের হাতেখড়ি আমরা বুঝিয়ে এসেছি অশোকের সময় থেকে, এই বলে বসে থাকলে চলবে না। বহু যুগের অবহেলার ফলে এরা ভুল হয়েছে সেই মৌলিক যুক্তির মূলে যার ওপর বেড়ে উঠেছিল পূর্বের এই প্রশস্ত শাস্ত্র।

পূর্বাচার্যরা সত্যের যুক্ত হ'য়ে কাজ করতেন, তাই অনেক সময়ে ভুলসংস্কারে যুক্ত সমাজে তাদের নানা কুকথা রয়েছে। তাদের শুভবুদ্ধি সে সব আচারকে ঠেলে উঠিয়ে দিয়েছে—তাদের সত্য অনুসন্ধানে তা বিরতি ঘটায় নি।

পুরানো সে সব কথা আমরা পুরা জানি না, সেই ইতিকথা আপনারা প্রকাশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে সব দেশেই এখন যেমন আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের অভিযান চলেছে, আপনারাও আপনাদের পথে যুক্ত পুঁথি নিয়ে অগ্রসর হবা। জয় স্থির জানুন।

'নাস্ত পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' এই কটি কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

আপনি আয়ুর্বেদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন—আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে এতে, কারণ আমি চাই আবার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এদেশে প্রতিষ্ঠা। ইতি

আপনার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

সত্যেন বোস

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিতেছেন—

আয়ুর্বেদ আমাদিগের প্রত্যক্ষ শাস্ত্রসমূহের অন্যতম। ইহা বহু ভারতীয় মনীষীর গবেষণা ও সাধনার লব্ধধারায়। সেই আধারে প্রবেশ করিলে কি অমূল্য রত্ন পাওয়া যায় তাহা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেখাইয়া দিয়াছেন। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। এইরূপ পত্র বর্তমান কালোপযোগী করিবার জন্য যাহা যাহা করা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রয়োজন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

আমি এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। ইতি

শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

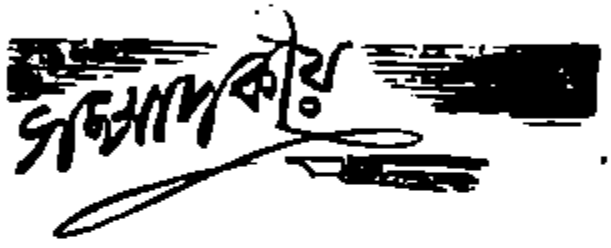

এই শুভক্ষণে আয়ুর্বেদ-ভারতীর আবির্ভাব আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য ও গবেষণা, জ্ঞানসন্ধান ও সংস্কৃতির অনুশীলনের সমস্ত ইতিহি পূজা করে। মহানিশার অন্ধকারে পথিক যেতে যেতে যেমন প্রভাতে রবির ঈষৎ ঔজ্জ্বল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে অনাবিষ্কৃত দেশের সন্ধানে, তেমনি ইহা দুর্যোগের অবসানে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিশারিদিগের দেখা দিয়েছে। আয়ুর্বেদ-ভারতী শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও সংবাদ সরবরাহের বৈমাসিক হবে না, দেহ ও মন, আত্মা ও পরমার্থ, জীব ও জগৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে নিত্য অনুসন্ধিৎসা, বিচার বিশ্লেষণ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দোলায় বাস্তির স্পর্শে উদ্ভাসিত বিজ্ঞান-মনের সত্যানুভূতি জীবন ও সমাজ, দেশ ও বিদেশের উন্নতির পথে প্রদীপ্ত হবে।

যুগে যুগে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঢেউ বিশ্বের নানা স্তরে বিস্তৃতি লাভ করে। চলবার পথে অনেক কিছু নষ্ট হয়, অজ্ঞাত হয়ে যায় প্রকাশের অন্তরে—যা কিছু পলিমাটি বিস্মৃতির উর্বীপল্ল ও অনুর্বর ক্ষেত্র সমৃদ্ধ করে দিয়ে যায়। সেই অতীতের জ্ঞানরাশি ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ধারা দিয়ে। জ্ঞান-পথিকের অভিযানে চলেছে বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট আয়োজন হ'তে পারীর বুদ্ধিতে ও বিচিত্র প্রকাশ থেকে পাঁচের সাধারণের সুরে গানে, শিল্পে, আলপনায়, ভাবে ও কর্মে দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের নানা খেলার মধ্যে। জীবন-নদীর স্রোত যে খোলা দিয়ে যায় অনুভবে বাহিরে, তাতে অনুরিত হয় ফুলফল, ফুটে ওঠে ফুল-কলি- ফুলে ফুলে ঐশ্বর্যের বিলাস সাজিয়ে রেখে; নিরস, নিরানন্দ জীবনে অনন্তের বাঁশি বাজে, সঙ্কীর্ণ চেতনার গণ্ডী হ'তে বিচিত্র প্রকাশের মোহনায় মিলিত হয়ে ওঠে। একদিকে প্রসারিত করে সুন্দরের সুষমা, অন্য দিকে জগতের তাণ্ডবলীলায় কাছে এনে দেয়। কবি এই বিচিত্র প্রকাশকে হৃদয়ে বেঁধে রাখে, বিজ্ঞানী সেখানে বিশ্লেষণের ছুরিকা

ধরিয়ে দেয় অন্তর্নিহিত সত্য প্রত্যক্ষীভূত করবার জন্য।

আয়ুর্বেদ-ভারতী যেন আজ পারাপারের তরণীর মত জ্ঞান-পারাবারের সরণি—পশ্চাতে অনন্ত অতীত, সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ, তার মাঝে এপরিসর বর্তমানের হিসাব নিকাশ অতীতের দিকে ছুটে চলেছে নবীন ভবিষ্যতের আসন রচনার জন্য। এখন আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য বিস্মৃতিগর্ভে হারিয়ে পড়েছিল। তার চিহ্ন কেবল ভারতবর্ষে নয়, পাশ্চাত্যে, মধ্য এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়। তার জন্য শ্রোতকে আবার প্রবাহিত করতে হবে—বাস্তিকাশ্য জ্ঞানকল্পকে উন্মুক্ত করতে হবে লোক কল্যাণে, রোগ নিরাময়ে, মানসিক ও পারমার্থিক শান্তিবিধানে। এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণ ও সরকারের ভারতীয়বোধে কবিরাজদের সত্যানুসন্ধিৎসা, ত্যাগ ও একতা, চিকিৎসা বিজ্ঞানী—যারা চির সত্যকে জাগ্রত করতে, অজানাকে জানার গভীর মধ্যে আনতে, সর্বোপরি মন্ত্র নিষ্ফলতা ও পরাকৃতির বন্ধন করে নিষ্ঠা ও সাধনার নিঃস্বার্থ প্রেরণাসঞ্চারে নিরলসভাবে জ্ঞান ব্রত উদযাপনে বদ্ধপরিকর হবে। আয়ুর্বেদ-ভারতী হবে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র প্রকাশের প্রতীক—বিজ্ঞানের সমন্বয়ন, মূলত আয়ুর্বিজ্ঞানের বাহন হলেও।

পৃথিবীর প্রত্যন্ত দূরে জ্ঞানসুধার জন্য যারা উন্মেষন করে সত্যসন্ধানী জীব ও প্রকৃতির সীমাহীন সম্ভাবনাকে কত বিচিত্ররূপে অনুশীলন করেছেন—সামগ্রিক, বিশ্লেষণাত্মক ও ক্রিয়াগত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নদেশে, এমন কি, একই দেশে কত বিচিত্র প্রকাশ! মৌন প্রকৃতির বিশাল ও বিবিধ গ্রন্থের অজানা পৃষ্ঠায় কত চিত্র বিচিত্র -কত সত্য ও ঘটনার বিভিন্ন বাস্তবীয় অপলকে চলেছে, কত রোগশোক মর্মব্যথা জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে। আর দিকে মনোজগতের বর্ণনবৈচিত্র্যে বিস্মিত বৈদিক ঋষিগণ ধ্যানমগ্ন। আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ধন্বন্তরি চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, ভৃগুবন, বসুস্থলি, জীবক, কাশ্যপ আরও অন্যান্য ঋষি-বৈজ্ঞানিক - যারা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন, তারা আয়ুর্বিজ্ঞানের জন্ম ও আবিষ্কারে জীবনপাত করেছেন। বেদের আয়ুর্বেদের সৃষ্টিধর্মী প্রয়াস, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গবেষণা এঁদেরই। তারপরে এলেন ভাবমিশ্র, মাধবকর, বিজয়রক্ষিত, চক্রপাণি, শিবদাস সেন, গঙ্গাধর, রমানাথ প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের পথের অনুসরণ করে।

আমরা এঁদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আরও স্মরণ করি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকা নাথ সেন, বিজয়রত্ন সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, পঞ্চানন রায়, প্যারীমোহন সেন, ভগবান কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, যামিনীভূষণ রায়, হারাণ চন্দ্র চক্রবর্তী, ভামাদাস বাচস্পতি, কৈলাসচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্র নাথ সেন, যোগেন্দ্র নাথ সেন, যামিনী নাথ সেন, পার্বতীচরণ গণেশর্ষি, সলিল কবিসাগর শ্রীসত্য সেন প্রভৃতি দেশবিদেশ ও বিদেশ শতাব্দীর আয়ুর্বেদাচার্যদলকে—লোক কল্যাণে আয়ুর্বেদের পুনরুত্থানের অভিযানে তাঁদের আশীর্বাদ কামনায়।

বিভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি, এমন কি, ইহাদিগকে অতিক্রম করে আয়ুর্বেদ যে সহস্র সহস্র বৎসর অপ্রতিহতভাবে ও কৃতকার্যতার সহিত দেশের ও দশের সেবা করে আসছে, এ তার বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ধারা ও রীতির জন্য—যা দেহ-বিশ্লেষণে, দ্রব্য-বিচারে, রোগনির্ণয়ে, ঔষধপথ্যে, আত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষে, ঔষধ নির্মাণে, চিকিৎসা ও অনুশীলন প্রভৃতিতে পরমাশ্চর্য ফল প্রদর্শন করেছে। আয়ুর্বেদ-ভারতী অতীতের ঐশ্বর্য স্মরণ করে ভাবী অনুশীলনের ভবিষ্যতের নব নব আবিষ্কারের প্রয়োগে ও প্রচারে পীড়িত জনতার কল্যাণ সাধন

অর্জে যেন পারে—চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন সুব্যবস্থাগুলো জাতির দেহ ও মনকে সবল, সুস্থ ও রোগহীন রাখতে পারে, ইহাই প্রার্থনা। ইহা প্রচার করবে স্বাস্থ্যের বাণী, কল্যাণের বাণী, মৈত্রীর বাণী; সঙ্কলন করবে পুরাতন পুঁথি ও গ্রন্থে লিখিত তথ্যাদি—দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালী, মুষ্টিযোগ, ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা। প্রয়োজন হলে সাঙ্কেতিক অর্থে হবে দেশ-কালপাত্রভেদে অন্য বিজ্ঞানের দান অব্যাহত রেখে আয়ুর্বেদের নীতি ও বৈশিষ্ট্য। মত অনুকরণের নাগ-পাশে চিকিৎসকের স্বাভাবিক প্রগতি ও ঔৎসুক্য আড়ষ্ট করবে না—আধুনিকের কৌলিন্যের চাপে সে আত্ম-হারা হবে না। কারণ সর্বত্রই সাময়িক রীতিনয়ই আয়ুর্বেদের প্রাণ এবং জীব ও জড় জগতের মূলাধার।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের কর্মবিপুলতা ও জনকল্যাণের ইতিবৃত্ত ইহাতে ক্রমান্বয় প্রকাশিত হবে—কেমন করে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী জ্ঞানসমুদ্রের দিকে একটু একটু করে প্রধাবিত হয়েছে এবং তারতের অন্যান্য স্থানে আয়ুর্বেদের নিয়মন প্রচেষ্টা ও গবেষণাদির সংবাদ।

অন্যান্য প্রদেশে ভাল হোক, মন্দ হোক, সরকার আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা করেছেন। বহু-বিলম্বিত হ'লেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত প্রস্তাবিত 'আয়ুর্বেদ বিল' অনুসারে আয়ুর্বেদের সর্বতোমুখী উন্নতি সাধন অর্জে উদ্যোগী হওয়া। কিন্তু বিলের সঙ্কীর্ণ পথে যদি আয়ুর্বেদের স্বাভাবিক গতি, প্রকৃতি ও প্রসার সীমাবদ্ধ হয়, কবিরাজদের স্বাধীন চিন্তা, কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়, তবে আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদসেবীদের স্বাধীনভাবে পথ খুঁজে চলাই সমীচীন। সরকারী কি বেসরকারী, আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের কোন উন্নয়ই কৃত্রিম কবিরাজদের ত্যাগপূত কর্ম ও সাধনা ব্যতিরেকে উন্নতি লাভ অর্জে পারে না।

১৯৬১ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়, কেন না, এই বৎসরেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, বাঙ্গালোরা মহিলাল নেহেরু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণের শতবর্ষ পূর্তি হ'ল। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শনের জন্য আমরা উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ এস, রাধাকৃষ্ণান, ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালিপদ বিদ্যাবাগীশ, ডাঃ শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি শ্রীমতী রাইচু, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীডি, পি, কারমারকার, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীআতরেয় শাস্ত্রী, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহন লাল সুখাড়িয়া, সভাপতি শ্রী বি, ডি, গিরি, সভাপতি শ্রীসাত্তিখিল, উপাচার্য শ্রীবি, কে, গুহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ বসু রায়, অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র কর, অধ্যাপক শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ষড়দর্শনতীর্থ, শ্রীঅনিলরঞ্জন সেন, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত, ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন রায়, ডাঃ শ্রীবীরেন চন্দ্র গুহ, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রভৃতিকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর যারা এর বৎসর পরিষদের নানা কাজের সহিত জড়িত রয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং জনসাধারণ ও বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ—সকলকে আজ আয়ুর্বেদ-ভারতী প্রকাশের শুভদিনে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আমরা তাঁদের সহানুভূতি, সদিচ্ছা, সাহায্য ও প্রেরণা লাভে বঞ্চিত হব না।

—বঙ্গেশ্বরম্

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করে যে সব মনীষী তাঁদের চিন্তা, জ্ঞান ও কর্মের প্রভাবে সমগ্র বাংলা এবং তারও ছাড়ে এক নব ভাবলোকের সাড়া নিয়ে এসেছিলেন এবং যাঁদের আমরা আজ আধুনিক বাংলা ও আধুনিক ভারত গঠনের অগ্রদূত হিসাবে শ্রদ্ধার ও নমস্য মনে করি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। দেশের ও দশের সেবা এবং প্রেম ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী—রসায়ন বিজ্ঞানে ছিল তাঁর বিশেষ অধিকার এবং কৃতিত্ব। বিজ্ঞানের সাধনা আজও তাঁর উপজীবিকার অবলম্বন ছিল বটে, কিন্তু আসলে তিনি বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছিলেন দেশের ও সমাজের সেবায়, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে। তাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠী, তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্যে। পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজে আজ ভারতীয় রসায়নিকেরা যে কৃতিত্ব লাভ করেছেন তিনিই হলেন তার পথিকৃৎ। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির গঠনের মূলেও ছিল তাঁর প্রধান প্রেরণা। তাই তিনি আজ ভারতে রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদাতা হিসাবে সর্বত্র পরিচিত। প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চার ইতিহাস—হিন্দু রসায়নী বিদ্যার ইতিহাস প্রণয়ন করে, কালের অন্ধকার গর্ভে বিলীনপ্রায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে তিনি স্যাভিলাভ করেছেন দেশে বিদেশে এবং আমাদের জাতীয় গৌরবকে পৃথিবীর ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তার অকাট্য প্রমাণে।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত হিন্দুরসায়নের ইতিহাস হতে আমরা জানতে পেরেছি যে প্রাচীন ভারতেই প্রথম ইস্পাত প্রস্তুতের প্রণালীর আবিষ্কার হয় এবং এই ইস্পাত গুলানি হ'ত এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য প্রদেশে, সিরিয়া ও ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রাচীন ডামাস্কাস শ্রেষ্ঠ যা অলোয়ার ফলকের যে প্রসিদ্ধি ছিল, তা তৈয়ারি হ'ত এই ভারতজাত ইস্পাত হ'তে।

খনিজ পদার্থ হ'তে দস্তা বা যস্ত ধাতুর বিজ্ঞানও প্রথম ভারতীয় আবিষ্কার, এ খবর ও আমরা পেয়েছি হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে। সুশ্রুত সংহিতায় যে মূষাকার ও ঠাঁড়াকার প্রস্তুত প্রণালীর বর্ণনা আছে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেখিয়েছেন যে তার সঙ্গে আধুনিক মোচা ও ক্রুসিব্‌ল প্রস্তুতপ্রণালী হুবহু মিলে।

লাল রঙের লবণাম্লের আরকিটিরিক লালকাউড, (গন্ধক ও পারদঘটিত যৌগিক)—যা সিঁদুর ও অন্যরকম নামে কবিরাজেরা ব্যবহার করেন বিশেষ উপকারী ঔষধ হিসাবে—এরও প্রস্তুত-প্রণালী প্রথম আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু রসবিজ্ঞানীরা। আমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠাকল্পে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত হিন্দু রসায়নী বিদ্যার ইতিহাস এ কারণে একটি বিশেষ অবদান বলিয়া স্বীকার করতে হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা কখনো আবদ্ধ ছিল না। তিনি তাঁর রসায়ন বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অর্থে রূপায়িত করেছেন যেমন যে মিত্তল এণ্ড কার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে—দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য। এ কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধ।

হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হচ্ছে এ কারখানা হইতে। ভারতবর্ষে বাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠারও তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং পথিকৃৎ।

মাতৃভাষার মেথলিক্তর ভাণ্ডে, ভূমিজ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগে প্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যকল্পে প্রফুল্লচন্দ্র দিতেন প্রথম সাড়া মেডিক্স গ্রহণ করতেন তাদের দুঃখমোচনে।

সমাজের মারাত্মক দুর্নীতি ও নিষ্ঠুর প্রথার সংস্কারকল্পে তিনি তাঁর বহু ভাষণে ও প্রবন্ধে আজীবন কঠোর প্রতিবাদ প্রচার করে গেছেন।

স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি ছিলেন বীরত্ব ব্যঞ্জক কর্মী। তাই বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র কাঁপ দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ করে অসহযোগ আন্দোলনের সময় চরকা ও খদ্দর প্রচারে।

চিরকুমার প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সাধারণের লোক। সাধারণের সঙ্গে আপন সত্তাকে বিলীন করে, আপন স্বার্থকে পরার্থের সঙ্গে অভিন্ন করে তিনি করেছিলেন পরমার্থের সন্ধান। আহারে বিহারে, চালে চলনে, তিনি দেশী এবং তাদেরকে করেছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শ। জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন তার বেশির ভাগই তিনি দান করে গেছেন দেশের ও দশের মঙ্গলে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সিটী কলেজ, বাঙ্গের ছাই কলেজ প্রভৃতি নানা শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে, বহু দরিদ্র ছাত্রের সাহায্যকল্পে, খাদি ও নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে, ইত্যাদি।

বিদ্যাব্রতী প্রফুল্লচন্দ্র গুরুশিষ্য সম্বন্ধের দিক হতে এবং ত্যাগ ও সেবার আদর্শে ছিলেন প্রাচীন ভারতের ঋষি-গুরুর প্রতীক। আজ স্বাধীন ভারতে প্রফুল্লচন্দ্রের মত ত্যাগী ও মহতী মনীষীর অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করতে পারি। কিন্তু তিনি তাঁর বাণী এবং মহাজীবনের মহান ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যার আলোকে আমরা কল্যাণের পথে চলতে পারি। কিন্তু চলবে কে এখন আমাদের। আজ তাঁর অন্তরঙ্গবাহিকা তিনিতে তাই প্রশ্ন উঠে সে পথে চলবার আগ্রহ কি আমাদের আছে? তা যা হলে এ অন্তরঙ্গবাহিকা চিরদিন চলু আকাশ ও বহুদূরেই পর্যবসিত হবে।

Antiquity of Ayurveda

By

Dr. Radha Kumud Mookerji

The antiquity of Ayurveda is wrapped up in obscurity. The dates of the founders of this science like Charaka and Suśruta cannot be ascertained with certainty. An early Ayurvedic teacher who lived in the sixth century B.C. is known as Medhatithi Gautama whose work on Anvikshiki contains medical doctrines which are utilised in the Charaka-Samnhita, and also in the Nyaya-Sutra of Akshapada. According to tradition, it was Punarvasu Atreya who was the original author of Ayurveda-Samnhita. Much light is thrown on the antiquity of Ayurveda by the literature of early Buddhism, a source not properly utilised by students of Ayurveda who attend more to its sanskrit sources. As Rhys Davids points out in his American Lectures (pp. 57, 587, "a very fair insight into a good deal of medical lore current at

that early age, that is about 400 B.C.", is afforded by the Buddhist texts. The Buddhist canonical texts give interesting concrete details of the medical career of a most successful physician of the country in the time of the Buddha (C. 623—593 B.C.) named Jivaka who was the physician in attendance on him and his brotherhood (Sangha). Jivaka Komara Bhachcha (specialist in Kumara-bhritya i.e. children's diseases) who was proficient in both medicine and surgery and had calls from the aristocracy of different cities like Saketa, Banaras and Ujjaiyini to treat difficult diseases such as chronic head-disease, fistula and a disease of the brain upon which he successfully performed a surgical operation ; entanglement of intestines which was cured by a difficult operation by which "he cut through the skin of the belly and drew out the twisted intestines which he showed to the patient's wife". He "disentangled the twisted intestines, put them back into their right position, and stitched the skin with a disinfectant". He next treated King Pajjota of Ujjeni for his jaundice. He cured the Buddha of his chronic constipation by the smelling of medicated lotuses.

We next find a crop of valuable evidences as to the progress of Ayurveda in the Greek texts of the time of Alexander who had experience of it during his campaigns in the Punjab (about 325 B.C.). The Greek writers testify to the practice of medicine by Indian learned men who generally preferred to cure diseases by diet rather than drugs. They specialised in subjects like physiology and pharmacy. "Of medicines, they attach greater value to those applied externally than to drugs. The remedies most esteemed are ointments and plasters".

When we come to the time of Emperor Asoka (B. C. C. 274—235), we get for the first time definite, concrete and chronological evidence as to the remarkable progress achieved by India in Ayurveda or Science of life. He devoted himself to the humanitarian mission of relieving the suffering of living beings by promoting all possible measures of treatment of diseases of both man and animals (Manushya-Chikitsa and Pashu-Chikitsa, as stated in his Rock Edict II) by the establishment of hospitals, both general and veterinary under trained medical personnel. He was equally attentive to the need of making available in the country stores of medicine by first building up plantations of medicinal plants as its sources in the shape and forms of herbs, roots (Mula) and fruits (Phala) and, secondly, by instituting the necessary pharmaceutical works for the manufacture of Ayurvedic medicines on the basis of these botanical sources. After thus laying the foundation of Ayurvedic science and practice in these medical plantations and pharmacies,

(পরবর্তী ৯৩ পৃষ্ঠায়)

Heart Disease বা হৃদ্‌রোগ চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, আয়ুর্বেদ-রত্নপতি

আধুনিক যুগে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার বহুবিধ কারণ আছে। প্রধান কারণ অলস এবং অধিকাশা, যাহার উৎপত্তি হইয়াছে তেজাল খাদ্য গ্রহণ হইতে। অবশ্য প্রকৃতির পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও ইহার একটী অন্যতম প্রধান কারণ। তাহা ছাড়া আয়ুর্বেদমতে হৃদরোগের প্রধান কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। ইহা ছাড়াও শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহার, বিহার ও ব্যবহারে কৃত্রিমতা এবং মনের ভাবকে প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া রাখা ইত্যাদি কারণে হৃদরোগের আক্রমণ ঘটিয়া থাকে।

সচরাচর চারি প্রকারের হৃদরোগ দৃষ্ট হয়। উহাদের নাম—ধমনীসিদ। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত করোনারি এবং সেরিব্রাল। অপরটি ব্লাডপ্রেসার, উহা আবার দুইভাগে বিভক্ত হাই ব্লাডপ্রেসার এবং লো ব্লাডপ্রেসার।

রক্তের রক্তের আবার বলিয়া সকল প্রকার হৃদরোগেই রক্তধাতুর বিকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতপক্ষে উক্ত চারিপ্রকার হৃদরোগের উৎপত্তির হেতু পিত্তবিকৃতি। চক্ষুর মতে রক্ত ও পিত্তের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। সেইজন্য চরক সুশ্রুতের মত রক্তকে দোষ বলিয়া পৃথকভাবে গ্রহণ করেন নাই। আয়ুর্বেদ মতে কফ এবং পিত্ত পঙ্গু। মানবশরীরে উহারা স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারে না। যেমন যেমন বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বর্ষণ করে, সেরূপ সেরূপভাবে পিত্ত এবং কফ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া রোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে। বায়ু কর্তৃক চালিত হইবার পূর্বে কফ অথবা পিত্তের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। বিকৃতি না ঘটা পর্যন্ত বায়ু উহাদের কাহারও সহায়তা করে না। পিত্ত এবং কফের যে কোন একটী বায়ু বিকারগ্রস্ত হওয়ামাত্রই বায়ু তাহাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়। এই জন্য সাধারণ লোক বা চিকিৎসকগণ বায়ুকেই রোগের কারণ হিসাবে মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বায়ু রোগোৎপাদক দোষদ্বয়ের বাহক এবং বাহক হইয়া থাকে। মনে করুন, এক গ্রামে তিনজন লোক বাস করে। উহাদের মধ্যে একজনের নাম বায়ু, একজনের নাম কফ এবং অন্যজনের নাম পিত্ত। উহাদের মধ্যে পিত্ত এবং কফ সহোদর ভাই। যে কোন কারণেই হউক দুই ভায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। এমন সময় যাহার দোষ বেশী কিম্বা যে বেশী অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছে বা যাহার আক্রোশ বেশী, তাহার নিকট বায়ু গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাকে নানা প্রকার সলাপরামর্শ দিয়া আদালতে নালিশ রুজু করিবার জন্য লইয়া আসিল। বায়ুর পরামর্শ অনুসারে কার্য করিয়া পিত্ত বহু পরিমাণে অত্যাচারগ্রস্ত হইল এবং তাহার পর যখন চিন্তা করিল ঘরে ঘরে লড়াই করিয়া পরের সেই জমানো কোনক্রমেই সমীচীন নহে, তখন দুই ভাইএ আপোষ করিয়া নিজের ঘরে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করিবার পূর্বে রোগোৎপাদক দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি সর্বাগ্রে সেই দোষের বিবৃদ্ধি কমান যায়, তাহা হইলে তাহার সহযোগকারী দোষগণ সেইস্থান ত্যাগ করিয়া থাকে, এবং সহজেই রোগের উপশম

হইয়া থাকে। হাইপ্রাডপ্রেসার রোগে শিরের আবিকা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং বায়ু তাহার সহিত যোগ দিয়া নাড়ীর গতি বর্দ্ধিত করে। হাইপ্রাডপ্রেসার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা কালে সবলসহযে অনুভূত হয় যেন তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। লোপ্রাডপ্রেসার ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে এবং নাড়ীর গতি অনামিকা অঙ্গুলিতে অনুভূত হইয়া থাকে। হাই এবং লো ব্লাডপ্রেসার উভয়বিধ ব্যাধিই অতিশয় মারাত্মক। উভয়বিধ ব্যাধিই অদূর ভবিষ্যতে ভাবী অনিষ্টের সূচক। এই বিষয় ভারতীয় নাড়ী বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের দুইটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। উহাদের একটী "দুর্বলে সবলা নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা" এবং অন্যটি "সবলে দুর্বলা নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা"। হঠাৎ দুর্বল রোগীর নাড়ী অতিশয় দ্রুতগতিতে চলিলে উহা ভাবী অনিষ্টের দ্যোতক এবং সবল রোগীর নাড়ী অতিশয় মন্দ গতিতে চলিলে অর্থাৎ বায়ু স্থানচ্যুত এবং হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে উহাও ভাবী অনিষ্টের দ্যোতক হইয়া থাকে। এই উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আহার বিহারাদির অসাবধানের ফলে রোগীর জীবনীশক্তি এবং তৎসঙ্গে পাচকাগ্নি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে রোগীর বায়ু এবং পিত্ত উভয়ই বর্দ্ধিত হইয়া বিকৃত হইয়া থাকে এবং লো ব্লাডপ্রেসারে বায়ু এবং পিত্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আম কফের বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এই উভয়বিধ অবস্থাই অতিশয় বেদনাদায়ক, এবং শরীর গঠন প্রণালীর ব্যত্যয়কারক।

মানুষের এতদ্বিধ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কবি রজনীকান্ত গাহিয়াছেন

"ও তোর আসছে যে সেদিন,
যেদিন কফের নাড়ী উঠবে জেগে
বায়ু পিত্ত কাঁপ।"

হাই ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসা—সাধারণতঃ বিকৃত পিত্তের চিকিৎসা করিলে হাই ব্লাডপ্রেসার প্রশমিত হইয়া থাকে। পূর্বে বলিয়াছি, সর্বপ্রকার জ্বররোগই বিশেষভাবে পিত্তানুগত বা রক্তানুগত রোগ। শাস্ত্রে লিখিত আছে—"পিত্তে বিরেচনম্" অর্থাৎ পিত্তরোগ নাশ করিবার পক্ষে বিরেচনই সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। সুতরাং হাই ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিরেচনগুলি সবিশেষ উপকারী, যথা—

(১) হরীতকী ১ তোলা, সোনামুখীর পাতা ½ তোলা, মনাক্কা ½ তোলা একত্রে আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে অতিশয় ক্রুর কোষ্ঠ ব্যক্তিরও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

(২) কোষ্ঠ অতিশয় ক্রুর হইলে নিম্নলিখিত পাচন সেবা—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ভেটকী, বড়ী, কটকী, শুঁঠ, সোঁদাল, এরণ্ডমূল, মনাক্কা, সোনামুখী প্রত্যেকটী তিন আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবা।

উহার সহিত পিত্ত শান্তির জন্য শতমূলীর রস ও মধু সহিত কুরুং চিরায়তি নামক ঔষধ সেবা।

কুরুং চিরায়তি প্রস্তুতবিধি :—স্বর্ণসিন্দুর ১ ভাগ, মধুতুলস ১ ভাগ ও স্বর্ণগৈরিক ১ ভাগ একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে।

হাই ব্লাডপ্রেসারে শিরঃপীড়া ও ঘাড়ে বেদনা থাকিলে ব্রাহ্মী শাকের রস ১ তোলা ও মধু সিকি তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবা।

তুলসীপাতা ও গুলঞ্চের রস চিনির সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এই রোগের অপর উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রবালপঞ্চক। অনুপান দুগ্ধ ও মধু।

প্রবালপঞ্চক প্রস্তুতবিধি: প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, মুক্তাভস্ম, কড়িভস্ম এবং শুক্তিভস্ম সমপরিমাণ লইয়া অল্পমিতে পাঁচদিন ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধের সহিত দুগ্ধ মাতচিন্তামণি, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, রসরাজরস, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণিরস, গুলঞ্চরস, শতমূলীর রস, ব্রাহ্মীশাকের রস, বড় এলাচ চূর্ণ ও কমলালেবুর খোসা বাটা, তুলসীরসের যে কোন একটি ব্যবহার্য। মস্তকে, হৃদ্‌পিণ্ডে, তলপেটে এবং তলপায়ে নারায়ণ, মহানারায়ণ এবং মহানারায়ণ তৈল ব্যবহার্য।

লো ব্লাডপ্রেসার চিকিৎসা—পূর্বে বলিয়াছি যে লো ব্লাডপ্রেসারে রক্ত এবং আমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহার মূলীভূত কারণ অগ্নিমান্দ্য।

লো ব্লাডপ্রেসার নিবারণ করে কতিপয় সিদ্ধ যোগ—

(১) শুঁঠের কাথ শুঁঠ ২ তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবা।

(২) শুঁঠ ১ তোলা, এরণ্ডমূল ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবা।

(৩) শুঁঠ ১ তোলা, রসুন ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবা।

(৪) দশমূল পাঁচন আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবা। তাহার সহিত প্রত্যেক স্বরূপ পিপুল চূর্ণ সিকি তোলা ও মধু আধ তোলা সেবা।

বংশপত্র হরিতালভস্ম ½ রতি মাত্রার গরম পথ্যসহ ১ তোলা ও আদার রস ১ তোলা সহ সেবা।

পথ্য—ঘৃতসহ, দুগ্ধ, মুড়ি, খৈ, পরটা, নিরামিষ ডাল, তরকারী, মাংস, ডিম পথ্যরূপে ব্যবহার্য।

পীতারিষ্ট—আমার রস ও গরম পথ্যসহ সহ সেবা।

করোনারি থ্রম্বোসিস—আয়ুর্বেদ মতে ভুক্ত দ্রব্যের সর্বপ্রথম পরিপাকের পর রসোৎপত্তি হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদে এই রসের নাম রসধাতু। রসাগ্নির দ্বারা রসধাতুর দ্বিতীয় পরিপাকে হইতে রক্তধাতু এবং পিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিত্তই রক্তের উপধাতু। পিত্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকিলে ভুক্ত দ্রব্য সহজেই জীর্ণ হইয়া থাকে। শরীরের সর্বপ্রকার উষ্মার বা তেজের কারক পিত্তধাতু।

আহার বিহারের অনিয়মাচার হেতু পিত্ত বিকৃত হইলে ধাতুগি সকল দুর্বল হইয়া পড়ে। বিশেষ ভাবে কাণ্ডাগ্নি দুর্বল হইয়া থাকে। কাণ্ডাগ্নি দুর্বল হইলে শরীরে আমরসের সঞ্চার হইয়া থাকে। আম পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাকে সামপিত্ত কহে। রক্ত ধাতুতে আম মিশ্রিত হইলে রক্ত ধাতুগি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতে থাকে এবং রক্তবাহী শিরা সমূহ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

ইহার ফলে হঠাৎ একদিন ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়। এ রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্বে রোগী মুখের ভিতর চিনীর্ মতার মত শক্ত অনুভব করে, কাহারও কাহারও কাসির সহিত রক্ত নির্গত হয়। কাহারও কাহারও ফুসফুসের নিকট চাপ ধরার মত অনুভূত হইয়া থাকে; বেদনা খিট্‌খিটে হয় এবং রাত্রিতে শয়ন কালে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে উল্লিখিত বিষয় সমূহের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

(১) হিঙ্গুলেশ্বর চূর্ণ গরম পরাতুর ও মধুর সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ অতি সামান্য এবং সাধারণ উপকরণের দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া ইহাকে হেয় মনে করা উচিত নয়। অগ্নিমান্দ্য হইতে উদ্ভূত বহু জটিল ব্যাধি এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়। আরোগ্যে ইহার অপেক্ষা নিরুপদ্রব ঔষধ নাই।

(২) অর্জুনারিষ্ট এই রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ। উল্লিখিত পূর্বরূপগুলি উপস্থিত হইবামাত্র কিছুদিন ধরিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে আর উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত বা উপদ্রুত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

(৩) বৃহৎ বাতচিন্তামণি—অনুপান অশ্বগন্ধার রস, দুগ্ধ, চিনি, মধু।

(৪) ধন্বন্তরাবাদ্য তৈল—মস্তিষ্কে, ফুসফুসে, তলপেটে এবং তলপায়ে মালিশ।

(৫) ক্ষুদ্রকল্যাণঘৃত, যোগেন্দ্রঘৃত, দশমূলঘৃত, চিন্তামণিঘৃত, চতুর্মুখঘৃত, অশ্বগন্ধা, মধু, দুগ্ধ ও চিনি অনুপানে সেবন করা উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উল্লিখিত ঔষধগুলির অথবা বিবেচনা করিয়া ২।১টি কিছুদিন ধরিয়া প্রয়োগ করিলে রোগী রোগমুক্ত হইয়া থাকেন।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। পূর্বে বলিয়াছি যে করোনারি থ্রম্বোসিসে হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া থাকে। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে ঠিক মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক মানবদেহের তিনটি অঙ্গের মধ্যে অন্যতম। মানুষের হৃদপিণ্ডে সর্বপ্রথম কোন বিষয়ের চিন্তা উদিত হইয়া থাকে। মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারা সেই চিন্তা অর্থে পরিণত করিয়া থাকে। হৃদয়ে মন থাকে। মস্তিষ্কে বুদ্ধি থাকে। মানব জীবনে সত্তা মন এবং বুদ্ধির দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্ক এবং হৃদপিণ্ড সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। হৃদপিণ্ডের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ সর্বাধিক। "আবেগ" অর্থাৎ মনে উদিত সকল ভাবই মস্তিষ্কের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। মন ভালবাসা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। মস্তিষ্কও মনের ন্যায় ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত। মনে তমোগুণের আধিক্য ঘটিলে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া থাকে এবং মানুষ প্রজ্ঞাপরাধমূলক অনেক অহিত কার্য করিয়া থাকে। ইহার ফলে ক্রিয়াদি প্রদূষিত হইয়া থাকে এবং বিশেষভাবে পাচনাগ্নি ও জারাগ্নি। বিকৃতি হেতু আমদোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মল বায়ু আধ্মানযুক্ত হইয়া কঠীভূত হয় এবং মস্তিষ্ক প্রদেশে রক্ত সঞ্চালনের কার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক দুর্বলতাহেতু ও রক্ত চলাচল কার্যের ব্যাঘাত হইয়া উক্ত রোগব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগে রোগী অজ্ঞান না হইলে নিম্নলিখিত পাচন ও ঔষধগুলি বিতরণ –

(১) অর্জুন ছাল, যেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সোনাকাকুলে, প্রত্যেকটী আধতোলা মাত্রার জলে

লিপ্ত করিয়া আবশ্যক থাকিলে লাগাইয়া সেবা। ইহা বিধিমত করিয়া ব্যবহার করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

(২) বিশুদ্ধ অম্লতাকৃত তাম্রভস্ম লিকিরিষ হইতে একরতি মাত্রায় আদার রস ও মধুসহ ব্যবহার করিলে উদর এবং মস্তিষ্কজাত সর্বপ্রকার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৩) বৃহদ্ঘাতচিন্তামণি, রোগেন্দ্রেশ্বর, রসরাজরস ও কৃষ্ণচতুর্মুখ রস প্রতি তিনরত্তী মাত্রায় প্রত্যেকটী শরমূলীর রস, ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে এই রোগে প্রভূত উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) চাউল ধোয়া জলের সহিত পর্পটিসিন্দুর, বিশেষতঃ রোগীর নাড়ী বিলুপ্ত হইলে চতুর্ভদ্রক ঘৃতাক্ত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়।

উষ্ণ পলাণ্ডুরসের শক্তি থাকিলে রসসিন্দুর নামক উষ্ণ পলাণ্ডুর রস ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে শোধিত হিঙ্গুল দুই রতি মাত্রায় পলাণ্ডুর রস, চিনি ও মধুর সহিত সেবনীয়।

মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধিলে ত্রিফলাদি প্রলেপী তৈল, মহারাজ প্রলেপী তৈল, দশমূল তৈল, যষ্টি-গুড়ুচ্যাদি তৈল মস্তকে মর্দ্দনার্থে ব্যবহার্য। বড়বিন্দু তৈল নস্যার্থে ব্যবহার্য।

অত্যধিক শীতক্রিয়া করার ফলে মস্তিষ্ক ভারী বোধ হইলে শিরোরোগাধিকারের মহালক্ষ্মীবিলাসরস সেবনীয়। ভার বোধের সহিত জ্বালা ও দাহ থাকিলে শতধৌত পুরাতন ঘৃতের প্রলেপ দিতে হইবে। কেবল ভার বোধে পুরাতন ঘৃতের মালিশ ও নস্যাদি উপকারী। জ্বালার সহিত যন্ত্রণা থাকিলে পঞ্চতিক্ত ঘৃতের প্রলেপ উপকারী। উষ্ণ সেবনের শক্তি থাকিলে উষ্ণদুগ্ধ ঘৃতের সহিত পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুল সেবনীয়। রোগী অজ্ঞান হইলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থল চাছিয়া তৎস্থলে শিরা বিদ্ধ করিয়া চতুর্ভদ্রক ও ব্রহ্মরন্ধ্ররস প্রয়োজ্য।

হিমাঙ্গে কস্তুরী ভৈরবের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ মধু ও উষ্ণদুগ্ধ সহ উপকারী।

মাংসেপে কটামাংসী ছিন্নোদ্ভব জলের সহিত কৃষ্ণচতুর্মুখ রস সেবনীয়। লক্ষালোপে তালমাখানা রস পঞ্চাঙ্গুল ও দুগ্ধের সহিত হরিতালভস্ম সেবনীয়।

পথ্যাপথ্য—বেদানার রস, আঙ্গুরের রস, কমলালেবুর রস, উষ্ণদুগ্ধ ঘৃত, মৈ মণ্ড, বার্লির জল, মিছরীর সরবত, ডাবের জল।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, ভাষারত্নী, এ, এম, ডি

আজ থেকে ত্রিশিশ বছর পূর্বে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অনেকেই ভাবতে পারেনি একজন সহায় সম্পত্তিহীন অনন্যকর্মা আয়ুর্বেদসেবীর পক্ষে ত্রিশিশ বছর একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু কথায় বলে "ইচ্ছা যার আছে এবং উদ্দেশ্য যার মহৎ ভগবান তার সহায় হয়ে থাকেন।" আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ধারাকে বাঁচিয়ে রেখে জগতের কল্যাণে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়ে আসছে বলেই নব্য বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কারের মধ্যেও আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান তার নিজস্ব স্থান করে নিচ্ছে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের অন্বেষণা, এর সংস্কার, লুপ্ত অংশের পুনরুদ্ধার, অষ্টাঙ্গের চর্চা, কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনো জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর্যায়ে আসন পেতে পারে, সর্ববোগ নিরাময়ে নিয়োজিত হ'তে পারে—একথা আধুনিক কালের মানুষের মনে জাগিয়ে রাখবার জন্যই আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহা আয়ুর্বেদকে তার নিজস্ব ধারায় সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, কোন দলবিশেষের উদ্দেশ্য সাধনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এটা নয়। কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিসম্মত একনিষ্ঠ প্রচেষ্টাশীল সকল শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসুর কাছে এর দরজা সর্বদাই খোলা।

প্রতিষ্ঠানকল্পে বৈদ্যবাবস্থা বৎসরে দু' একটি সভা সম্মিলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে তার অনুষ্ঠেয় কীর্তিসমূহ প্রচার করে আসছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে তার যোগ্য আসন লাভ করার পথে অগ্রসর হচ্ছে। সত্যকার ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে আশ্রয় করে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মীরা একে জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। সুদীর্ঘ ত্রিশিশ বছরের কার্যধারা বিচার করে দেখলে সে কথা প্রমাণিত হয়।

পরিষদের আদর্শ পরিকল্পনা রয়েছে, তাকে রূপায়িত করে তোলার জন্য এর কৃষ্টি বিভাগ, বিভিন্ন বিষয়ে উপসমিতিগুলি তত্ত্ববিজ্ঞানসভা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ, প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ সংরক্ষণ বিভাগ, সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে নব্য বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি এসবই আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের বিরাট পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য একটি গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন। পরিষদ কর্তৃপক্ষ সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন।

নব্য বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার, যার মুহুর্মুহু মত পরিবর্তনে জনসাধারণ যুগপৎ চমৎকৃত ও হতচকিত হচ্ছে কিন্তু তার চাইতে কের উৎকৃষ্টতর স্থায়ী আবিষ্কার মুখ সম্ভব হতে পারে তা নয়—স্বর্ণ সিন্দুর, মকরধ্বজ, এর মত ঔষধ আবিষ্কার হয়েছেও। তাই আজ আয়ুর্বেদ ভাণ্ডারে কি আছে তার হিসেব খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে মনে হয় একে Stock-taking। সেজন্য প্রাচীন বহুদর্শী কবিরাজদের লিখিত অপ্রকাশিত পুঁথি সংগ্রহের ব্যবস্থা পরিষদ করছেন। তাতে এমন সব বিস্তর ঔষধের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যার প্রয়োগ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

আজকের দিনে যাঁরা বহুদর্শী প্রবীণ ও পণ্ডিত কবিরাজ বলে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান প্রবন্ধাকারে প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার করে পাঠ করার ব্যবস্থা পরিষদ করেছেন। এজন্য মহর্ষি চরকের নামে একটি পাঠচক্র স্থাপিত হয়েছে। উহাতে 'চরক সংহিতার' পঠন-পাঠন, নীতি ও চিকিৎসাপদ্ধতি, শিক্ষা ও তথ্যানুশীলন প্রভৃতি বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে চিকিৎসা ও জ্ঞান-লাভের পথ প্রশস্ত হবে। বিজ্ঞান বিভাগ, সাধারণ সভা, অঙ্গের বিভিন্ন বিষয়ে উপসমিতি, স্বাস্থ্য-সমীক্ষা, প্রদর্শনী, সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক অধিবেশন, মাসিক ও প্রয়োজন মত সাপ্তাহিক সভা পরিষদের বহুমুখী কর্মধারার নিদর্শন। প্রতিবছর বার্ষিক অধিবেশনের সময় 'বার্ষিকী'তে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। এবার হতে পরিষদের নিজস্ব ত্রৈমাসিক 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাহন ও উহার কার্য্যাবলির মুখপাত্রস্বরূপে দেখা দিবে। এই সকল কর্মোদ্যমের মূলে রয়েছেন পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি কবিরাজ শ্রীহেমলালকুমার বসুমল্লিক মহাশয়। পরিষদ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির গবেষণা এবং এর বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা সপ্রমাণ করবার জন্য যে বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হ'লে কেবল মাত্র দু'একজনের চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। আমাদের জাতীয় সরকারের এ কাজে পরিষদকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেশের একটি মূল্যবান সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে।

নানা কাজে সরকার কত টাকা খরচ করছেন অথচ ভারতবর্ষের গৌরব করবার মত জিনিষ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান—যার চিকিৎসা গুণে আজো লক্ষ লক্ষ লোক চিকিৎসিত হয়ে রোগমুক্ত হচ্ছে, আমাদের দেশের শাসকদের হাতে পড়ে সে বিজ্ঞান আজ চৌদ্দ বছরের স্বাধীনতায় কী নিদারুণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে বাঙলা দেশে—যে প্রদেশে একদিন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ভারতের সকল প্রদেশের সেরা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এদিকে লক্ষ্য করা উচিত। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ আজ আয়ুর্বেদের পুরোপুরি গবেষণা আয়ুর্বেদের দৃষ্টিকোণ থেকে এর নিজস্ব পদ্ধতিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দেখাতে চান। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের অবদান যদি পরিবর্তনশীল নব্য বিজ্ঞানের চিকিৎসা ধারা থেকে উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সেদিন বলেছেন—

"It is unscientific to say that the system of Ayurvedic medicine is unscientific and should therefore, be discarded. In olden days when there was no Allopath, Vaids and Hakims diagnosed cases correctly and cured diseases. They had vast and accurate knowledge of the system they practised."

ভারতীয় সংস্কৃতির অলৌকিক অবদান আয়ুর্বেদ। এর বিশিষ্ট ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ এত বছর নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যে কাজ করে আসছে তারই ফল স্বরূপ পরিষদের গ্রন্থাগার এবং মহর্ষি চরক জয়ন্তী, ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন, প্রদর্শনী ও বিভাগীয় সভার আয়োজন হয়েছিল কলিকাতায় ১৪ই পৌষ হইতে ২২শে পৌষ, ১৩৬৫ পর্য্যন্ত। তাই প্রতিষ্ঠাতা এক জায়গায় বলেছেন—"এ গৌরব তার তন্ত্র বহনের অনুপাতে নয়—কর্ম এবং কৃতিত্বের অনুপাতে ও বটে।"

আধুনিক বিজ্ঞানের কতকগুলি "আক্ষরিক শব্দের অর্থে ছিন্ন না বলেই সেটা বিজ্ঞান সম্মত হল না এরূপ ধারণা তারা রাখে। আজকের

দিনের অনেক ঔষধকেন্দ্রীক বিজ্ঞানীরা বলেছেন— আয়ুর্বেদে এমন কিছু আছে যা নব্য বিজ্ঞানের চিন্তারও অনেক উচ্চস্তরের বলে প্রমাণিত হয়।

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় লেকচারার শ্রীসুবোধ প্রসাদ বলেছেন –"The Chinese indigenous system is in many respects similar to the Indian indigenous Ayurveda or Unani."

যাকে চীনের কর্তৃপক্ষ এলোপ্যাথীর সমমর্যাদা দিয়ে আজ উৎসাহিত করেছেন। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তার একাধিক ভাষণে ও অন্যান্য উপলক্ষে আয়ুর্বেদের বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে নব্য বিজ্ঞানের বিচারেও বিজ্ঞান সম্মত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এলোপ্যাথী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রারম্ভে ডাঃ হরেল, ডাঃ ওয়াইজ পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদগণ আয়ুর্বেদের মৌলিক সত্যকে স্বীকার করে আয়ুর্বেদোক্ত শারীর জ্ঞানের এবং চিকিৎসার মূলনীতির প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করেছেন। আয়ুর্বেদের নিজস্ব "প্যাথলজী" রয়েছে, তার পরিভাষা রয়েছে। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণার অবকাশ এতে রয়েছে। কি করে নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে রসশালায় তার চর্চা এবং মৌলীর উপর পরীক্ষা ও ধাতবরসাদি ধাতুর উপর তার কি প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার ফলাফলের গবেষণা সবই আয়ুর্বেদের উপদেশ অনুসারে চলতে পারে এবং তাতে নব্য বিজ্ঞানের অপমান ঘটবে না, অধিকন্তু নব্য বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে নূতন পথের সন্ধান পেতে পারে। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ তাই প্রাচীন ধারার মাধ্যমে ব্যাধিপীড়িত মানবের কল্যাণের জন্য পুরাতনের মাধ্যমে নবাবিষ্কারে ব্রতী হয়ে আধুনিক জগৎকে সে কথা জানিয়ে দিতে চায়।

উহার স্বাধীনতা যুগের পরিবর্তিত মানুষ শ্রীনেহেরু প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের "ভারত সন্ধানে" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন· "জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পরিমিত জগতের বাইরে এই অতিরিক্তের জগৎ-এর রূপ আলাদা, ভাষা আলাদা। এটা যেন সহজেই বোঝা যায় আমাদের চারিদিকে একটা অদৃশ্য অজ্ঞাত জগৎ রয়েছে যার স্বরূপ জানতে বিজ্ঞান যত্ন বিস্তর চেষ্টা করেছে, কিন্তু জানতে পেরেছে অতি সামান্য। অনেক তথ্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সত্য কিন্তু এখনো তার অনুসন্ধিৎসা কার্য্যকরী হতে পারেনি। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠপ্রকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিচয়! যাদুঘরের অগোচর এই যে একটি অদৃশ্য মানসলোক একে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তালাবদ্ধ করা একপ্রকার অসম্ভব। আমাদের জীবন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতির কিংবা যেমে যেমে কালে কালে পরিবর্তনশীল এই বহির্জগতের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। জীবন সর্বদা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত একটি অদৃশ্যলোককে যেন স্পর্শ করছে। এ জগৎ যে বাদু দিয়ে তৈরী তা বহির্জগতের ধরাই অবস্থা ভেঙে স্বাদু কিংবা চলমান কি না সে কথা কেউ জানে না। তবে যেন চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই যিনি এই অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন।" আধুনিক বিজ্ঞানকে লক্ষ্য করেই তিনি একথা বলেছেন। বর্তমান, পাপ পুণ্য, প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের ও নব্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তাধারার আলোড়নের ফলে এই বক্তব্যটাই যেন শ্রীনেহেরুর এই উক্তিতে প্রকট হয়ে উঠেছে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান চিরন্তন সত্যাবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালের

লোকশাস্ত্রাবিদের স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা-সূত্রের উল্লিখিত আয়ুর্বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এর সফলতা একমাত্র এর বিশিষ্ট ধারার গবেষণার উপর নির্ভর করে। এলোপাথি দিয়ে আয়ুর্বেদের গবেষণা হয় না। প্রকৃত আয়ুর্বেদের গবেষণা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দার্শনিক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাবিদ্ দ্বারাই সম্ভব।

অণুপরমাণু ও আত্মাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টাদৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেই আয়ুর্বেদ বলেছেন "আত্মিকাস্তা মনঃ কালদিগাত্মহেত্বসংগ্রহঃ", "সোস্তিত্বং চেতনং দ্রব্যং নিরীন্দ্রিয়মচেতনম্" ইত্যাদি, এরকম বহু প্রমাণ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে ও দর্শনে রয়েছে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ তাই এই বিরাট সম্ভাবনাকে রূপায়িত করবার জন্য বদ্ধ পরিকর এবং প্রাচীন ঋষিদের আরব্ধ কর্মের সর্বতোমুখী উন্নয়ন এর একান্ত সাধনা।

চরকের মনঃসমীক্ষায় "আত্মহত্যার" ভূমিকা

কবিরাজ শ্রীনন্দদুলাল ঠাকুর

মহামুনি চরক বলেছেন "সংঘোগাপেক্ষী লোকেষু বহবঃ সমুদায়ো হি সর্বলোকঃ" (শারীর) অর্থাৎ এ বিশ্বের সকল প্রাণীই পরিবেশের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করে। সবাই ছাড়া মানুষ সমবায়ের উপাসক।

তার মধ্যে মানবের বৈশিষ্ট্য সে মন আর দেহ নিয়ে সর্বদা তারতম্য উপলব্ধি করতে পারে, অন্যে পারে না। অর্থাৎ অপরের সেহমনে অস্তিত্ব হ'য়ে সুখ দুঃখ অনুভব করে, মানবের হয় তুলনা রেখে, তাই মানবের বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক।

মানবের মনের তারতম্যের নিকটা হোলো "উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব আর বিরোধ।" অপর প্রাণীর পরিবেশের সাথে মানবের থাকলেও বৈশিষ্ট্য কেবল উপলব্ধির পার্থক্যের জন্য। অর্থাৎ মানব নিজেকে জানতে পারে আমার উৎপত্তির কারণ কি বা কোথায়, বৃদ্ধি আমার কেন, আর উপপ্লব বা দুঃখ আমার কেন, আর বিরোধ আমার হবেই, তবে তার হেতুই বা কি এসব বিচার এবং প্রতিপক্ষ সে করবার বা জানবার করতে পারে। এবং এও সে জানে যে, এসবই হোলো ছাড়া মানুষ আত্মান বিজ্ঞানের স্বভাব। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম।

মানব আরও জানে, বিয়োগেই জীবের আগম নিয়ম, অর্থাৎ জন্মই মৃত্যুর সহোদর, আর মৃত্যুই জন্মের আদি ক্ষেত্র। তাই তার মনের মধ্যে বাঁচার প্রয়াস, আর মৃত্যুর প্রবৃত্তি একসঙ্গে বিদ্যমান। "স লোকস্বভাবঃ"। এই হোলো মানবস্বভাব বা লোক-স্বভাব। "তত্র মূলং সর্বোদ্যমবারোধঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ"। অর্থাৎ মৌলিক সত্য হিসাবে এই কথাই ঠিক যে প্রত্যেকের মধ্যে যখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আর উপপ্লব জাগরূক তখন মানব তার অজ্ঞাতে যখন পরিবেশের দুঃখ সুখ বোধ করতে থাকে তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আর উপপ্লবের কল্পন যে বাসনা আকারে মনে রেখা দেবে, একথা তো সত্য।

চরক মনঃসমীক্ষার এই সূত্র সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে করতে এমন একটী আবহাওয়ায় এসে পৌঁছেছেন যে আজকের যুগে তা পড়তে পড়তে মনে বিস্ময়

জাগে। আমরা বিশে শতাব্দীর মনঃসমীক্ষা হিসাবে 'ফ্রয়েড'কে অন্যতম গুরু বলে মনে করি। কিন্তু চরকের মনঃসমীক্ষণের ধারাটি অধ্যয়ন ও অনুশীলন করলে মনে হয় যে এই চরকই ফ্রয়েডের আদি গুরু। তাঁহার পরিবেশনের কৌশলে মনস্তত্ত্বটি বর্তমান বিশ্বে যেন নূতন আলোকপাত করেছে। চরকের মনঃসমীক্ষা কিন্তু বহু দিক্ বিস্তৃত। তারই মধ্যে আমরা একটি দিক্ আলোচনা করছি। চরক বলেছেন, মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন—"সর্বাসু অবস্থাসু মনসোঽহম্, দ্রষ্টা সত্ত্বাব সাদিদ্ধোঽহং শরীরেন্দ্রিয় বুদ্ধি স্মৃতি বিশেষ রাশিরিতি গ্রহণ অভিমানবং। (শারীর)

অর্থাৎ প্রবৃত্তির মধ্যেই সে মনে করে আমি মনস্ক, আমি দ্রষ্টা, (জনক-জননীর পর্যায়ে) আমি সত্ত্বাব-সিদ্ধ, (সমস্ত বস্তুতেই আমার প্রবেশ আছে) আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং স্মৃতিবিশেষের সমবায় নিয়ে বর্তমানে। একেই বলে অভিমানব বা অহংমন্যতা।

এই অহংমন্যতার অনুপাত হ'লেই অর্থাৎ ক্ষত আঘোলনে হ'লেই 'বিপ্রত্যয়' ঘটে। অর্থাৎ—"কার্যাকার্য হিতাহিত শুভাশুভেষু বিপরীতাভি-নিবেশাৎ আত্মানং হন্তুমিচ্ছতি" অর্থাৎ অহংমন্যতার দ্রুত আঘোলনের ফলেই কার্য অকার্য, হিত অহিত, শুভ অশুভের প্রতি কোন অভিনিবেশ থাকে না, সব ভুল হ'য়ে যায়—আর তার ফলেই "সলিল-হুতাশন-প্রবেশন কর্তনৈরজ্জ্বনো বন্ধনাদিভিঃ আত্মানং হন্তু-মিচ্ছতি"—জলে আগুনে প্রবেশ করে কিংবা নিজেকে কিংবা গলায় দড়ি বেঁধে নিজেকে হত্যা করতে চায়।

এরে বলে বিপ্রত্যয় ও অনুপায়।

চরকের এই মনঃসমীক্ষা আজকের ফ্রয়েডপন্থীদের ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের অনুশীলন করবার, তা নিঃসন্দেহ।

যারা সমাজতন্ত্রের দিকটা আলোচনা করেন তারা বলেন অর্থাভাব এবং দারিদ্র্যই আত্মহত্যার পক্ষে বেশী দায়ী। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় আমেরিকা যখন মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী তখন সেখানে বৎসরে দুই হাজার লোক কেন আত্মহত্যা করে? তারপর সেখানের আত্মহত্যাকারী লোকের সংখ্যা অপেক্ষা যারা আত্মহত্যার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সংখ্যা নাকি আরও বেশী। সে দেশে আবার বাইবের আইনকানুনকে ফাঁকি দেবার জন্যে ঘুষের ওষুধের মধ্য দিয়ে আত্মহত্যার নজীর নাকি খুব কম নয়।

অতএব বলা চলে না দারিদ্র্য বা অর্থাভাব শুধু মানুষকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়, বরং জীবনকে বেশী আপনার ক'রে তোলে দারিদ্র্য। ঠিক বিপরীত দেখা যায়, যারা আর্থিক সম্বল তারাই মানসিক অসুখে ভুগে ভুগে আত্মহত্যা করে বেশী।

অতএব সহজেই প্রমাণিত হয় একটি বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা মানুষকে আত্মহত্যার ইসারা দিয়ে সে-কাজে টেনে আনে।

পশু-পক্ষীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রয়াস নেই, অথচ তাদের মন এবং মনের ইচ্ছাদের আছে। আর মনের প্রতিকূল পরিবেশে পশুরা বিরক্ত হয়, খায় না, কাঁদে, ডাকে, ছুটে বেড়ায়, অসুস্থ হ'য়ে ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মহত্যা করে না। সেই-জন্যই চরক বলেছেন "লোক স্বভাবোঽপি বিকার-বিশেষৈরুপদ্রুতে লোকাঃ"।

অর্থাৎ এ সংসারে সমস্তই লোকস্বভাব হ'লেও মানবেই তা বিশেষ একটি ধর্মরূপে বিকাশ পায়, অন্যে তা পায় না।

অর্থাৎ মানুষেই জীবনের প্রতি সচেতনতা সর্বদা রয়েছে, অন্যের নাই। আর মানুষের মধ্যে নিম্ন-শ্রেণীতেও জীবন সচেতনতা বেশী থাকে, তাই

তাদের অতিমন্যতার অভাবে প্রিয়জনের বিয়োগে যেমন একটা অস্পষ্টতা থাকে বলেই মানববিশুদ্ধরাও আত্মপ্রবাসী হয় না।

এইজন্যই চরক বলেছেন যেদিন থেকে অহংমন্যতা স্পষ্ট হয় সেদিন থেকে তার মধ্যে "মম মাতৃ-পিতৃ-আত্ম-ধারাপত্য-বন্ধু-ক্রিয়-দ্রব্য অপোপশম ও অহং ইতি অভ্যাসাঃ"। (শারীর)

যেদিন থেকে আমি আমার এবং আমার এরা, এদের আমি এই বোধ হ'তে থাকে তাতেই তার মনে অভ্যাসের অর্থাৎ আন্দোলন হ'তে থাকে।

শিশুদের মনে এসব অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে থাকে, তাই তার মনের আন্দোলন তাকে অহংমন্যতার পথে নিয়ে যায় না। আত্মহত্যার প্রয়াসও থাকে না। তবে কারও অহংমন্যতার প্রয়োজনা পেলে অর্থাৎ তোমার বাবা মাকে দেখতে পাবে যদি তুমি এই ফুয়োতে ঝাঁপ দাও, এই ঘড়িটার ভূলতে পার ইত্যাদি প্রলোভন দেখালে শিশু আত্মহত্যা করে। কিন্তু সেটা কি আত্মহত্যা ?

সেইজন্যই বলতে হয় চরকের মনঃসমীক্ষা কত বিস্তৃত। এই আত্মহত্যার প্রয়াসের পিছনে আর একটি সাক্ষাৎ কারণ থাকে। ফ্রয়েড সিগ্‌মণ্ড্‌ এরও বিশ্লেষণ করে বলেছেন—আমাদের বিদ্বেষ-মূলক মনোভাব (এগ্রেসন) যখন কোন কারণে বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না তখন তা মনের মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। তাতেই তার আত্মহত্যার প্রয়াস আসে। একে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিদ্বেষকে বারুদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আর চরক বলেছেন, "মোহেচ্ছা দ্বেষ কর্মণঃ তৎপ্রবৃত্তিমূলম্" (শারীর)। অর্থাৎ কেউ আত্মহত্যা করলে দেখতে পাবে মোহ কিংবা প্রবল ইচ্ছা কিংবা দ্বেষই তার কারণ। সবই কিন্তু "অধিরাত্র্যপাতাৎ"। মোহ কিংবা দ্বেষ যদি কারও মনে অধির হয়ে থাকে অর্থাৎ দিবারাত্রি ঘুরপাক খেতে খেতে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় তবে তারই প্রতিক্রিয়া আত্মহত্যা। কারও প্রতি মোহ, কারও প্রতি বিশেষ ইচ্ছা কিংবা কারও প্রতি দ্বেষ যদি প্রতিকূল পরিবেশে আহত হয় অথচ তাকে প্রশমিত করার উপায় না জানা থাকে তবে সে আত্মহত্যা করবে। চরকের এই মনঃসমীক্ষার সূত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তা আজকের দিনে প্রমাণিত হচ্ছে দেখে তার না মনে হয় এই তারতের মহর্ষিদিকে উপেক্ষা করে আমরা এখনও ত্রিভুক সেজে মনের দ্বারে কপাটিকার লালায়িত হয়ে রয়েছি।

আমরা আমাদের তারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের ছোঁয়া মহুয়ার উত্তরাধিকারী হয়েও এতদিন ধরে কেবল পরপ্রত্যয়ের বুদ্ধি হ'য়ে কাটালাম।

মনোজগতের যে বিশাল পত্রিকাখানি মহামুনি চরক আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন, তা একবারও খুলে দেখি নাই।

চন্দ্রা

কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

এ গল্পের নায়িকা চন্দ্রা, এ নামটি বড় সুন্দর। অবশ্য এই ভাবেই। বিহার – উত্তর প্রদেশে চন্দ্রার বেশ ভাল লাগে। তাই সেখানে তার বেশী যাতায়াত। ওঁরা এঁকে ডাকেন 'ছোট চন্দর' বলে, আর নাম চন্দ্রিকা, ইনি আয়ুর্বেদের ছত্রছায়ে বাঁধা ছিলেন।

আমেরিকান ডক্টরস অনেক সাধ্য সাধনা করে নিয়ে গেলেন ওঁদের দেশে চন্দ্রাকে Rauwolfia serpentina নাম দিয়ে— এ খবর জেনে গেল বিশ্বজন। ঠিক যেন স্বদেশে রাতারাতি খাতিমান হওয়ার মত। এদিকে কবি কিন্তু যা ছিলেন তাই রইলেন। এখন চন্দ্রিকা আর বিহারীদের "পাগলাকি দাওয়াই" নয়। বড়-লোকদের High Blood Pressure এর অর্থাৎ বায়ু রোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ।

পাটনার স্যার আলী ইমামও স্যার হাসান্ ইমামের জননী ইমাম সেবার 'ছোট চন্দর' কে পাঠাতেন আপ্ ওয়ার্ডে। গয়ার শিল্প মহামহোপাধ্যায় বিজয় রত্ন সেন মহাশয়ের 'সৈবরলাইন' আর ডবলিউ সি, ঘোষের 'স্পেসিফিক' এই চন্দ্রারই নামান্তর।

লক্ষ্ণৌ যখন ব্লাডপ্রেসার মাতামাতি আরম্ভ করে তখন মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, আর ডাক্তার কার্তিকেচন্দ্র বসু মহাশয় চন্দ্রাকে নিয়োগ করলেন উচ্চ রক্ত চাপের সঙ্গে লড়াই করতে, এই নিয়ে সুরু হোল লাখনৌএ কেন্দ্রীয় চন্দ্রা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের, কলিকাতা ট্রপিক্যলে, আরজুকোনাটে কত জল্পনা কল্পনা। চন্দ্রা বলে ডোরা আমাকে এতদিনে চেনার চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি আগেও ছিলুম, আজও আছি। চুপ চুপ করে সেবা করে চলেছি, জানেন আয়ুর্বেদীয়রা।

প্রাচীনকালে ঋষিদের আশ্রমে আমি ছিলুম। ওঁরা আমাকে চিনতেন, কাজে লাগাতেন। ছোটছেলের ঘুম না হলে আমার ডাক পড়ে, সেখানে ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী হয়ে ঘুম পাড়াতে। বিহারবাসী মায়েরা আমার সে কল্পনা জানেন। পেটে ব্যথা, জ্বর, স্নায়ু প্রধান, সিজোফ্রেনিয়া—এদেরই আমি, আর নামই যখন দর্পঘ্ন, বিষাক্তকীট, সাপের বিষেও আমি। তবে এ কাজে আজকাল আমাকে লাগাতে অনেকে সন্দেহ করেন। তাছাড়া কর্ণিকার অস্বচ্ছতায় (Opacity of the cornea), জরায়ু-সঙ্কুচিত-করতে আমি আছি। হোমিওপ্যাথী মতে বিপেশিনী 'ফ্লাইন' উচ্চ রক্তচাপে চাপ কমায় কিন্তু ঘুম-না-হওয়া উপসর্গে আমাকে দরকার। আমি এ সবই পারি। চাপ কমলে (অবসাদে) আমাকে বিদায় করাই ভাল। তার মানে Low Blood Pressure এ আমার খোঁজ করার কোনও দরকার করে না। সেখানে মকরধ্বজ, যোগেন্দ্ররস বৃঃ বাতচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাই সুফলপ্রদ।

ইংরাজী চিঠির বাঙলা অনুবাদ

কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাত্র,
অধ্যাপক, যাদবপুর মডার্ন আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়

মাই ডিয়ার ডক্টর উইল্‌সন,

তোমার তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রয়োজনীয় চিঠিখানা যথা সময়েই পেয়েছি। দুষ্কালের স্বল্প-পরিচিত বন্ধুকে দুর্ভোগের কালেও যে স্মরণে রেখেছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

সেক ক্যাম্পের যুদ্ধে ১৯৪২ সালে তোমার সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয়, তখন তুমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিদ্যার্থী অবস্থায় যুদ্ধে যোগদান করেছিলে। আজ তুমি চিকিৎসক এবং অধ্যাপক। ভারতের নিজস্ব চিকিৎসাবিজ্ঞান আছে—এ কথা সেদিন তোমাকে বিস্মিত করেছিল। জগতে অন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা শাস্ত্র থাকতে পারে, এ ধারণা তোমার না থাকা কিছু অসম্ভব নয়। প্রচারের যুগে অপপ্রচারের জোর কিনিসও মানুষের জানার বাহিরে থেকে যায়। বেশ মনে আছে, সেদিন প্রথম তোমাকে হিন্দু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বর্ণনা দিতে কয়েকটী কথা বলেছিলাম—তুমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলে। এ তত্ত্ব তোমার কাছে তাহী অদ্ভুত ঠেকেছিলো। আমার উৎসাহের জীর্ণ কেদারায় ব'সে, আয়ুর্বেদের কথা যখন তুমি শুনতে চাইছে, আর আমার বক্তব্যের ফাকে ফাকে তোমার ছোট্ট নোট বইয়ে কোন কথা লিখে নিতে তখন তাহী ভাল লাগতো তোমাকে। তোমার অজানাকে জানার, অজ্ঞাতকে জ্ঞানের সীমায় নিয়ে আসবার আকাঙ্খা ও চেষ্টা, আমাকে তোমার দিকে আরও আকৃষ্ট করেছিলো। আজ দীর্ঘ ৮ বৎসর পরে, পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে আমা তোমার এই চিঠি আমাকে আমার যেন ফিরিয়ে নিতে চাইছে সেই অতীতের দিনে।

তুমি জানতে চেয়েছ—(১) ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন Chronological ইতিহাস আছে কিনা, (২) অতীতে ভারতে Surgical development কিছু ছিলো কি না। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করি। প্রশ্ন দুটীর বিস্তৃত উত্তর দিতে গেলে চিঠিখানা বহুদীর্ঘ প্রবন্ধ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে তোমাকে কিছু জানাবার চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলে রাখি, বন্ধু, দীর্ঘকাল পরাধীনতা থেকে ভারত তার বহু সম্পদ হারিয়েছে, সেই সঙ্গে হারিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ-সম্ভার। কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থ যা আজো পাওয়া যায় তারই থেকে আহরণ কোরে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি জেনে রেখো, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম 'আয়ুর্বেদ' আর প্রধান প্রাচীনতম গ্রন্থ দুখানির নাম 'চরক' এবং 'সুশ্রুত'।

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে কোনও ঋষির নিকট হ'তে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন কোরে দুইজন ঋষি এই শাস্ত্রকে দুই ভাবে প্রচার করেন। তাদের একজন পুনর্বসু আত্রেয় এবং তাঁর শিষ্য পুনর্বসু আত্রেয়ের কায়চিকিৎসাপ্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রে (School of Physicians) প্রবর্তক। আর শল্য প্রধান চিকিৎসা শাস্ত্রের (School of surgeons) প্রবর্তক-রূপে দেখা যায় কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরিকে। তার ও পূর্বে লক্ষ শ্লোকযুক্ত ব্রহ্মা দিতা

ইতিহাস পাওয়া যায়। আত্রেয় বিভাগ তাঁদের সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বহু নব নব তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে অগ্নিবেশকৃত তন্ত্র সে-আমলে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। কালে অগ্নিবেশ তন্ত্র জীর্ণ-দশা প্রাপ্ত হ'লে মহামতি চরক তুলাপরোক্ষী কোরে তার প্রতিসংস্কার করেন। কোন কোন ইতিহাস-বেত্তা ও প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন রাজা কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন চরক। সুতরাং চরকের কাল কণিষ্কের রাজত্বকাল। বর্তমানে যে চরক সংহিতা পাওয়া যায় চিকিৎসাস্থান ২৭শ অধ্যায় পর্যন্ত মহর্ষি চরক, আর অবশিষ্টাংশ দৃঢ়বল কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্র। কাশ্মীরাজ বিবোধাস অস্ত্রবিদ্যার বহু বিষয়ের মধ্যে সুশ্রুতকৃত সংহিতাই সংস্কারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়। তাকেও কালের প্রভাবে দুইবার একাধিকবার প্রতি সংস্কার (Re-edited) হ'তে হয়েছে। শেষ সংস্কার করেন নাগার্জুন।

আজকে রোগাদের চিকিৎসা মানুষকে যেমন বহু বিভাগে বিভক্ত করে নিয়ে প্রতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ বা Specialist তৈরী করা হচ্ছে, সে-আমলেও আয়ুর্বেদকে ৮টি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত করা হয়েছিলো, যেমন—(১) শল্য চিকিৎসা (Surgical Treatment), (২) শালাক্য চিকিৎসা (Treatment of Eye, Ear, Nose and Throat), (৩) কায় চিকিৎসা (Medicinal treatment of general diseases), (৪) ভূতবিদ্যা (Science of mental and Spiritual treatment), (৫) কৌমার ভৃত্য (Treatment of Children's diseases including portions of Midwifery & Gynaecology), (৬) অগদতন্ত্র (Toxicology), (৭) রসায়ন তন্ত্র (Science of Rejuvination), (৮) বাজীকরণ তন্ত্র (Treatment for Sexual potency)। এই প্রধান অঙ্গগুলিরও অনেক উপাঙ্গ ছিলো এবং প্রতি উপাঙ্গেরই বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির ব্যবস্থা ছিলো।

যে-সময়ের কথা বলছি, সেটা ছিলো হিন্দুযুগে। হিন্দু যুগের বহু শতাব্দী পরে আসে বৌদ্ধ যুগ। বৌদ্ধ যুগে "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" মত প্রচারের ফলে শল্য কর্মকে অর্থাৎ operation ইত্যাদিকে হিংসাত্মক ক্রিয়া বলে মনে করা হ'ত এবং শল্য তন্ত্রীয়দের সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখা হ'ত। তা ছাড়া তান্ত্রিক যুগে বহু ধাতু উপধাতুর ব্যবহারে সিদ্ধ বৈদ্যদের আবির্ভাবে অনেক অনুসাধ্য ব্যাধি ঔষধসাধ্য হয়ে পড়ে, কাজেই শল্য চিকিৎসার উৎকর্ষ সেকালে কিছুটা ব্যাহত হয়। যে সময় Egypt-এ (মিশর দেশে) প্যাপিরাস্ ছাদে লেখার প্রচলনবার সুরু হল, ভারতে আয়ুর্বেদ তখন চরম উন্নত। বৌদ্ধ যোরোপ (Hight priest) তাঁদের নিজস্ব 'যোরোপুরুষ'গণকে পাঠাতেন মিশর অর্থাৎ মিশর দেশে চিকিৎসার সেবা-কার্য্যে। তাঁদের ঔষধ ব্যবহার পদ্ধতিকে বলা হ'তো যোরাপুটিক পদ্ধতি, যোদের আজ বলে Therapeutic বলো। কাজেই বুঝতে পারছ আয়ুর্বেদ বহু প্রাচীন। কিন্তু এর প্রকৃত Chronological ইতিহাস দেওয়া খুব কঠিন।

"সর্ব শরীরাবাধকরঃ শল্যঃ
তন্নিরোপণনিমিত্তং চ শল্য-তন্ত্রম্"। (সু-সূত্র ২৬)
তচ্ছরীরাবাধকরাণি শল্যানি
তেষামাহরণোপায়ো যন্ত্রাণি। (সু-সূত্র ৭)

সর্ব দেহ-তন্ত্রের আবাধকর অর্থাৎ বেদনাদায়ক যা, তাকে বলা হ'ত শল্য। সেই শল্য উদ্ধারের বিষয় যে শাস্ত্রে বলা হয়েছে তার নাম শল্য শাস্ত্র। পাটনাদি করবার অর্থাৎ কাটবার ধারাল অস্ত্রকে বলা হত শস্ত্র, আর শল্যকে আহরণ করবার (বারহীন) হাতিয়ারকে বলা হ'ত যন্ত্র। সে-হিসাবে হাত ও একটী যন্ত্র। সুশ্রুতে ১০১ প্রকার যন্ত্র এবং ২০ প্রকার শস্ত্রের

ব্যবহারের কথা উল্লিখিত রয়েছে এবং তার অনেক গুলির বর্ণনা আজ তোমাদের ব্যবহৃত যন্ত্র ও অস্ত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এছাড়া ক্ষার (Caustic) ও অগ্নি প্রভৃতিকে বলা হ'তো অস্ত্রযন্ত্র। আজকালকার প্রচলিত Caustic এবং Electric Cauterization এর স্থানে সেকালে ও ক্ষারকর্ম এবং অগ্নিকর্ম করা হ'তো।

শল্যাঘাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে আরবীর সাথে বিস্তৃত জ্ঞান থাকা দরকার। সেকালে আরবীর আলোচনা এত উন্নত ছিলো যে তাঁরা মানুষের দেহের ৭টি স্তর আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ চর্মরোগ দেহের বিশেষ বিশেষ স্তরকে আক্রান্ত করে জানায়, এ কথা তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন।

Operation বা অস্ত্র কর্মকে বলা হ'ত প্রধান কর্ম, তার পূর্বে ছিল পূর্বকর্ম (Pre-Operative Preparation) এবং পরে ছিলো পশ্চাৎ কর্ম(Post operative treatment)। স্থান বিশেষে ১৪ প্রকার বন্ধনীর (Bandage) উল্লেখ পাওয়া যায় যার অনেকগুলি আজও তোমাদের মধ্যে প্রচলিত। সুশ্রুত ৬ প্রকার সন্ধিমুক্তি (Dislocation of joints), এবং ১২ প্রকার অস্থির (Bone-fracture) লক্ষণ ও চিকিৎসার বিস্তৃত আলোচনা এবং কপাটবন্ধন বা Fracture-Bedএর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা Modern Surgery থেকে খুব বেশী তফাৎ নয়। ছেদ, ভেদ, লেখ্য ইত্যাদি ৮ প্রকার শস্ত্রকর্ম; স্থান বিশেষে তীর্যক, অর্ধচন্দ্র ইত্যাদি বিশেষ প্রকার ছেদের (Incision) উপদেশ; শস্ত্রকৃত ক্ষতের (operated wound) বন্ধনী কৃত্যের দিবসের পূর্বে খোলার নিষেধের যুক্তি; ক্ষতের লক্ষণ এবং Sepsis নিবারণের জন্য Anti-septic measure হিসাবে গুগ্‌গুল, মঞ্জিষ্ঠা, মুরা, বচ, সর্ষপ, নিম্বপাতা, সৈন্ধব ইত্যাদির ধূপায়নের নির্দেশ আজও মনে বিস্ময় জাগায়।

প্রায় ৫০০ থেকে ৪০০ বর্ষ খৃঃ পূর্বে (B.C.) হ'ল সুশ্রুতের কাল। সেই কালেই তাঁরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রকোষের সহায় ছাড়াই নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ (আকুঞ্চন ও প্রসারণ) সাহায্যে নিরাপদে দেহদেহে রক্তসংবহন ক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাতেই পরিপ্রেক্ষিতে শিরাব্যধ (বা Venesection) এবং Major Operation যথা চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, প্লীহা যকৃৎ, বাতরক্ত, শ্লীপদ (Filariasis) ইত্যাদির প্রতিকারের ব্যবস্থা সুশ্রুত সংহিতার শারীর ৮ম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে লিখিত বদ্ধ ছিদ্রের বা বদ্ধোদরের (Intestinal Obstruction) রোগনির্ণয় লক্ষণ এবং শস্ত্রকর্মের (Operation) ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা Surface Anatomy এবং Abdominal Surgeryতে কত উন্নত ছিলেন তা জানতে পারা যায়।

সীবন প্রণালীতে (Stiching method) দেখা যায় সেকালে শস্ত্রকৃত ক্ষতের দুই পার্শ্বকে মিলিত করে সূক্ষ্ম সূত্র, বৃক্ষ বিশেষের সূত্র, ক্ষৌম সূত্র (Silkworm guts), স্নায়ু সূত্র (Animal guts) প্রভৃতির সাহায্যে সেলাই করা হ'ত। তিন প্রকার সূচীর (needle) উল্লেখ পাওয়া যায় :— অন্ত্রাদির ও সন্ধিস্থানের জন্য গোল সূচী (Cylindrical needle), মাংসল স্থানের জন্য ত্রিকোণ সূচী (Prismoid needle), এবং উপর বা ললাটের সীবনের জন্য বক্র সূচী (Curved needle) ব্যবহৃত হ'ত।

ছিন্ন ওষ্ঠ, কর্ণ, নাসিকার জন্য Plastic Surg-

---

* পদ্ম ২ প্রকার-স্থূল তার লৌহাদি যার দ্বারা শরীরে ছুঁচিয়ে তাকে বলা হ'ত আশয়স্থ পদ্ম। আর আদি, ছুরিকা, সূচীকর্ম ইত্যাদিকে বলা হ'ত শারীর পদ্ম।

cryর কথাও সুশ্রুত ১৬ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। নাসিকা ছিন্ন হ'লে বর্তমান Surgeryতে যেমন সমান মাপের চর্ম দেহের অন্য-স্থান থেকে এনে নাসিকার ক্ষতিত অংশকে পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট করে নিয়ে, সেই চামড়া তার ওপর জুড়ে বন্ধনী দেওয়া হয়, সুশ্রুতের কৌশল ও ঠিক এই একই প্রকার ছিল। তবে তিনি মুখের কোন ব্যাপারে অন্যের চর্ম গ্রহণের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

Embryotomy যাকে আজকাল তোমরা Ceasarean Section বল, তারও কৌশল প্রাচীন ভারত জানতো। সুশ্রুত বলেছেন :—

"বন্ধমার্গে বিপন্নায়াঃ কুক্ষিঃ প্রস্পন্দতে যদি।
তৎক্ষণাদ্ভরণকালে তং পাটয়িত্বোদরেত্ত্বিষক্।"
(সুঃ নিঃ ৮)

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠকালে (প্রসবকালে) যদি মাতার মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য অবস্থা হয় অথচ কুক্ষিস্পন্দন (Foetal Heart Sound and Quickening) দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান জীবিত আছে একথা যদি জানতে পারা যায় তবে চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ উদর পাটন ক'রে সন্তানকে উদ্ধার করবেন। (জীবন রক্ষার্থে ব্যবস্থা তিনি পূর্বেই বলে গেছেন)

Arthopaedic Surgery বিষয়ে সে-কালে ভারতে অনেক গবেষণা হয়েছে, টীকাদি। ক্ষতির পরে লৌহ বা কাষ্ঠ নির্মিত পদের প্রয়োজন, বিশ-লাঘকে সহজী-করণ; এমনকি, দেহের কোনও অংশ বিশেষ ছিন্ন হ'লে অপর জীবিত প্রাণীর সেই অংশ কর্তন করে ছিন্ন স্থানে সংযোজনের ইতিহাসে আয়ুর্বেদে উল্লেখ আছে।

অনন্তপার আয়ুর্বেদের কথা ছোট এই চিঠিতে সম্পূর্ণ বিবৃত করা সম্ভব নয়, কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিলাম। বারান্তরে আরও বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

বেদ ভাক্তার, তুমি যেমন তোমার দেশের জন্য গর্ববোধ কর, তেমনি আমিও আজ গর্বিত যে আমি ভারতের সন্তান—যে ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন, বিশ্বের যেকোন সভ্যতার চেয়ে বহু প্রাচীন অথচ উদার। মহর্ষি চরক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বলেছেন :—

"সর্বেষাং মুক্তে হৈষজ্যং রোগার্তানাং হি জন্তবঃ।"

অর্থাৎ যে কিনিস দিয়ে রোগের শান্তি হয় সেইই ঔষধ হবে, তা সে যে দেশের এবং যে প্যাথীরই হক না কেন। তার পরে বলেছেন :—

"সং চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ।"

যিনি রোগমুক্ত করতে পারেন তাঁকেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলবো, তা তাঁর প্যাথী আর উপাধি যাই হ'ক।

এত বড় উদার বাণী, এত বড় মহৎ আদর্শ আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে পেয়েছ কি, ডাক্তার?

সমাপ্তির পূর্বে একটি কথা বলতে চাই, বন্ধু। ভারত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের মত, তোমাদের দেশেও আমরা কয়েক অপপ্রচার হয়েছে। তা হওয়াই সম্ভব। তুমি এ দেশে এসেছিলে বলে সেই মিথ্যারটনার কুয়াশা তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হতে পেরেছে। ভারত বর্তমানে বা অতীতে, কোন-দিনই কাউকে ছোট করে দেখেনি, বন্ধু। কোনদিন সে অপরকে, অপরের দেশকে নিন্দা করেনি। আপনার জ্ঞান, আপনার ঐশ্বর্য সে সমস্ত জগতের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছে। জগতের সকল বর্ণ, সকল মত, সকল মানুষকেই আপনার উদারতা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে সে নিজের করে নিয়েছে। কাউকেই ভারত কোনদিন ফিরিয়ে দেয়নি, তাচ্ছিল্যও দেখেনা। বর্তমানে ভারতের আর এক মনীষী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী আজ পৃথিবীর সকল দেশেই শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হচ্ছে, তিনিও বলেছেন :—

"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

প্রীতি নিও, টাটা।—

গীতায় আয়ুর্বেদ

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, এম. এ

সংস্কৃত ভাষায় এক শ্রেণীর চতুষ্পদ গ্রন্থ 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধ, যথা—অষ্টাবক্র-গীতা, শিব-গীতা, ব্যাস-গীতা প্রভৃতি। তথাপি 'গীতা' বলিতে সাধারণত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতাকেই বুঝায়। প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু' এইরূপ উল্লেখ থাকাতে বোঝা যায়, এখানে 'গীতা' কথাটি বিশেষণ, কথাটির অর্থ 'যেখানে আত্মবিদ্যা গীত হয়', কিন্তু গীতায় তো শুধু আত্মবিদ্যাই কীর্তিত হয় নাই, ইহা যেন কল্পতরু অর্থাৎ ইহার নিকট যিনি যাহা চাহিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত গীতার অধিক ভাষ্য রচিত হইয়াছে, গীতা-সম্পর্কিত পুস্তকের সংখ্যাও বড় অল্প নহে, তথাপি অনেক কথাই তো আজও বলা হয় নাই। ভাবী যুগে গীতাকে অবলম্বন করিয়া আরও নূতন নূতন গ্রন্থ রচিত হইবে, তথাপি সকল কথা কোনদিনই হয়তো বলা হইবে না। গীতা তো শুধু আস্তিকেরই আদরণীয় নয়। নাস্তিকের পক্ষেও (যদি যথার্থ নাস্তিক কেহ থাকেন) ইহা এক অমূল্য সম্পদ। কেননা, ইহা নানা বিদ্যার উপর আলোকপাত করিয়াছে, যথা ধর্ম্ম, বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান, শিক্ষাবিধি প্রভৃতি। আমরা আজ ভগবদ্গীতার স্বাস্থ্যের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আয়ু, বল, আরোগ্য, সুখ প্রভৃতি যে মানুষ-মাত্রেরই কাম্য, এ কথা শ্রীভগবান ভালভাবেই জানিতেন। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—'ভগবদ্গীতার প্রিয় আহারও তিন প্রকার হয়।' এখানে 'আহার' অর্থ খাদ্য। অবশ্য ব্যাপক অর্থে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, তাহাই আহার। গীতার ব্যাপক অর্থেও 'আহার' কথাটির প্রয়োগ আছে, যথা,—

'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।'

ত্রিবিধ আহার কিরূপ? সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, আবার, সত্ত্বগুণী লোকেরা সাধারণত সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করে। রাজসিক ও তামসিক আহার সম্পর্কেও একই কথা খাটে। গীতা বলেন—

'আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ॥
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।'

যে আহারে আয়ু, অধ্যবসায়, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, যাহা, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, সারবান ও আনন্দদায়ক, তাহাই সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।

এখানে আয়ু, বল ও আরোগ্য,—এই কথা কয়টি লক্ষণীয়। অবশ্য শ্রীভগবান এখানে কোন বিশেষ খাদ্যের কথা বলেন নাই। এরূপ আহার সাধারণত বাতপিত্তনাশক।

'কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।'

অতি কটু, অতিলবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও বিদাহী (জ্বালাকারক) আহার রাজসিক লোকের প্রিয়। এরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে দুঃখ, শোক ও আময় (রোগ) জন্মে।

এখানে 'আময়' কথাটি লক্ষ্য করিবার মত।

এরূপ খাদ্য প্রায়ই নিষিদ্ধ, তবে মধু ও লবণ মৃদু বায়ু প্রশমিত হয়। মহাঋষি চরক বলেন

(ক) মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুকে জয় করে।

(খ) কষায়, মধুর ও তিক্ত রস পিত্ত নাশ করে।

(গ) কষায়, কটু ও তিক্তরস শ্লেষ্মা নাশ করে।

মহর্ষি চরক অতিমাত্রায় লবণ সেবন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 'পিপ্পলীক্ষারলবণাদিনাত্যুপযুঞ্জীত' অর্থাৎ বেশী মাত্রায় পিপুল, ক্ষারদ্রব্য বা লবণ সেবন করিবে না।

'মাত্রয়াঃ মাত্রজ্ঞঃ পুরি পর্যুষিতঃ হং।

উচ্ছিষ্টমপি চাহারং ভোজনঃ স্যাদপ্রিয়ম্'।

আহার গ্রহণ করার পর এক প্রহর অতীত হইয়া যায়, যাহার রস যা সাঁতসেঁতে থাকে না, যাহা দুর্গন্ধ (গুরুপাক প্রকৃতি), যাহা বাসি, যাহা অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট অথবা যাহা অপবিত্র, সেইরূপ খাদ্য রাজস লোকদের প্রিয়।

রাজস খাদ্য কখনও দুঃখ দেয়, কখনও বা বিরোধ উৎপন্ন করে। মনু মহারাজও কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দিতে বা কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন যেন, খ্রীষ্টের নির্দেশ অনুসারে একদের হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতিতে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। এ কালের 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল' কথাটির অর্থ হয়তো অনেকের জানা নাই। এখানে 'বিশুদ্ধ' অর্থে 'বিগত হইয়াছে শুদ্ধ লোক যাহা হইতে'।

যাহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাহেন, তাঁহাদের সকল বিষয়ে মাত্রা অনুসারে চলা উচিত। মহর্ষি চরক এই মাত্রার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। শুধু স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া নয়, আমাদের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিতে হইলেও সকল বিষয়ে পরিমিতি-বোধ রক্ষা করা প্রয়োজন। জীবনে যিনি সংবিষয়ে মাত্রা রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি জীবন-শিল্পী। ভগবান ভথাগত ও মনস্বী এরিষ্টটল্ একই ন্যায়পন্থার কথা বলিয়াছেন। এরিষ্টটল্ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, Virtue is a means between two extremes.

খ্রীষ্টান খ্রীষ্টভক্তরা বলিয়াছেন, যাহারা বেশি খায়, তাহাদের রোগ (চিত্তের একাগ্রতা) হয় না, যাহারা একান্ত অনাহারে থাকে, তাহাদেরও হয় না, যাহারা বেশি ঘুমায়, তাহাদের হয় না, যাহারা বেশি জাগরণশীল, তাহাদেরও হয় না।

মাত্রাস্বরূপ ভোগোঽপি ন চৈকান্তনিষঙ্গতঃ।

ন চাতিবর্জনীলস্য ভাগ্যতো নৈব চাত্মনঃ'।

মহর্ষি চরক বলেন -'মাত্রাশী স্যাৎ' অর্থাৎ মাত্রা অনুসারে ভোজন করিবে এটি আধ্যাত্মিকের আছে, 'মাত্রাশী কে'? বিদ্বের এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদ্যরাজ বলিয়াছেন—যিনি ক্ষুধা ক্ষয় বা জীর্ণ হইলে হিতকর খাদ্য পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করেন এবং আহারের পর বাম পার্শ্বে শয়ন করেন, তিনিই মাত্রাশী। আমাদের দেশে একটি প্রবচন আছে — 'বেশি খাবিতো অল্প খা, অল্প খাবিতো বেশি খা'। মনু মহারাজ অতি ভোজন-সম্পর্কে বলিয়াছেন—

'অনারোগ্যমনায়ুষ্যা অস্বর্গ্যাচাতিভোজনম্।

অপুণ্যা লোকবিদ্বিষ্টা তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ'।

অতিভোজন রোগজনক, আয়ুর অপকারক, স্বর্গের প্রতিবন্ধক, পুণ্যনাশক এবং লোকে নিন্দনীয়, সুতরাং ইহা বর্জন করিবে।

অবশ্য উপবাসে অতিভোজনের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের অনেকে fast-cure বা লঙ্ঘন-চিকিৎসার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ feast-cure এর কথা বলিয়াছেন কিনা জানি না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আহুর্বেদে লঙ্ঘনবিধি অনুমোদিত, ইহা উল্লিখিত আছে। অবশ্য নিদানের চিকিৎসা একটি স্বতন্ত্র

আছে, 'অতিসারে বিরেচনার্থং ক্ষীরপানম্', অর্থাৎ অতিসারে বিরেচনের জন্য ক্ষীর পান করিবে কিন্তু ইহা একজন আধুনিক চিকিৎসা বলিয়াই মনে হয়। আসলে ইহা বিশেষ অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালী।

'নিদান'-প্রণেতা মাধব কর বলেন, 'অতি-ভোজনের ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মে, আর এই অজীর্ণই হইতেছে সকল ব্যাধির মূল।

পাকের অভাবেও যে অপুষ্টিজনিত নানা রোগ হয়, সে কথা সকলেই জানেন।

সুনিদ্রার দ্বারাও যে মানুষের দেহের পুষ্টি হয়, মহর্ষি চরক তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 'নিদ্রা শ্লেষ্ম-তমোভবা', শ্লেষ্মা ও তমোগুণের মাত্রা অধিক হইলেই অতিনিদ্রা হয়, সুতরাং এই অতিনিদ্রাকে দূর করিবার জন্য যাঁহারা চা বা কফিপান কিংবা ধূমসেবনের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

মহর্ষি চরক ব্যায়ামের প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 'মাত্রয়া চ সমাচরেৎ' অর্থাৎ, পরি-মিত মাত্রায় ব্যায়াম করিবে। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন —'ব্যায়াম, ক্ষান্তি, কথা বলা, পথ-পর্যটন, স্নানাদি ও রাত্রি-জাগরণ, এগুলি কর্তব্য হইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতিমাত্রায় ইহাদের সেবা করিবে না।

"ব্যায়ামহাস্যভাষাধ্বস্নানাদীন্যপি কুর্বতা।
মৌচিত্যাদপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রতা"।

সুতরাং মহর্ষি চরকের মতে যিনি সংযমী, তিনিই বুদ্ধিমান। সকল বিষয়েই তাঁহার জীবন সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি সকল বিষয়ে পরিমিতি রক্ষা করেন ও যথাকালে নিদ্রা কর্ম সকল করেন। তিনিই ঔষধমুষ্টির যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারেন—

'মুষ্টাহারবিহারস্য ধৃক্তচেষ্টস্য কর্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

যিনি আহার ও বিহারে মাত্রা রক্ষা করেন, সকল কর্মে পরিমিত চেষ্টা করেন, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণের কাল ও পরিমাণ নির্দিষ্ট তাঁহার পক্ষেই যোগ দুঃখ-নাশক হয়।

— —

মুষ্টিযোগ বা সহজ চিকিৎসা

(চক্রপাণি)

আয়ুর্বেদের চিকিৎসা নৈপুণ্যের উৎকর্ষ, প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং ইহার চাক্ষুষ ফল যে কত বিস্ময়কর তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় যখন দেখি সুদূর গ্রামে গ্রামে শুধু শিক্ষিতের মধ্যে নয়, অশিক্ষিতের মধ্যেও সাধারণ সর্দি-কাশি, এমন কি, জটিল ব্যাধিতেও সহজলভ্য, গাছ গাছড়া ও ঘরোয়া দ্রব্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান গ্রামবাসীদের ছিল, কি এখনো আছে। জেলাসহর ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজনীতা ও কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। আজকাল কথায় কথায় চিকিৎসকের ডাক পড়ে এর অন্ত ও অপটু জনসাধারণ হইয়াছে, অবশ্য বিশেষ অবস্থায় ডাকা দরকার। একদিকে আহার বিহার অনুচর্যা ও দিনচর্যার অনাচার ও অনিয়মানুষ, অন্যদিকে অবশ্য বিজ্ঞান বুদ্ধির অনুকরণে ধরাবাঁধা জীবনযাপনের ফলে রোগ প্রবণতা ও সহনশক্তির হ্রাস অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। অভ্যাসের ফেরে ও শক্তির প্রয়োগে ক্রমাধর শক্তি আয়ত্ত করিতে ও অনুর বিপর্যয় রুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা বোধকরি নয়। এই হইল রোগ-না-হইবার পন্থা; আর রোগ হইলে সহজে প্রথম অবস্থায় (অবশ্য সর্বক্ষেত্রে নয়) মুষ্টিযোগ বেশ কাজ

করে। এরূপ বিনা-পয়সায় ও বিনা-আয়াসে এইরূপ চিকিৎসার প্রথা অন্য কোথাও নাই। এ স্থলে কয়েকটী মুষ্টিযোগের বর্ণনা প্রদত্ত হইল :—

(১) অম্ল ও অম্লপূল—আতপ চাউল চূর্ণ ও চাখড়ি একত্রে আধ তোলা সেবনমাত্র শূলবেদনা সঙ্গে সঙ্গে নিবারিত হইবে।

(২) কর্ণরোগ—তুলসী পাতা অথবা নিম-পাতার রস ঈষৎ গরম করিয়া কানে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

(৩) দন্ত রোগ—দুঁতে পোকাইয়া তাহার ছাই মাজিতে টিপিয়া ধরিলে লালা নির্গত হইয়া দাঁতের পোকাধ্বংস নিবৃত্তি হয়।

(৪) জিহ্বা ও মুখে ঘা—সোহাগা ও ফট্‌কিরির খৈ সমপরিমাণে মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া মুখে ও জিহ্বায় লাগাইলে অচিরে মুখের ঘা ভাল হয়।

(৫) চক্ষু-উঠা—এক ছটাক পরিমাণ গোলাপ জলে আধ আনা ফট্‌কিরি চূর্ণ দিয়া ঐ জলে পুনঃ পুনঃ চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু-উঠা সত্বর আরোগ্য হয়।

(৬) আগুনে পোড়া নারিকেল তৈলের সহিত চূনের জল বা তিল তৈলের সহিত শ্বেতসুরা চূর্ণ মর্দন-করত লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয় ও ফোস্কা উঠে না।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদের শুক্তি

(প্রাপ্তকার্য)

যাহাতে মন ও ইন্দ্রিয় অনুপহত হইয়া প্রকৃতিস্থ থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া সকলের উচিত। এ-স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উপায় নির্দিষ্ট হইল—

(১) সাম্বেন্দ্রিয়ার্থসংযোগে যুক্ত্যা সম্যগ্‌যোগজ্ঞাযোজ্য কর্মনাঃ সম্যক্ প্রতিপাদনের দেশ-কালাত্মগুণবিপরীতোপসেবনের চেষ্টা—আত্ম বিষয়ের সংযোগে ও বুদ্ধিসহকারে সকল নিরীক্ষণ করিয়া দেশ কাল ও আত্মার অবিরুদ্ধ ব্যবহার করিবে।

(২) আত্মহিত জিজ্ঞাসিতা সর্বং সর্বদা স্মৃতিমান্যায় সদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠেৎ—আত্মহিতৈষী ব্যক্তি সর্বদা সর্ববিষয়ে মন স্থির রাখিয়া সৎকার্য অনুষ্ঠান করিবে।

(৩) তদনুষ্ঠানং হ্যস্য সম্পাদয়ত্যারোগ্যম্ ইন্দ্রিয়বিজয়মায়ুষ্কামতা—সৎকার্য অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব আরোগ্য লাভ ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকে।

(৪) দেবদ্বিজাত্মাগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্যানর্চেৎ—দেব, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্যদিগকে অর্চনা করিবে।

(৫) যৌ কালাবু পস্পৃশেৎ—পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে জলদ্বারা আচমন করিবে।

(৬) মলাদ্যনেকতীক্ষ্ণ পাদরোগ্য বৈদ্যলাদ্যায়ায়ঃ—মলাদ্যন ও পাদদ্বয়ের সর্বদা নির্মলতা রক্ষা করিবে।

(৭) নিত্যমনুপহতবাসাঃ সুমনাঃ সুরভি স্যাৎ—সর্বদা অহিত বস্ত্রধারী প্রসন্নমনা ও সুগন্ধধারী হইবে। (চরক-সূত্রস্থান)

(৮) বিনাপি ভেষজৈর্যাতি পথ্যাদেব

নিবর্ততে।

ন হি পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি॥

—ঔষধ ব্যতিরেকে পথ্যের দ্বারা রোগমুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু পথ্যবিহীন ব্যক্তি শত ঔষধসেবনেও আরোগ্যলাভ করিতে পারে না।

শিশুরোগ ও তাহার প্রতিকার

রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

শিশুগণই জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক সুপুষ্ট রাখাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। পরিবার ও জাতিগঠনের পক্ষে সুপ্রজনন সর্ব্বতোভাবে প্রণিধানযোগ্য। উহার জন্য পিতার শুক্র ও মাতার আর্ত্তব দুষ্ট ও অক্ষত রাখা বিধেয়। তাহাও নির্ভর করে খাদ্য, জলবায়ু, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যনীতি অনুসরণের উপর। সরকারের শুধু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিলেই চলিবে না। যাহাতে জনসাধারণের খাদ্যের আয়োজন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য আয়বৃদ্ধি, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। আয়ের মানবৃদ্ধির সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের মানেরও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। তাহা না হইলে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; ফলে সামগ্রিক জাতীয় উন্নতি—সামাজিক, বৈষয়িক ও নৈতিক—নিশ্চিতই ব্যাহত হইবে।

দুগ্ধ দুইই শিশুর জীবন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃস্তন্য পান করে। জন্মের পূর্ব্বেই তাহার মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। সুতরাং মাতৃস্তন্য যাহাতে দূষিত না হয় তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

বয়স্ক লোকদের যে সকল রোগ হইয়া থাকে শিশুদের তাহা হইতে পারে এবং চিকিৎসাও তদনুরূপ হইবে, তবে শৈশব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি ও মাত্রা কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইবে। শিশুদের নিজস্ব কতকগুলি রোগ জন্মে তাহা বয়স্কদের আক্রমণ করে না। শিশু কথা বলিতে পারে না, তাই তাহার রোগনির্ণয় করা অনেকটা কঠিনতর কিন্তু সে রোগ-যন্ত্রণা যেভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা বিশেষ সতর্কতা ও অনুসন্ধিৎসার সহিত অনুধাবন করা দরকার। তাহার রোগ নির্ণয়ের কৌশল (১) রোগের তারতম্যানুসারে রোগের ন্যূনাধিক্য স্থির করা যায়; (২) কোন স্থানে বেদনা হইলে সেখানে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই স্থানে হাত লাগিলেই কাঁদিয়া উঠে; (৩) মস্তকে রোগ হইলে সে চক্ষু বুজিয়া থাকে, চক্ষু খুলিতে পারে না ও মস্তক হেলিয়া পড়ে; (৪) বস্তি বা মূত্রাশয়ে ব্যাধি হইলে প্রস্রাব বন্ধ, জলপান ও পিপাসা জন্মে; (৫) কোষ্ঠ বা আন্ত্রে ব্যাধি হইলে জলদুরোহ, ব্যাকুলতা, বমি, উদরাধ্মান ও উদরে শুষ্ক গুড় গুড় শব্দ হয়। রেচনের দ্বারা সাধারণত সর্ব্বাঙ্গের রোগই জানা যাইতে পারে।

আহারভেদে শিশু ত্রিবিধ স্তন্যপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। সাধারণত স্তন্যপায়ী ও দুগ্ধান্নভোজীদিগকে শিশু বলা যায়। স্তন্যপান এক বৎসরকাল, দুগ্ধান্নভোজী প্রথম বর্ষের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পর অন্নভোজী সারাজীবন, কেন না, অন্নভোজনের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে মৃত্যু পর্য্যন্ত।

প্রসূতি যাতায়াত বিচার করিয়া চলিবে, তাহা না হইলে স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হয়, আর শিশু পীড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আচার-বিচারের হিসাব করিয়া চলা প্রসূতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহা প্রায়ই অগ্রাহ্য করা হয়। সাধ্যমত ও অভ্যস্ত পাইলে আর কথা নাই। গর্ভাবস্থায়, এমন কি, প্রসূতির অবস্থাতেও আহারবিহার

লক্ষ্য করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে শুক্রন্যস্থ বিশুদ্ধ রাখা প্রসূতি, বলিতে কি, শুশ্রূষাকারিণীর ও একান্ত কর্তব্য। বাহ্যের সংস্পর্শে হইলে শুক্র দুষ্ট উৎপন্ন হয়। সুতরাং কুপথ্য খাইয়া তাহা দূষিত করিলে নিশ্চিতই শিশুর রোগ হইবে। শুক্রস্থ দূষিত হইবার অন্যান্য কারণ- অধিক রৌদ্রতাপ, হঠাৎ দূষিত জল ও শীতলবায়ু সেবন, অগ্নির উত্তাপ, মেঘ ও কুয়াসা লাগান। গ্রাম্য ও বন্যাদি জন্তুর পরিবর্তনে শুক্র দূষিত হয়, জন্তু বিশেষেরও উহা সংঘটিত হইতে পারে।

শিশুর শরীর কোমল, তাই সে শীতাতপ সহ্য করিতে পারে না। গর্ভাশয়ে সে তরল পদার্থের মধ্যে অবস্থান করে, তাহার তাপ বায়ুতাপ হইতে বেশি। এই জন্যই শিশুর নাম শরীরকে শীতবাতাদিসহনক্ষম করিবার জন্য সর্ষপের খাঁটি সরিষার তৈল বা বন্যুর তৈল মর্দন করিয়া রৌদ্রে রাখিবার প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। খাঁটি সরিষার তৈল শ্লেষ্মনাশক। উহা মর্দন করিলে শ্লেষ্মা বিনষ্ট এবং শরীর দৃঢ় ও স্নিগ্ধ হয়। বাহ্য কারণে, না প্রসূতির স্তন্যপানে বা টীকা লাগিয়াই শিশুর রোগ হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে।

যে-পর্যন্ত শিশু আহারোপযোগী না হয়ে, সে পর্যন্ত শুক্রস্থ দূষিত যাহাতে না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। শিশু শীড়িত হইলে অনেক সময় স্তন্যদায়িনী ও শিশু উভয়েরই চিকিৎসা করা দরকার। গর্ভবতী অবস্থায় যেমন প্রসূতির অবস্থারও জননীর গর্ভস্থ শিশু ও ভূমিষ্ঠ শিশুর কল্যাণের জন্য আচার ও আহারাদি বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত।"

প্রসবের পর শিশু ও প্রসূতি উভয়ের সেঁক-তাপ দেওয়া ও সূতিকাগৃহ গরম রাখা উচিত। আজকাল তাহা বাদ দিয়া তাপশূন্যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে অগ্নিতাপের অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশু হঠাৎ শীড়িত হয় এবং প্রসূতির দূষিত রক্ত যথোচিত বহির্গত না হইতে পারায় শিশু ও মাতা উভয়ই এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশু মাতৃগর্ভে যেরূপ সন্তাপে থাকে, প্রসবান্তে যথিপ্রকৃতির সম্পর্কে তদপেক্ষা শীতল আবহাওয়ায় অবস্থান করে। তাই সেঁক-তাপের বিশেষ দরকার। প্রসূতির শরীর প্রসবান্তে শ্লেষ্মাবহুল হয়, তাই উদরে পেটে ও সর্বাঙ্গে সেঁক-তাপ দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর নাভিতে সেঁক দিতে হয়, তাহা না হইলে নাভি পাকিতে পারে। প্রসূতির গাত্রে ব্যথা, গ্লানি ও শরীরভার থাকিলে কালজীরা বাটা সৈন্ধব ও লুকদমযোগে সেবা, পথ্য জলসাগু ও জলবার্লি। উহাতে ঐ সব লক্ষণ মূলীভূত হইলে অন্ন বা দুগ্ধ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। প্রসূতিকে বাতলক্ষ্মীবিলাস, কফচিন্তামণি, লক্ষ্মীবিলাস, জীরকাদিযোগক বা কল্যাণলাভিই সেবন করাইলেও প্রসবোত্তর গ্লানির নিরসন হয়। মস্তিষ্কমূলনায়ক রোগ তাহাতে হইতে পারে না। অবশ্য আসন্নপ্রসবা নারীরও ঐ রোগ হইতে পারে। কিন্তু সেঁক-তাপ দিলে উহা ও সূতিকা রোগ আসিতে পারে না। 'প্রসবান্তে, অন্ততপক্ষে গর্ভস্রাবকালে গর্ভস্রাবের পর ও প্রসবরোধে যতদিন পর্যন্ত রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন একেবারে জলও পরিত্যাগ করা বিধেয়। মাতৃস্তন্যের অভাবে ছাগীদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ পান করিতে পারে। কোন কারণে স্তন্যপান না করিলে স্তনীস্তন্য ও আমলকীচূর্ণ একত্রে সমভাগে মধুসহ পুনঃপুনঃ লিহিয়া মর্দন করিবে।

শুক্রস্থদুষ্টই শিশুর জীবন। যে কোন রোগ হোক না কেন, শিশুকে স্তন্যদান দিতে নাই 'সর্বং নিবার্যতে, বালে স্তন্যন্তু নিবার্যতে'। শুক্র দূষিত হইলে মাতা প্রসূতির শুক্র পান করাইবে, প্রয়োজন হইলে

স্তন্যদায়িনীর চিকিৎসা করিবে বা সে লঙ্ঘন করিবে। এস্থলে লঙ্ঘন অর্থে স্তন্যদায়িনী লঘুভোজন করিবে।

স্তন্যদুষ্টিজনিত রোগ সাত প্রকার—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। বায়ুদ্বারা দূষিত হইলে স্বেদমূলজাত, পিত্ত দ্বারা দূষিত হইলে শুক্লচোষিকাজ, শ্লেষ্মাদ্বারা দূষিত হইলে তার্ণ্যাজিকাজ এবং সর্বপ্রকার স্তন্যদোষে স্বেদমূলজাত প্রযুজ্য। প্রবল স্তন্যদুষ্টি হইলে সবলা ও সুস্থকায়া অন্য প্রসূতির স্তন্যদুগ্ধ পান করিবে। তাহার অভাব হইলে ছাগীদুগ্ধ বা জল মেশানো দুগ্ধে জল মিশাইয়া পান করাইবে। বালপানী, চাকুলে, কুরণ্ডী অটিকারী ও শেফালিকার মূল সিদ্ধ করিয়া পান করাইলে আরও অধিকতর উপকার হয়।

মূত্রদোষে শিশুর উদরস্থ শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়, তাহাতে 'অনঃশিলাজ' অতি উপকারী। তদভাবে অনন্তমূলের পাতার রস মাখাইয়া প্রলীপের নিম্নে বসিলে যে কালী পড়ে তাহার কাজল প্রয়োগ করিবে। কঙ্কচিত্রাদি বা ত্রিফলাজিকাজ ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পাক্ষিমস্তিষ্করোগে (সাধারণ কথায় যাহাকে 'এঁড়ে লাগা' বলে) ত্রিফলাচূর্ণ বা বচ অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। উহাতে শিশুর অগ্নিবৃদ্ধি, শরীরে বল ও পুষ্টির সঞ্চার হয়—ইহাতেও উপকার না হইলে কুমার কল্যাণরস সেবন করাইবে।

'তালুরুগ্ন' রোগ শ্লেষ্মার প্রকোপে উৎপন্ন হয়। কঙ্কচিত্রাদি, হরীতক্যাদিচূর্ণ, চন্দ্রামৃত প্রভৃতি কফরোগোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ কঠিন হইলে বাসকরস প্রয়োগ করা যায়।

'অগদগন্ধরোগে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। পটোলাদিকাথ, কুমারকল্যাণরস ও অন্যান্য বিসর্প রোগোক্ত ঔষধাবলি অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিতে হয়।

'দুর্গা' বা নাভিনোষ-নাভিনালের নাড়ী কাটার দোষে অথবা নাড়ীতে যৌতিক সেঁক-তাপ না দেওয়ার জন্য কখনও কখনও শিশুর নাভি পাকিয়া উঠে। উহাতে যাষ্টির ক্বেলা পোড়াইয়া ঘৃতে ভুলাইয়া সেই সময়েই টাটাইয়া দেব, জলদী পাতার রস, ভাঙ্গচূর্ণ পোটলার বাঁধিয়া সেক দিলেও উপকার হয়।

'নাভিপাক' রোগ অবহেলিত হইলে কত হইতে পারে এবং কত হইতে 'নালী' হইতে পারে তাহা হইতে শিশুর মৃত্যুও হইতে পারে। নিম্নমূল, বাসের নবী প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। যষ্টিমধু, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু ও চন্দনের কাথে কত ধৌত করিবে। খদির নিম্বপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিলেও বিশেষ উপকার হয়। পটোলাদি, নালিবাদি কাথ পান করাইবে।

'গুহ্যপাক' হইলে দুগ্ধ দ্বারা হরিদ্রা ও যষ্টিমধু পৃথক পৃথক ঘষিয়া লেপভাগে একত্র করিয়া লাগাইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহা শিশুকে মধুসহ অল্প অল্প খাওয়াইবে। উহাতেও না সারিলে অগ্নিমুখ রোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

'অজপ্রী'-বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এই রোগ উৎপন্ন হয়। খদির নিম্বপাতা ও কাঁচা হরিদ্রা বাটিয়া সর্বাঙ্গে মাখাইলেও বেশ কাজ হয়। পটোলাদিকাথ ও রক্তশুদ্ধিনাশক অন্যান্য ঔষধও মাত্রামত সেবন করান যাইতে পারে।

পরোপ্লবজনিত নানা রোগে নানারোগোক্ত ঔষধাদি প্রযুজ্য।

'মুখপাক' ও 'মুখজিহ্বাদির ক্ষত' প্রশমনার্থ, কি ওষ্ঠ বা হইলে জাতিপাতা, মালতীপাতা বা তাহার মূল বাটিয়া মধুসহ লাগাইবে। ওষ্ঠ বা জিহ্বার ঘায়ে ভেলার মূল বা মাখার মূল লাগাইলে বিশেষ ফল দর্শে।

জ্বর শিশুর মুখ হইতে জ্বর নির্গত হইলে কফচিন্তামণি, তুলসীপাতার রস ও মধুসহ সেবনে বেশ উপকার হয়। বচচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়া মধুসহ একটু একটু করিয়া মুখে দিবে, আর প্রক্ষালন করিবার জন্য হিঙ, লোধ, অনন্তমূল ও যষ্টিমধুর ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। 'প্রজাবরণে' লেবুর রস ও চিনি একটু একটু করিয়া নাড়িতে বমন করিবে। পাথর চুনার পাতার রস বা বহেড়ার খাওয়াইলেও ফলপ্রদ হয়। পাথরকুচির পাতার প্রলেপ নাভিতে দিলেও প্রজার হয়।

বমন করাইতে হইলে শিশুকে মধু ও সৈন্ধব লবণ বা মুক্তাবলী পাতার রস খাওয়াইবে।

উদরাধানে' শ্বেতপর্পটি সেবনীয় অথবা তারপিনে জল মিশাইয়া জলপেটে মালিশ করিলেও কাজ করে।

কোষ্ঠকাঠিন্যে পানের বোঁটায় ক্যাষ্টার অয়েল মাখাইয়া অথবা মুক্তাবলী বা মুক্তাকুবিন্দ পাতার রস পাকোড়া মলদ্বারে প্রয়োগে বেশ ভাল কাজ করে। ক্যাষ্টার অয়েলে মধু মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় দিলেও বিরেচন হয়।

শিশুরোগ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব হইল না।

ঔষধের সঙ্গে অনুপানের প্রয়োগে জল ঔষধির হয়, এমন কি, সময়-সময় সাধারণ ঔষধেই বিস্ময়কর ফল লাভ করা যায়। রোগ হিসাবে অনেকগুলি অনুপানের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইল।

আমজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। জ্বর বিকারে—আদার রস, চন্দ্রাকষায় বা তালশাঁষের রস ও মধুসহ। নিরাময়জ্বরে এবং জীর্ণ বা পুরাতন জ্বরে—বেকালি পাতার রস, ক্ষেপাপড়ার রস, বা কালমেঘের রস ও মধুসহ। প্লীহাজ্বরে ও যকৃদ্দালযুক্ত জ্বরে—মণ্ডুর পোড়া ভৃঙ্গরাজ, কালমেঘের পাতার রস, তালের মটাজল, হিং, পিপুলচূর্ণ মনসাসীজের পাতা আগুনে গরম করিয়া নিংড়াইয়া তাহার রস। দোষে—শ্বেত বা লাল পুনর্নবার রস ও পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ। কাসে বা অযুক্ত জ্বরে—বাসকপাতার রস ও মধু, পিপুলচূর্ণ ও মধু কিংবা বাসকছাল, কিসমিস, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারিটির কাথ। শ্বাসে বা শ্বাসনালযুক্ত জ্বরে—মাকালফলের ছাল ও স্তনদুগ্ধ বা বহেড়াপোড়া ও স্তনদুগ্ধ। হিক্কায়—তুলসীর মাঝির শাঁস বাটা বা শশার বীচির শাঁস বাটা ও স্তনদুগ্ধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে কট্‌কীচূর্ণ অগ্নিমান্দ্যে—গরম জল বা যবাণী বা মোরোটিজান জল। আমাজীর্ণে—উষ্ণ জল। বিদগ্ধাজীর্ণে—চুনের স্বচ্ছ জল। বিষ্টব্ধাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধব লবণ। উরুস্তম্ভে, অরিলাব বা অবরোধনাশে মুথার রস ও মধু, আতাইচ চূর্ণ ও মধু বা বেলশুঠচূর্ণ ও মধু বা ইক্ষুগুড়সহ। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধসহ বা মুথা মধু, বেলশুঠসহ ও স্তন্যদুগ্ধ প্রশস্ত।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত গতবারও (ইং ১৯৬১-৬২ সালে) কলিকাতার পর্চা অঞ্চলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ৫৬ জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিশুগণ সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর দিন-মজুরী খাটা পরিবারের, ২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক। বয়স অনুসারে তাহাদের পুষ্টিহীন নিষ্প্রভ দেহ—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বিশেষতঃ ক্রিমিরোগের ফলে রক্তাল্পতা বিদ্যমান। খাদ্য তাহাদের অতি সাধারণ ও আনুপাতিক হারের কম—আহার্যে রবি, মাংস, শর্করা জাতীয় দ্রব্যের একান্ত অভাব। ইহার উপরে স্বাস্থ্য-রক্ষানীতি অবহেলিত স্থানীয় পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। অভাবের সঙ্গে যে অলসতা, উদাসীনতা ও অনিয়ম, দুর্বলতা ও উৎসাহহীনতা নিরানন্দ জীবনে প্রসার লাভ করে তাহাই পরিদৃষ্ট হইল। বলিতে গেলে, শতকরা ১০ জন নিরোগ, ৫০ জন যকৃৎ দোষজনিত অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রকৃতি রোগে আক্রান্ত এবং বাকী ৪০ জন ক্রিমি ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত। সহরের অনুন্নত ও অনাদৃত অঞ্চলে এইরূপ যে কত শিশু অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জাতির অবক্ষয় আনয়ন করিতেছে তাহার দিকে সরকার ও জনসাধারণ দৃষ্টি দিলে জাতির ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইত। পরিষদের উদ্যোগে এইরূপ অন্যান্য অঞ্চলেও স্বাস্থ্য-সমীক্ষা পরিচালিত হইবে। কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীবিনয় ভূষণ দাশ গুপ্ত ও শ্রীসুশীল কুমার চৌধুরী এই সমীক্ষা কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

নববর্ষ

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার

এই জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জর অতীতের
ঝরিয়ে দাও, ঝরিয়ে দাও,
রুক্ষ চৈত্রের চিতানলে ঝরিয়ে দাও।

নতুন বরষ এনেছে নতুন হরষ
সবুজ পল্লবপেলব নয়ন-পাশে—
ধরাপাতার মর্ম মায়াঘুম
ভুলিয়ে দাও ভুলিয়ে দাও।

যৌবনেরই বজ্রমদীন তীব্র উল্লাসে
আকাশ ধাতাসে ভেসে ওঠে কার আশ্বাসে!
শুকপিয়রে ছোঁয়াচ লাগল সবার প্রাণে,
সুরতালে আলোর ঝরনা বাজে ঝলতানে—
চির-লক্ষিত ঘোর মলিনতা
ধুইয়ে দাও, ধুইয়ে দাও।
আবার ধারা যেন চলে পথে অচেনার
জাগ্রত হৃদিতলে নব আশা জীবনের;
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ফুর্তি কার বাজেরে
উতল হাওয়ায় মেঘের ঘোলায় ছুটে রে—
ঐ এল নবীন, এল সুদূরে
এগিয়ে দাও, এগিয়ে দাও।

রুক্ষ করি বিলাসবিহ্বল হৈত্র জীবনে
যিনি মেরু রক্ত পার হয়ে মৃত্যুপারে
চলেছে সৃষ্টির নব উৎসব মুখর ছন্দে
জরাজীর্ণ সত্তা মানুষের নিষ্ঠুর আনন্দে—
জয় পরাজয়ে ভীতিমান
জাগ্রত হও, জাগ্রত হও।

বনে বনে লাগল আগুন কৃষ্ণচূড়ার
নবীন লোহাগে শিহরি ওঠে শস্যাকুল,
বাসুকরে পাখীর মিলন তরুশাখে নীড়
পল্লীমায়ের সবুজ কোলে বিচিত্রেরি ভীড়—
সোণার ধরণ অরুণরাগে
রাঙিয়ে দাও, রাঙিয়ে দাও।

কুলুকুল রাবি তটিনী চলে জোয়ার জলে
ধরিত্রি বিহ্বল তলে যেন তরুণী ভোলে।
ধরণী উঠেছে জাগি উষার কিরণ লাগে
দিকে দিকে মহীয়ের প্রকাশ অদ্ভুত রাগে—
বঞ্চিত মোর শূন্য পাত্রখানি
পূর্ণ করো, সদা পূর্ণ করো।

(৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

and the production of trained medical staff for the practice of Ayurveda. Asoka was filled with a larger ambition of not confining the blessings of India's medical science within the boundaries of India, but extending them to the other countries of the world, in a spirit of universal brotherhood. He devoted the resources of the Indian exchequer to the sacred mission of promoting human welfare without reference to the geographical limits of national, racial or religious boundaries by equipping with necessary materials and resources, medical and moral missions and despatching them for work in select European countries with which he was on terms of friendship and goodwill. There were the five western countries which were then ruled respectively by the following kings as his contemporaries, viz. (1) Antiochus II Theos of Syria (261—215 B.C) (Amtiyoka), (2) Ptolemy II Philadelphos of Egypt (285—247 B.C) (Turamaya), (3) Antigonos of Macedonia (278—239 B.C.) (Anitikini), (4) Magos (Maka) of Cyren (300—258 B.C.) and (5) Alexander (Alikasundaro) of Epirus who lived up to 258 B.C. Thus it was left to an enlightened Indian King to introduce to Europe in a rare spirit of universal brotherhood the science and practice of Ayurveda and the blessings of medical progress which was so singularly achieved by India in the ancient world, in pursuance of his supremely liberal principle of non-violence and respect for the sanctity of all life and God's creatures, whether man or animal. Side by side with Asoka's medical and welfare missions thus working in foreign countries, were also working his moral mirsions for establishing peace in earth and good-will among men by preaching the new principle of universl brotherhood, the principle of Dharma-Vijaya, of morl and cultural conquest, and not the bloody conquest of violence thus enshrining the force of law and not the law of force, in human relations.

পাইওনিয়ারের ফেডি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী। সুতরাং প্রথম গর্ভাবরণ হিসাবে পাইওনিয়ারের ফেডি ব্যবহার করা উচিত।

পাইওনিয়ার লিটিং মিলস্ লিঃ
"পাইওনিয়ার বিল্ডিং"
বি, টি, রোড, কলিকাতা-২

প্রাণিক প্রেস, ২১৮১ পটুয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও ৩১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে তাঁহা প্রকাশিত।

সংক্রামক ব্যাধি!

সভ্যতার পুষ্টিকৃত কুসংস্কারের সমাজ নিশ্চিহ্নিত সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে করতো ঘৃণা—দূর দিত তাকে সমাজের বাহিরে।

আজ আছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সে স্থানে পেয়েছে আত্মীয় শ্রেণীর স্থান, যোগযুক্ত হচ্ছে-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরের বহু বছর অভিজ্ঞতায় চিকিৎসা জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও ধবল-কুষ্ঠ, একজিমা, সোরাইসিস্ ও নানাপ্রকার কঠিন কঠিন চর্মরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হচ্ছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, পুরাতন হাওড়া। ফোন—৬৭—২০৪৯

শাখা—৩৬ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

ভারত সরকারের স্বীকৃত পত্রব্যাধিক চিকিৎসা পরিষদের সভ্য রাজৈবদ্য কবিরাজ ডাঃ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় আয়ুর্বেদ-ভারতী প্রণীত গ্রন্থ ও ঔষধাবলী

১। বল চিকিৎসা ৩ খণ্ড ৯+৯+৮=২৬
২। যক্ষ চিকিৎসা ২ খণ্ড ৪৲+৯=১৩৲
৩। মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা ৬৲
৪। বাতরক্ত চিকিৎসা ৮৲
৫। হিন্দুস্থানে খাদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯৲
৬। আর্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ২৲
৭। মোজয়স—বল, পুষ্টি ও রক্তবৃদ্ধির মহৌষধ। মূল্য বোঃ ৬৲
৮। পুলপাল্লি—সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মূল্য বোঃ ৪৲
৯। কামদেবু—সর্বপ্রকার দুর্বলতার মহৌষধ। মূল্য বোঃ ৪৲

বিস্তৃত বিবরণ পত্রের জন্য পত্র লিখুন।

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদি ভবন

১৭৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৯-৪০৫৯
৬১১, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রিটের মোড় পার্ক সার্কাস-৭০ ফোন: ৪৬-১৮৭৭

আয়ুর্বেদ-ভারতী

উপদেষ্টা মণ্ডলী

সভাপতি কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীপরিমল সেনগুপ্ত
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী
কবিরাজ শ্রীনূপারি মোহন ঘোষ
কবিরাজ শ্রীমতীন্দ্র নাথ গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মা
কবিরাজ শ্রীনাবাদল কৃষ্ণ সেনগুপ্ত
কবিরাজ শ্রীমতুল বিহারী দত্ত
অধ্যাপক শ্রীজিতীশ চন্দ্র আচার্য
কবিরাজ শ্রীঅভিরামশঙ্কর শাস্ত্রাল
কবিরাজ শ্রীউদ্ভূষণ সেন

সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়

আয়ুর্বেদ-ভারতী

(আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র)

★

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম. এ. আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়

১১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা ৭১ নঃ পঃ কার্তিক, ১৩৬৮ বার্ষিক—সডাক ৬৲

আয়ুর্বেদ-ভারতী সূচীপত্র—কার্তিক, ১৩৬৮

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়		৫৫
২।	গীতায় আয়ুর্বেদ	অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	৫৮
৩।	বৈদিক ভারতে আয়ুশ্চিন্তা—	ডঃ শ্রীমতিলাল দাস	৬১
৪।	নিমের ব্যবহারবিধি—	কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা	৬৯
৫।	সরীসৃপাদ্যম্—	কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ কাব্যতীর্থ	৬৭
৬।	চক্ষুর মনোবীক্ষণের রূপরেখা—	কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ	৬৯
৭।	দংষ্ট্রাঘাতক ব্যাধি—	কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন	৭১
৮।	মূষ্টিযোগ বা সহজ চিকিৎসা—চক্রপাণি		৭৪
৯।	আয়ুর্বেদের মুক্তি—প্রাণাচার্য		৭৫
১০।	গর্ভবতী নারী—	কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৈদ্যশাস্ত্রী	৭৬
১১।	চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা—	কবিরাজ শ্রীকমলাকুমার মজুমদার	৭৮
১২।	আয়ুর্বিজ্ঞানের আলোকোৎসব—	শ্রীভবনীকান্ত মৈত্র	৭৯
১৩।	বিচিত্র প্রসঙ্গ—		৮২

আয়ুর্বেদ-ভারতী

উপদেষ্টা মণ্ডলী

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীকমলাকুমার মজুমদার
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, আয়ুর্বেদ-ভারতী

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি
কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী
কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন
কবিরাজ শ্রীহেমন্ত কুমার গুপ্ত
অধ্যাপক শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী
অধ্যাপক ডঃ শ্রীহুমায়ুন চক্রবর্তী
কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চাল
কবিরাজ শ্রীনারায়ণ কৃষ্ণ সেনগুপ্ত
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মল্লিক
কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ
কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মা
কবিরাজ শ্রীমঙ্গল বিহারী গুপ্ত
সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Rasa-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.

Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE

Baidyanath

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD

CALCUTTA - PATNA - JHANSI - NAGPUR - ALLAHABAD

কবির কণ্ঠে
নূতন করে
উচ্চারিত হ'লো—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে —
অমৃতস্য পুত্রাঃ

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

স্মরণাতীত কাল হইতে

স্মরণাতীতকাল হইতে কৃষ্ণরাজ মানবজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া আসিতেছে। ইহার বহুবিধ গুণাবলী প্রয়োগপদ্ধতি ও উপকারিতার কথা সকলেই জানেন। আমাদের মহাকৃষ্ণরাজ তৈল উৎকৃষ্ট উপাদানাদি সংযোগে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রণালীতে বিশেষজ্ঞের নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। কাজেই ইহার বিশুদ্ধতা ও উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

সাধনার
মহা কৃষ্ণরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

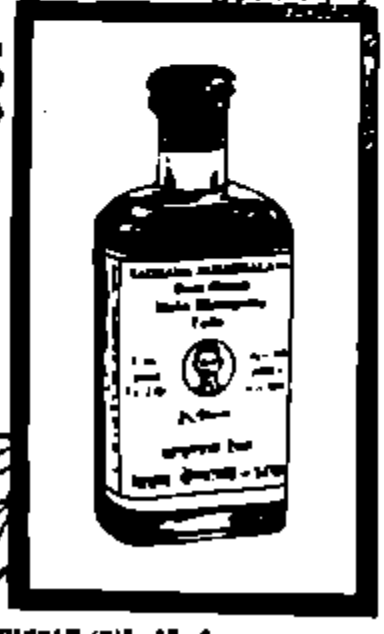

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (লণ্ডন) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম. বি. এস, (লণ্ডন) এম, বি, এস,(আমেরিকা)
ভারতবর্ষ অক্সফোর্ড চরকের নামের কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যাপক।

আয়ুর্বেদ-ভারতী

"যথা তেষাং মহৌ, তথা তেষাং ঔষধ,
যে তেষাং বিধা মুখমাশ্রিতেষু।
যে ঔষধীষু তথা মনুষ্যেষু,
তাংশ্চ তেষাং মহৌ নমঃ॥"

ত্রৈমাসিক
১ম বর্ষ

কার্তিক - ১৩৬৮

২য় সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির সহিত মানুষের সংযোগ অনিত্য ও চিরন্তন। চেতন ও অচেতন পদার্থ সৃষ্টির মূলে পঞ্চভূত, সুতরাং দেহ নীরোগ রাখিতে হইলে উহাদের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে হইবে। আলো, জল, বাতাস, রোদ ও মৃত্তিকা শরীরকে সুপুষ্ট, সবীর্য ও ক্ষীণ করে আহার্যের মধ্য দিয়া, আবার বাহ্যিক সংস্পর্শে জড় ও জীব, বলিতে কি, বিশ্ব-প্রকৃতিকে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে এবং ক্ষয় করে। মোট কথা, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেছে একটা চির-চঞ্চল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া, তাই এত বৈচিত্র্য, সৃষ্টি ও প্রকাশ।

মানুষ যখন প্রথম বিশ্ব প্রকৃতির সম্মুখে চক্ষু মেলিল সে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল এত ঐশ্বর্যে ও বীর্যে। তাই, মেধি বৈদিক ঋষি হইতে মূল পুরাণান্তরের ইতিহাসে মানুষের সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা বাঁচিবার জন্য, বৃদ্ধি পাইবার জন্য—মানুষের 'স্বাস্থ্যের' উদ্দেশ্য হইল রোগ নিবৃত্তি করা, চিরস্থায়ী, অক্ষুণ্ণতা এবং স্বাস্থ্যের ঐ অর্থই। উহাতে দেহে রোগ প্রতিষেধক শক্তিরূপে যাহাকে চরকোক্ত 'ওজ' বলে। শিশুকাল হইতে এই রোগদমন শক্তি মাতার আহার ও চলাফেরার মধ্য দিয়া সুপুষ্টি ও বৃদ্ধি পায়। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি—প্রকৃতি দুই প্রকার। অন্তঃপ্রকৃতির গঠন, বৃদ্ধি ও সহনশক্তি নির্ভর করে বহিঃপ্রকৃতিকে আয়ত্তাধীনের উপর আলো, জল, বাতাস ও মাটির সহিত দেহকে যা সওয়ান হয়, তাহাই দেহ অধিকৃত ও নিরাময় থাকে প্রকৃতিকে বাদ দিয়া চলিলে প্রকৃতি তাড়ার পরিশোধ নিয়া থাকে নানা বিকৃতি ও রোগের মধ্য দিয়া।

দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধক শক্তিই দেহকে রোগের হাত হইতে রক্ষা করে। জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে। এই শক্তি রোগে, অনিয়মে ও অতিরিক্ত মাত্রায় হ্রাস পায়। ঔষধ রোগ বিমুখীত করিয়া প্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সহ্য-শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সহ্যশক্তি নানালোকের নানা-রকমের এবং চলাফেরা, আচার-ব্যবহার ও দৈনিক কাজের মধ্য দিয়া হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায়, কেহ দুর্বল—তাহার বেশি শীতলতা সহ্য হয়। কেহ সবুজে নাকি তাহার সবুজের টম্যুক্ত রাঙ্গা সহ্য হয়। কেহ মেঘের তাহার মত আবর্জনা ও দুর্গন্ধ সহ্য হয় কিন্তু রোগ হয় না। আবার যাহারা পর্বতকে চলে তাহাদের পায়ের শক্তি বেশি ও সহ্য শক্তি তুলনায় বেশি। যাহারা নির্ম্মী, অলস তাহাদের সহ্যশক্তি, কর্ম্মশক্তিও কম। যাহারা রৌদ্রে বৃষ্টিতে চলাফেরা বা কাজ করে তাহাদের রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির সৈতা সহ্য হয় বেশি—অল্পমা অল্পুর পরিবর্ত্তনে অল্পুর সৌহার্দ্য সহ্য করিতে না পারিয়া রোগগ্রস্ত হয় যেমন এখন শীতের আরাম আসি-য়াছে, আর সর্দ্দি, কাসি, গাবাবা ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং অটুট স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সর্ব অবস্থার মধ্য দিয়া শিশুকাল হইতে অভ্যাস করান দরকার। যাহাদের পরিশ্রমের কাজ নাই বা ব্যায়ামের অভ্যাস নাই তাহাদের সহ্য শক্তি কমে, পরিপাক শক্তি হ্রাস পায়, ফলে পরিপুষ্টির অভাব হয়, জড়তা আসে ও কর্ম্মবিমুখতা স্বভাবগত হয়, রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী দেখা দেয়। কষ্টই জীবন, কর্ম্মহীনতাই মৃত্যু।

রোগ হইলে চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাহাতে না হয়, তাহাই আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য। তাহার বক্তব্যকে স্বাভাবিক ভাবে দেহকে রোগমুক্ত রাখিবার উপদেশ আছে, দেহপ্রকৃতিকে রক্ষার উপায় ও উহা বিকৃত হইলে প্রতিকারের উপায় বর্ণিত আছে। বাতাদি দোষের প্রকৃতি রক্ষার উপায় ও বিকৃতি ঔষধের পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা আছে। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবনের বিষময় ফল আজকাল পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে শহরে। শিল্পোন্নতি ও যন্ত্রমানবের সৌজন্যে ও আতিশয্যে মানুষ হীনবীর্য ও শক্তিহীন হইতেছে। যন্ত্রসাহায্যে সরল ও আরোগী জীবনের ফল রোগবাহুল্য ও স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস। প্রকৃতিকে বাদ দিয়া যখন অথনে বসনে, শয়নে ভাগণে ও চলাফেরায় কৃত্রিমতা পাইয়া বসে তখন রোগবাহুল্য ও সহ্যশক্তিহ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ তাহার পূর্ব পুরুষ অপেক্ষা হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছে। পরিপাক শক্তি ও আহারের মাত্রা কমিয়াছে। ইহা হইতেছে বিকৃত রুচি, আরোগী জীবন, পরিশ্রম বিমুখতা ও অসময় আহার ও আহারের ফল সর্বোপরি তাদের প্রতিক্রিয়া। সহীর সঙ্গে স্থিতির ব্যবস্থাও রেখে আছে—তাহাকে বাড়ানও যায়। অবশ্য আজকাল স্বাভাবিক সহ্য-শক্তি বৃদ্ধি করিতে যে নিয়ম পালন করা প্রয়োজন-যে স্বল্পমাত্র অনুশীলন করা বিষের তাহাকে আচার-গত করিবার অভাবে ভয়ে সিরাম্, ভ্যাক্সিন গ্রহণ করিবার প্রথা হইয়াছে। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যুগীয়ের সিরাম ও ভ্যাকসিন গ্রাহক যদি দিলে সমগ্র লোকসংখ্যা স্বাভাবিক রোগসহ্য শক্তির প্রভাবেই নানা রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। আর উহা যথাযথ ব্যবহারের জন্য যে বিরাট হাসপাতাল, পরীক্ষাগার ও চিকিৎসক দরকার এবং ইহার জন্য যে অজস্র অর্থের প্রয়োজন, তাহা কোন সরকার বহন করিতে পারে না। অপরপক্ষে, তাহা পাইলেও উহাতে স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক প্রতিরোধক শক্তি নষ্ট হয়,

পারিপার্শ্বিকতাও হ্রাস পায়। সুতরাং স্বাভাবিক রোগসহ শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য শিশুকাল হইতে প্রকৃতির ক্রোড়ে—মাঠে ঘাটে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে নানা খেলাধূলার মধ্যে জীবন যাপন শিক্ষা করা প্রয়োজন। আজ কৃত্রিম ও সহজ জীবনের পার্থক্য পড়িয়া শিশিরের মধ্যে দিন দিন শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। অল্পেই সর্দ্দি হইতে হইতে দেহও যে অল্পেতে পরিম্লান হয়, এই জ্ঞান এখনও লোকের চিন্তার মধ্যে আসে নাই। তাই অল্প পরিবর্ত্তনে অসুখ ও নিষ্ক্রিয়তা জীবনের প্রতিক্ষণে হইলেই রোগাক্রান্ত হয়। যে আবহাওয়ায় মানুষ বাড়িয়া উঠে তাহা একান্ত প্রকৃতিবিরোধী। তাই প্রকৃতি তাহার পরিশোধ নেয়। এক দিকে যেমন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, অন্যদিকে তেমন নূতন নূতন রোগের জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে। জীবন যুদ্ধ যেরূপ তীব্রতর হইতেছে তাহাতে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া দরকার।

এক একটি লোকের গঠনই এমন যে তাহার সহ্য শক্তি বেশি· রোগ কম হয়, আর হইলেও তাড়াতাড়ি সারিয়া যায়। ডাক্তার ডেকে বেশি ডোড়াজ করিতে হয় না। আবার কতকগুলি লোক আছে যাহারা ছোট বেলা হইতেই রোগা, নিয়মনিষ্ঠ না হইলে বেশিদিন সুস্থ থাকে না। বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভিন্ন রকম, তাই খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ ও বেহগঠন বিভিন্ন। আবহাওয়ার সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রভাব দেহে ও মনে, নীতি ও আদর্শে সংক্রামিত হয়। সৃষ্টির দিক হইতে বিভিন্ন জাতের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার সংস্পর্শে কিছু গ্রহণ করিবার থাকিলেও নীতি ও আদর্শ, আহার বিহার ও সামাজিক নিয়মকানুন যেখানে প্রভাবান্বিত করে, সেখানে ফল ভাল হয় না। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ তাহার বিভিন্ন অঞ্চলে আবার বিভিন্ন জলবায়ু, আচারব্যবহার। তাই দেখা যায় পোষাকে, আহারাচারে বিভিন্নতা- বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশের কথা বলা যাক্। ইংরেজ আমলে কোট প্যাণ্ট পরিলেও আজকের দিন হইতে উহা অস্বাস্থ্যকর, স্বাধীন ভারতে উহার প্রভাব অনেক বাড়িয়াছে- উহা দেহে ও মনে জড়ি বিকৃতিই জন্মায়। এই দেশে প্রয়োজন এমন পোষাক যাহাতে বাহিরের আলো বাতাস দেহে লাগিতে পারে। বৎসরে বেশির ভাগ আবহাওয়াই গরম। শীত প্রধান দেশে যে পোষাকের প্রয়োজন তাহা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য-বিরোধী। সেইরূপ আহারেও এ দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহাই হেমন্ত ও সহজ পরিপাচ্য। বৈচিত্র্য বা বৈচিত্র্যের লোভে যাহারা নীতি-রীতি ত্যাগ করিয়াছে তাহারা বাস্তবিকই ঠকিয়াছে আত্মশক্তিরই ক্ষয় হইয়াছে, লাভ হয় না।

বয়স অনুযায়ী মনেরও পরিবর্ত্তন হয়। বিদেশীর সহিত বিদেশীয়ানা, দেশীর সহিত দেশীয়ানা এক্ষেত্রে লোকের পক্ষে কোন কোন সময় তাহা অনুকরণযোগ্য হইলেও দেহের প্রকৃতি ও রুচির বৈসাদৃশ্যে দৈহিক ও মানসিক রোগও হয় শক্তিও হ্রাস পায় এবং বিজাতীয় মনোভাব জন্মে। যুক্তিযুক্ত লোকের বিকৃত আচার সকলের উপর চাপাইয়া দিবার যৌক্তিকতা কখনো হইতে হয় না—তাহাও না। তাহাতে বিশ্ব মৈত্রীর ভাব কিছুটা জাগিয়া করা যায়, আসলে জাতিগত সংস্কারাবলির অপলাপ ঘটে। জলবায়ুর সহিত দেহের গঠন, শক্তি, আচার ব্যবহার, খাওয়াদাওয়ার সংস্কার হয়। এই সংস্কার ও অভ্যাসে দৈহিক ও মানসিক সহজশক্তি সঞ্চিত হয়। দেহে ও মনে যার সহজশক্তি আছে, সেই শান্তিতে বাঁচিতে পারে।

দেশ, কাল ও পাত্র একটা চিরন্তন দৈহিক ও মানসিক নিয়মের মধ্যে চলে, তাহাতেই থাকা ভাল

থাকে—সত্ত্বশক্তি অব্যাহত থাকে ও বৃদ্ধি পায়। জলবায়ুর বিভিন্নতার ফলে মানসিক বৃত্তি ও দৈহিক গঠনে যে বিভিন্নতা আসে তাহা জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্থানগত মাহাত্ম্য প্রকটিত করে।

একদিকে যেমন পঞ্চভূতের সেবা, অন্যদিকে তেমন সব ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সেবা করা দরকার যত ও মাত্রা অনুযায়ী। অবশ্য, বিশেষ অবস্থা বাতীত তৈলমর্দন ও ব্যায়াম ও স্নানেরই মেহ ও স্নিগ্ধ সংস্পর্শ ও ক্রিয়াশীল রাখিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়। সংযমই শান্তি—অসংযম অশান্তির পথ। সংযম ও শুচিতা এক নহে—একটি অন্তরে সৃষ্টি, অপরটী আসে বাহির।

বিজ্ঞান বিতান

গীতায় আয়ুর্বেদ

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম এ

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'অহমৌষধম্, (১৫।১৪) অর্থাৎ আমিই ঔষধ। কিন্তু তিনি কখনও বলেন নাই—'আমিই রোগ,' কেননা, রোগ হইতেছে দেহের বিকৃতি, আর যাহাকে আমরা স্বাস্থ্য বা সুস্থতা বলি, তাহাই প্রকৃতি। রোগ আমাদের আত্মোপলব্ধির রূপ রুদ্ধের জন্য, ঔষধে সেই রোগেরই উপশম ঘটে, অর্থাৎ, ঔষধরূপী ভগবান আমাদিগকে ব্যাধির বন্ধ হইতে পরিত্রাণ করেন। তাই ভক্ত ঔষধের মধ্যে শ্রীভগবানের করুণার স্পর্শ পান।

মহামতি চরক বলেন—ঔষধ দুইপ্রকার। কতকগুলি ঔষধকে বলা যায় দৈব, আর কতকগুলি যুক্তিসিদ্ধ। উভয় প্রকার ঔষধেই রোগের উপশম হইয়া থাকে।

মানুষের আরোগ্য নির্ভর করে তাহার দেহ ও মনের বলের উপর—'বলাধিষ্ঠানা আরোগ্যম্'। এই জন্য স্বাস্থ্যকামী প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই শক্তি-চর্চার প্রয়োজন, তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন-ক্রমেই শক্তির যেন অপচয় বা অপপ্রয়োগ না হয়। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

'বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জিতম্'। (৭।১১)

আমিই বলবানদিগের সেই বল, যে বল কামনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত।

সকলেই জানেন, রোগাক্রান্ত হইলেই বলের অপপ্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। আসুরী শক্তি পৃথিবীতে শুধু অকল্যাণকেই বহন করিয়া আনে।

পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটীর অপরার্ধে বলা হইয়াছে—

'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।'

প্রাণিমাত্রের সেই কাম আমি, যে কামের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নাই।

'কাম' কথাটি বলিতে ব্যাপক অর্থে বোঝায় 'কামনা', আর সংকীর্ণ অর্থে বোঝায় দৈহিক সম্ভোগেচ্ছা বা কোন লালসা (Sex-appetite); এখানে সংকীর্ণ অর্থেই 'কাম' কথাটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মানুষের মধ্যে যে সকল সহজাত প্রবৃত্তি আছে, উহাদের বলে সাধন কল্যাণের পন্থা মুক্ত, আবার উহাদের অবাধ পরিতৃপ্তিও মহতী বিনষ্টির পথ। গীতায় দুইটী কথার প্রয়োগ আছে, একটী সংযম, আর একটী নিগ্রহ। এই নিগ্রহকেই মূলের

বলিয়াছেন Repression—নিগ্রহের ফলেই অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়, আবার অসংযমের ফলেও শারীরিক বা মানসিক রোগের উদ্ভব হয়। এই জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ এই,—ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থ ও কামের সেবা করিবে, অর্থাৎ অন্যায় ভাবে (ব্ল্যাক মার্কেটী প্রভৃতির দ্বারা) অর্থ সংগ্রহ করিবে না, অথবা পশুর মত ইন্দ্রিয় সম্ভোগ করিবে না। 'পশুর মত' কথাটি বলিলাম বটে কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কেমন করিয়া ধর্মকে রক্ষা করিয়া কামের সেবা করিতে হয়, তাহার নির্দেশ আছে ধর্মশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে, আয়ুর্বেদে। যিনি মিতাচারী বা সংযমী, একমাত্র তিনিই দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেন। তাই শ্রীভগবানের উক্তির তাৎপর্য এই—তোমরা ধর্মের সহিত অবিরোধে কামের সেবা কর, অর্থাৎ সংযত ভাবে বিষয় ভোগ কর।

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ আর একটি গভীর তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন,—সুসন্তান লাভ করিতে হইলে মাতা পিতাকে সংযত, মিতাহারী, মিতাচারী হইতে হইবে। মহাভারতের বনপর্বে সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি সুসন্তান লাভের জন্যই তীব্র নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি যথাকালে মিতাহারী হইয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের কথার তাৎপর্য এই যে, যদি ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাও, তবে মনকে জয় করিতে হইবে। পর্বত-গুহা বা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেও বা তীর্থস্থানে বাস করিলেও তোমার মনই হইবে তোমার সাথী। এই সাথীটি প্রতি মুহূর্তেই উৎপাতের সৃষ্টি করিবে। 'পথি নারী বিবর্জিতা' বলিয়া যা সম্ভবপর হয়, মনটাকে তো কিছুতেই বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও যাইতে পারিবে না। এই জন্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥' (২।৫৯)

যাহারা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করেন, তাহাদের বিষয় নিবৃত্তি পায়, কিন্তু ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি হয় না, একমাত্র পরব্রহ্মকে দর্শন করিলেই ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

এখানে ব্যাপক অর্থে 'আহার' কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগৎ হইতে যাহা আহরণ করি, তাহার নাম আহার। এই হিসাবে চক্ষুর আহার রূপ, কর্ণের আহার শব্দ, নাসিকার আহার গন্ধ, জিহ্বার আহার রস, ত্বকের আহার স্পর্শ। (এই রস আবার ছয় প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও ক্ষায়।) আয়ুর্বেদের ভাষায় আচার্য শঙ্কর বলেন—'আত্মিয়তে ইত্যাহারঃ ভোক্তৃভোগ্যায় আত্মিয়তে'। আমাদের জীবনে প্রতিদিনই চলিতেছে এই আহরণ-প্রক্রিয়া। আমাদের মন মহদাদি, অর্থাৎ আহারের সূক্ষ্ম অংশের দ্বারাই মন গঠিত হয়।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—মনই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক। তিনি অর্জুনকে যম ও নিয়মের উপদেশ দিয়াছেন। বহিরিন্দ্রিয়ের নিরোধের নাম যম, আর অন্তরিন্দ্রিয়ের নিরোধের নাম নিয়ম। দেহ ও মনের সুস্থতা রক্ষা করিতে হইলেও আমাদের সাধু ও সাত্ত্বিক হইতে হইবে। মহামতি চরক বলেন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মৃতি ও সমাধির দ্বারাই মনের দোষ অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করিতে হইবে।

মনে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলেই অধ্যাত্ম বিদ্যার আমাদের অধিকার হইবে। গীতায় ভগবান বলেন—'অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্' (১০।৩২), অর্থাৎ বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা। এখানে বিদ্যা,

বলিয়ে বুঝাইয়াছে আঠারো প্রকার বিদ্যা, যথা—চতুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। এই সব শাস্ত্রের মধ্যে যে যে অংশে অধ্যাত্মবিদ্যা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ। এই গুলি বিদ্যাকে অপরা ও পরা—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মহর্ষি চরকও এই অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'বিদ্যা ধ্রুবপানম্', অর্থাৎ পুরীষের ঔষধসমূহের মধ্যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। এখানে 'বিদ্যা' বলিতে প্রধানত অধ্যাত্মবিদ্যাকেই বুঝাইয়াছে।

'অপক্তেরেপ্যনর্থেষু ভীরু নিয়মবাদিনঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।'

প্রাচীন ভারতে যে লৌকায়তবিদ্যা বা ইউজিনিক্সের বিশেষ চর্চা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষে বিবাহেরও উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের কল্যাণ। এই জন্য ঋষির নির্দেশ ছিল, 'যত্নাদালোচিতকারী স্যাৎ'। পর্যালোচনও এখানে অর্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মহর্ষি সুশ্রুত সুসন্তান লাভ এবং দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই সহবাস নিয়মের নির্দেশ দিয়াছেন। এ বিষয়ের আলোচনা আছে শারীরস্থানে। ভারতীয় ঋষি ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়াছেন, কারণ, তাঁহারা জানিতেন, অসংযত বা অনিয়মাচারী ব্যক্তি ভোগের শক্তিও হারাইয়া ফেলে।

গীতার দশম অধ্যায়েও শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ', অর্থাৎ যে কাম সন্তানের উৎপত্তির কারণ, আমি সেই কাম।' কাজেই এইরূপ কামের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নাই।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'ধর্মোঽবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ', অর্থাৎ আমিই ঐশ্বর্যশালী পুরুষের উদ্যম। এই উদ্যমের মূলে আছে, দেহ ও মনের স্বাস্থ্য। এজন্যই বাগ্‌ভট বলেন, এই উদ্যমের মূলে আছে ওজঃ। ধাতু সাত প্রকার—রস রক্ত, মাংস মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। শুক্রই ওজোধাতুতে পরিণত হয়। এই ওজোধাতু দুগ্ধস্থ ঘৃতের মতো সারভূত হইয়া দেহের বিভিন্ন কোষে হইয়া থাকে। ইহার বৃদ্ধিতেই দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বলের উদয় হয়। আর ইহার নাশেই সকল নাশ পায়। দেহাস্থির নানা ভাব—উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য, সাধনা, সৌকুমার্য সকলই এই ওজোধাতু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

একস্থ দেহোদ্ভবনাম্ শুক্রাত্মানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতি নিবন্ধনম্।
যস্য প্রকর্ষে দেহস্য বৃত্তিপুষ্টিবলোদয়াঃ।
হ্রাসে বিপর্যয়ঃ নাশো মরণান্তায় জীবনম্।
নিষ্পাদ্যতে যত্নো ভাবো বিবিধা দেহসংশ্রয়া।
উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য সাধনা সুকুমারতাঃ।

(বাগ্‌ভট সংহিতা)

মানুষের উৎসাহ ও উদ্যম পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যেরই বহিঃপ্রকাশ। উৎসাহই জীবন, নৈরাশ্য অবসাদ মৃত্যু। নিষ্চেষ্টতা বিনাশেরই সূচনা। উৎসাহ সত্ত্বোগুণের প্রকাশ, আর তাহা হইতেছে তমোগুণ। শ্রীমদ্ভগবান্ বলিয়াছেন—আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার সাধন করিবে। আত্মাকে কখনও অবসন্ন হইতে দিবে না।

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ।' (৬৫)

অবসাদ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি। আমরা যখন অবসন্ন হইয়া পড়ি, তখন আমাদের কিছুই ভাল লাগে না। ইহা শুধু fatigue বা boredom নয়, ইহা depression of spirits.

'শ্রীভগবান বলিয়াছেন 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।' (১০।২২) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন।

(পরবর্তী ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈদিক ভারত আয়ুচিন্তা

ডক্টর শ্রীঅমিয়লাল দাশ

আমাদের বৈদিক পিতামহেরা পরলোকের চেয়ে ইহলোককে অনেক অধিক ভালবাসতেন। তাই বেদের মন্ত্রসব দীর্ঘজীবন এবং সৌভাগ্যসুখের প্রার্থনা দেখা যায়। পরাজয়পর মনোবৃত্তি তখন বৃদ্ধি পায় নি—বৈরাগ্যসাধনে তখনও মুক্তির পথ নয়—এই জগতই ছিল তাঁদের সব চেয়ে প্রিয়—এই জগতকে তারা অমৃতময় দেখতেন। গোতম রাহুগণ তাই প্রার্থনা করছেন—

"মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ। ১।৯০।৬ ঋগ্বেদ
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ১।৯০।৭
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।" ১।৯০।৮

মধুর অনিল বহুক, নদীজলধারা মধুধারা হোক। ওষধী অমৃতসম্ভব হোক। দিন ও রাত্রি মধুতে পূর্ণ হোক, পৃথিবীর ধূলাও মধুময় হয়ে যাক্। উপরে দ্যুলোক মধুতে ভরে উঠুক। বনস্পতি মধুময় হোক—সূর্যের দীপ্তিতে আসুক অমৃত—দিক সকল মধুময় হোক। মধুময় পৃথিবীতে মানুষ তাই একশত বৎসর কেন—শতোত্তর জীবন লাভ করবে। এ জীবন চাই দিব্যজীবন ও দেবজীবন।

দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ
প্রতিরন্তু জীবসে। ১০।৩৭।১ ঋগ্বেদ

আমরা দেবতাদের সখ্যপ্রার্থনা লাভ করব—তাঁদের সখা হব—দেবতারা আমাদিগকে বাঁচবার জন্য আয়ু দিন। আয়ু কেবল প্রাণধারণের জন্যি নয়—যে জীবন বলিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠ, শান্তিই, সেই মহৎ জীবন চাই।

আমরা চাই স্বস্তি—সু অস্তি—সুখের জীবন ইন্দ্র, সূর্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতারা আমাদের স্বস্তি বিধান করুন। তাঁরাই এই পৃথিবীকে পালন করছেন—সেই কথা বলিতে

অক্ষীভ্যাংহতো নমোঽভ্যাং কর্ণাভ্যাং পৃথিবীমহম্।
—অথর্ববেদ ১২।১।১১

আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকব—চক্ষুর যত—মনের পরাক্রমে—কেহ আমাদের দমন করতে পারবে না, আঘাত করবে না। উন্নত মস্তক উচ্চে তুলে আমরা পৃথিবীকে উপভোগ করব। পৃথিবী আমাদের, তার সম্পদরাজি অকুণ্ঠচিত্তে দানে আমরা বলিষ্ঠ ও বীর্যবান্ হয়ে থাকব।

কর্মবীর হয়ে থাকাই মনুষ্যত্ব। আলস্য ও তন্দ্রাকে দেবতারা ঘৃণা করেন—অবজ্ঞা করে অমরলোকে তাঁরা তাকে শাসন করছেন—তাই তাঁদের প্রার্থনা

যা রোচনাদুর্জসে কর্মণে কৃতা অনুপূর্বং যতমানা যতিষ্ঠন।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি।
জীবনে নঃ। ১০।৬৫।৬ ঋগ্বেদ

মনুষ্যত্ব আমাদের এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি—তিনি বলছেন—পরিপূর্ণ জীবন ভোগ কর—একের পর এক ধীরে ধীরে বার্ধক্যকে অভ্যর্থনা কর। যিনি সমস্ত সুন্দরের স্রষ্টা সেই পরম দেবতা প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করুন,—তোমার আয়ুষ্ক দীর্ঘ করুন—যাতে সুখ সৌভাগ্যময় সমস্ত তাঁরা দানে ধন্য হতে পার। এ জীবন হবে নিত্য দিনের নব প্রচেষ্টায়

প্রদীপ্ত, আনন্দে উদ্বেল, আশার ভাস্বর, প্রাণে সুখে এবং স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল।

ত্রাতারা দেবা অধি ব্রুবন্তু নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।

৮।৪৯।১৪ ঋগ্বেদ

হে জ্যোতির্ময় দেবগণ—আপনারা ত্রাণ করেন আপনাদের প্রসাদ ভিক্ষা করি—আমরা যেন কখনও নিদ্রাতুরতার না হই—আমরা যেন অলস জনোচিত কালাতিবাহিত না করি।

ঋগ্বেদে বল ও বীর্য ওজস্বী হওয়ার জন্য প্রার্থনা পাই :—

হেতোঃসি হেতো মহি মেধি।
বীর্যসি,বীর্যং মহি মেধি।
বলমসি বলং মহি ক্ষেত্রায়ক্ষত্রায়ে
মহি মেধি।
সহস্যসি সহো মহি মেধি।
সহোঽসি সহো মহি মেধি।

হে পরম পুরুষ! তুমি তেজস্বী, সেই তেজস্বিতা আমায় দাও। তুমি বীর্যবান্—সেই বীর্যে আমায় ভূষিত কর, তুমি বলবান্ আমার প্রতি বলবান্ হও, তুমি ওজস্বী—আমাকে ওজস্বী কর। তুমি পাপের শাসয়িতা—তোমার সেই শাসনশক্তি আমায় দাও, তুমি চির সহিষ্ণু—সেই সহিষ্ণুতায় আমায় ধীর কর।

ঋষিরা জীবনের বাকখানে মরতে চাইতেন না—অকাল মৃত্যু যে অভিশাপ—বাঁচতে হবে পূর্ণ আয়ুষ্কালে। অধীন হয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে জীবনের প্রত্যেক দিনকে সুদিন করতে হবে। সে জীবনের জন্য চাই সুস্থ ও সবল শরীর। অথর্ববেদে তাই মন্ত্র দেখি :—

বাচা আদদ্ মনো প্রাণঞ্চক্ষুরুতোঃ
শ্রোত্রং কর্ণয়োঃ।
অপলিতাঃ কেশা অশোণা দন্তা বহ্ব্যায়ুষ্মৎ।
উর্বোরোজো জঙ্ঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ।
প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্বাত্মানি ভূয়াসম্

আমার বাক্যে লাভ করুক শক্তি, নাসিকায় প্রাণ, নয়নে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবণক্ষমতা। আমার কেশ যেন শুভ্র না হয়, দন্ত যেন অক্ষয় থাকে, বাহুতে যেন থাকে অমিত বল। আমার উরুতে যেন থাকে বল, জঙ্ঘায় যেন থাকে শক্তি, পাদযুগলে যেন থাকে স্থৈর্য, আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন থাকে সুস্থ এবং আমার আত্মা যেন থাকে অম্লান।

সুস্থ ও সবল হয়ে দিনে দিনে আমরা নূতন কিছু শিখব, নূতন কিছু জানব, আমরা জীবনের গতিপথে নিত্য নূতন মধ্যায় আরোহণ করব—জীবন ত স্তব্ধতা নয়—সে যে প্রগতি—তাই তার বাণী চলার বাণী—চরৈবেতি চরৈবেতি শুধু বল, শুধু বল। যে আমার থাম পায়ে না ফেলে, শ্রী তাকে কৃপা করেন না। বিধাতা পথিকেরই বন্ধু—তাই ত শুধু এগিয়ে যেতে হবে—স্তব্ধ থাকলে চলবে না—যৌবনাতে হবে। চলব কার আদর্শে? আকাশে ঐ সূর্যের দিকে চেয়ে দেখ, সূর্য কখনও থামেন না—অতন্দ্র হয়ে সব সময় চলছেন—তাঁরই মত চলতে হবে নব নব অভ্যুদয়ের পানে।

এই জন্য নব ভঙ্গ গ্রহণ করতে হবে। পাশব-জীবন নয়—আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন নয়—উঠতে হবে—জাগতে হবে। তাই ত কল্যাণকর নূতন সৃষ্টি চাই!

চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ।
চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ। অথর্ব ১৭।১৭৮।৩
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুবিধ্যৈ তনূভ্যঃ।
সং ক্লেদ্ধি বি ন্য মেয়ম্। ৪
সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য।
বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ। ৫

দেব সবিতা যিনি পরম আলোকের উৎস তিনি

আমাদের দৃষ্টিশক্তি দিন পথের আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিন—বিধাতা আমাদের নবীন দর্শনক্ষমতা দিন। আমাদের চোখে যাক নূতন চেতনা যাতে আমরা যেমন এই জগতকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারি। হে সূর্য! হে জ্যোতির দেবতা, তুমি সুন্দর, সৌম্য, সুদর্শন! তোমায় যেন আমরা ভাল করে দেখি। আমরা যেন মহামানবের মত পরিপূর্ণতায় তোমাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

ঋষিরা জানতেন বাতাসই প্রাণ নির্ঝর বায়ুর জন্য তাই তাঁদের আকুলতা একটি সুন্দর সূক্তে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ঋগ্বেদ বাতাসের এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি বলছেন :

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। ১
প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ। ১
উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা।
স নো জীবাতবে কৃধি। ২
যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধিহিতঃ।
ততো নো দেহি জীবসে। ৩

বাতাস আমাদের হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করুক, আনন্দে উদ্ভাল করুক—বাতাস যে পরম ভেষজ। বাতাস আমাদের আয়ু বর্ধন করুক। বাতাস আমাদের পিতা, আমাদের ভ্রাতা, আমাদের একান্ত সুহৃদ, আমাদিগকে বাঁচবার শক্তি দিন। অমৃতের ভাণ্ডার ত রয়েছে বাতাসের ঘরে—সেই গোপন উৎস থেকে তিনি আনুন আমাদের সঞ্জীবনশক্তি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। কিন্তু সুন্দর আয়ু সুন্দর চিন্তার ফল। মনই দেহকে রূপান্তর করে—যার যেমন ভাবনা, যেমন ভাবেই তার দেহ গঠিত হয়। এইজন্য আয়ুচিন্তায় বৈদিক ও বাঙালীর অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধও তাই উপদেশ দিয়েছেন—কান দিয়ে ভদ্রকে শুনতে—চোখ দিয়ে ভদ্রকে দেখতে। ভদ্রই আমাদের কাম্য। যদি তাই হয় আমরা হাসিতে ভরা—'যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো'. তাহলে সত্যিই সবই ভাল হয়ে যাবে—সবই আমাদের আপনার হবে সবই আমাদের আনন্দ বর্ধন করবে।

'আশের চেরিঙ: মযায়ু:' আয়ু স্বার্থ নয় জীবনের জন্য নয় - নিবেদিত জীবনের জন্য। যে কেবল খায়, সে পাপই খায়। বাসনার পরিতৃপ্তি নিয়ে যে আয়ু, সে আয়ু পাপময় তা নিয়ে কি মানুষ সুস্থ থাকতে পারে? মানুষের মনে রয়েছে অমৃতের অভীপ্সা, অমৃতের পিপাসা। মানুষ হবে সততা প্রতিষ্ঠিত, শিবের অনুরক্ত, সুন্দরের ভক্ত। শুভ পথে কল্যাণে ও সেবায় সে জীবনকে ধন্য করবে।

জগদ্ব্যাপী রয়েছে এক শ্রেষ্ঠ নিয়ম শৃঙ্খলা—বৈদিক ঋষিরা তাকে ঋত বলতেন—যা ঋত নয়, তাই অনৃত, অনৃতের পথ পাপের পথ—সে মানুষের সর্বনাশ করে। সত্যের পথ—তপশ্চর্যার পথ, মানুষকে নিয়ে চলে কল্যাণের পানে। সরলতা, সততা, বদান্যতা, অহিংসা, প্রেম প্রভৃতি পুণ্য কর্ম। পুণ্যকর্মী ব্যক্তিই কায়মনোবাক্যে সুস্থ হয়ে সত্যকার সুখময় জীবন যাপন করে।

সংস্কৃত আনে সমৃদ্ধি, আনে স্বর্গসুখ - আনে অমৃতত্ব। সত্যাশ্রিত হতে হবে--কারণ সত্য মানুষকে এনে দেয় সমস্ত সম্পদ। ঋতএব জীবনে সেই ব্রত পালন করতে হবে। এই পৃথিবীতেই মানুষের চাই মুক্তি—পরলোকের ভাবনা বড় কথা নয়। প্রজাপতি ধাতা তাই প্রার্থনা করছেন :—

পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
নন্দাম শরদঃ শতং মোদাম শরদঃ শতং
ভবাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।

যে আনন্দদায়ক বেদনা। তোমরা চিকিৎসার্থে কর্মী—তোমরা ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণের ন্যায় প্রবাহিত হও যখন তোমরা বহমান। আজই এখানে আমাদের দাও শক্তি, দাও বিপুল বিস্তার, তোমাদের হাত ভূমিতে বেদনাকে স্তব্ধ কর। আমাদের দৃষ্টি টানলোক বিমুখ না হতে পার্থিব জীবনকে অনুরক্তি-সাগরে প্লাবিত করুক তাই চাই দীর্ঘ আয়ু। সে আয়ু আসে মানুষের সন্ধানে যখন তার আত্মার অনুমতিসাথে তাহা সুন্দর বর্ষে, তার সুখের থাকে আর ভক্তিসুন্দর শবশাসনিতে।

—

নিম্নের ব্যবস্থাপত্রবিধি

বাগবৈদ্য পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস শর্মা বৈদ্যশাস্ত্রী (বরিশাল পূর্ববঙ্গ)

ভারতবর্ষ—আর্যভূমি; একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। পৃথিবীর কোন ভূভাগে এত প্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সমাবেশ দেখা যায় না। পার্বত্য প্রদেশ, বনাকীর্ণ, মরুদেশ, মরুদ্যান প্রদেশ, আদ্রপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের এক বিরাট প্রাকৃতিক সুষমা বক্ষে ধারণ করিয়া এবং বিভিন্ন ঋতুতে কালোপযোগী ওষধি, লতা, গুল্ম, ও বানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্পরাজির উদ্ভব করিয়া বিশ্বমোহিনীরূপে জগদ্ধাত্রী ভারতমাতা বিরাজমানা। ভারতমাতার স্নেহসিক্ত বক্ষ, আমাদের জন্মভূমি সরসউর্বরা বঙ্গদেশ—ষড়ঋতুপূর্ণা। এইস্থানে বড়ঋতুর অনির্বচনীয় প্রকাশ এবং অনুপাত বনৌষধি, লতা গুল্মসমূহ ও বিভিন্ন পুষ্পরাজিসমূহের সমুদ্ভবোপযোগী উদ্ভব; প্রাকৃতিক শস্যশ্যামল সমতলভূমি, নদীসৈকত ও অনন্ত সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বৃক্ষাবলী এবং বঙ্গমাতার মুকুটমণি দেবতাত্মা হিমালয়ের বৃক্ষ তাবৎ মনকে বিমোহিত করিয়া, অন্যান্য মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া এক অপূর্ব আনন্দ রসে নিমগ্ন করিয়া থাকে।

আমাদের জীবনী শক্তিকে সংরক্ষণ, সংবর্ধন ও নিরাময় জীবনকে অব্যাহত রাখিয়া তোলপাড়ের ন্যায় অসহায় হইয়া জীবন ধারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এই ভারত মাতার অন্তর্ভূত বনজঙ্গল হইতে আহরণ করিয়া মহর্ষিগণ চরক ঋষি অতি সূক্ষ্মভাবে গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া যে অপূর্ব বিধি রচনা করিয়াছেন চিকিৎসা জগতে তাহা অনুসরণীয়। কায়চিকিৎসা ক্ষেত্রে অদ্যতনীয় প্রবীণ চিকিৎসকগণ তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করিয়া জীবনিত কামনায় প্রাণাচার্যরূপে যে সব নিত্য দৃষ্ট সহজ সুলভ গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিয়া টোটকা চিকিৎসা দ্বারা অসামান্য ফললাভ করিতেন তাহা দ্বারা গ্রাম্য পল্লী সমাজ প্রভূত উপকার পাইতেন। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে "স্বদেশের" শাসন প্রস্তাবে সমগ্র উক্ত তাবতে যবনিত কেকিমি চিকিৎসা রাজকীয় চিকিৎসা প্রণালীর আয়ুর্বেদের প্রভাব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইয়া রহিল। কিন্তু তখনও বাঙ্গালার প্রতিভাশালী বৈদ্য মণ্ডলী নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া পুস্তকাকার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যথাসম্ভব সংগ্রহ ও নানাবিধ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানকে লোকায়ত্ত চিকিৎসারে পরিণত করিয়াছিলেন এবং মূলকেন্দ্রে উদ্ভূত গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম, প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমগ্র পল্লী অঞ্চলে প্রসারিত করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে পল্লী অঞ্চলেও

অনেক বৃদ্ধা এখনও টোটকা চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া শিশু চিকিৎসা ও প্রসূতিদিগকে চিকিৎসা করিতেন।

পল্লীর সাধারণ চিকিৎসকগণও বিশেষ জটিল ব্যাধিগ্রস্ত বহু সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিতেন। বাংলাদেশের বৈদ্যগণ বহুমুখীন প্রতিভা ও চিকিৎসা বিদ্যার প্রভাবে অর্ণবপোতের পূর্ব পর্যন্ত সুদূর ইংরেজ রাজত্বে রাজকীয় রাজা ও নিম্নশ্রেণীর সকল ভারতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিলেন।

প্রবল রাজদোষ ভয়ে আর বিশেষ অবহেলা না করিয়া আমাদের গৃহকোণে যেসব সুলভ প্রাপ্য গাছ গাছড়া প্রভৃতি অবস্থিত এবং আমরা প্রয়োগে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বিনা অর্থব্যয়ে জনসাধারণের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আমরাও পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত যে সব সাধারণ টোটকা ঔষধ ও চিকিৎসা বিধান শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বহুক্ষেত্রে কৃতকার্য হইয়াছি সেই সব টোটকা ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আস্তে আস্তে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

জনসাধারণ ও পাঠকগণ ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করিলে আমাদের সেবা সার্থক হইবে।

জল বায়ু ও মৃত্তিকার সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "যস্ত দেশস্য যো জন্তু স্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্"। উদ্ভিদের সকল অংশই ঔষধে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

"মূল-ত্বক-সার-নির্যাস-নক্ত-স্বরস পত্রকাঃ—ক্ষারাঃ ক্ষীরফলাঃ পুষ্পাং তথা তৈলানি কল্কতঃ। পত্রাণি তুলাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহাস্তোদ্ভিদো মতঃ।" কিন্তু একই উদ্ভিদের সকল অংশ সমগুণ সমবীর্য বা দোষঘ্ন নহে।

বিভিন্ন ঋতুতে জল বায়ুর পরিবর্তনানুসারে একই উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের আধান ও একই অংশের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই প্রাকৃতিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ত্বক, মূল ও পত্রাদির আহরণ করিবার জন্য বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ের নির্দেশ আছে।

নিম্নলিখিত রোগ সমূহে নিমের ব্যবহার বিধি :—

১। জ্বর রোগে—নিমছাল, গুলঞ্চ, বেল, পদ্ম কাষ্ঠ ও চন্দনকাষ্ঠ, এই সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল /১০ সের, শেষ /৫০ পোয়া সেব্য। এই কাথ সেবনে সর্বপ্রকার জ্বর নিরাময় হয়।

২। বিষম জ্বরে—অষ্টাঙ্গ ধূপ, অপরাজিতা ধূপ প্রভৃতির প্রধান উপাদান নিমপাতা।

৩। শিরঃশূলে মাথা ধরিলে—বিছানায় নিম-পাতা বিছাইয়া তাহার উপর রোগীকে শোয়াইবে এবং নিমপাতার গন্ধ করিয়া বাতাস দিলে মাথার ব্যথা দূর হয়। বসন্ত ও জলবসন্ত রোগেও রোগীর অত্যন্ত মাথা ধরিলে এই প্রক্রিয়া করিবে।

৪। সর্বরোগহর—নিমপাতার রোল গায়িয়া লইয়া ১দিন খাইলে শরীরে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। ম্যালেরিয়া রোগী নিয়মিতভাবে কিছুদিন নিমপাতার রোল এবং তালমেধের পাতার রস সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবৃত্তি হয়।

৫। গ্রহণী রোগে—নিমপাতা, নিসিন্দা পাতা, লিচি ও বেলপাতা চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া। আনা মাত্রায় কিছুদিন প্রাতে সেবন করিলে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়।

৬। অর্শ রোগে—কচি নিমপাতা উত্তম রূপে বাটিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অর্শে লেপন করিলে অর্শের জ্বালা কমিয়া যায়।

৭। রক্তার্শে—নিমছাল, কাঁকড়িনি, লাজ-বন্তিয়া, বেলা মূল, ইহাদের ক্বাথ (পাচনের নিয়মানুসারে) পান করিলে রক্তার্শ কমিয়া যায়।

৮। ক্রিমি রোগে নিমছাল, চিরতা, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, পলাশবীজ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া এবং উহার সহিত সমভাগ গুড় মিশাইয়া ।০ তোলা মাত্রায় ৩ দিবস সেবনে ক্রিমির উপশম হয়।

৯। কামলা রোগে—নিমছাল, পুনর্নবা, চরাতকী, সাতইচিরা, কট্‌কীমূল পান করিলে কামলা, ঈষরী ও সর্বাঙ্গ শোথ নিবারণ হয়। নিমছালের কাথ বা পাতার রস মধুসহযোগে সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

১০। বসন্তের জ্বর—নিমপাতা, গুলঞ্চ, ক্ষেত-পাপড়া—ইহাদের কাথ মধুসহ সেবন করিলে বসন্তের জ্বর উপকার হয়।

১১। কুরুক কুড়ার নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিলে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়।

১২। অরুচি রোগে—নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমি হইলে তৎপর সোঁদালের কাথ, মধু ও মোরান চূর্ণসহ পান করিলে অরুচি আরাম হয়।

১৩। আমপিত্তজনিত বমিরোগে—নিমছাল, পটোলপত্র, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে আমপিত্তের বমি নিবারণ হয়।

১৪। উন্মাদ রোগে—নিমপাতা, বচ, হিং, সাপের খোলস, সরিষা এই সকলের ধূম প্রদান করিলে উন্মাদ রোগের অনেক উপকার হয়।

১৫। ভূত রোগে—নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মরিচমূল, কট্‌কী ও সোঁদালমজ্জা, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে ভূতের বেদনার উপশম হয়।

১৬। কৃমী রোগে—রবিবারে নিমের শিকড় তুলিয়া তাহা লাল সূতাদ্বারা হস্তে ধারণ করিলে কৃমী রোগ সারিয়া যায়।

১৭। বাতরক্তে—নিমের পাতা ও পলতা, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে বাতরক্ত রোগের পরিপাক হয়।

১৮। বেহ রোগে—নিমছাল, পালিধা মাদার, ভরাণ্ডী, চিতামূল, খদির কাষ্ঠ, আকন্দমূল, শুঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং হাতিশ, ইহাদের পৃথক পৃথক কাথ মধুসহ সেবন করিলে সকল প্রকার বেহ ভাল হয়।

১৯। প্রমেহ-কোঁড়া হইলে—নিমপাতা বাটিয়া ঘৃতের সহিত গরম করিয়া কোঁড়ায় দিলে শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

২০। শোথ রোগে—নিমের মূলের ছাল ।০ আনা, খদির ।০ আনা একত্র বাটিয়া গোমূত্র সহ পান করিলে শোথ ভাল হয়।

২১। নালী ঘায়ে নিমপাতা চূর্ণ উষ্ণজলে গুলিয়া সূক্ষ্ম ওড়া ।০ তোলা ৮ তোলা মধা ঘৃতের সহিত আস্তে আস্তে উষ্ণজলে মিলাইয়া উক্ত ঘৃত সূক্ষ্ম পলিতায় মাখাইয়া নালীর মধ্যে দিয়া রাখিলে শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে নিম-সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পরে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

২২। গলগণ্ড রোগে—নিমের পাতা, তিল, মরিচমূল ঘৃতের সহিত বাটিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

২৩। শোফরোগে—নিমপাতা, শিমপাতা, পুনর্নবা, পালিধা মাদারের পাতা পুটুলী বাঁধিয়া গরম করিয়া সেক দিলে শোফে উপকার হয়।

২৪। গরমী পীড়ায় নিমছাল, পলতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চের কাথ গুল্‌গুল্‌ ও ত্রিফলা চূর্ণসহ পান করিলে গরমী ভাল হয়।

২৫। কুষ্ঠরোগে পক্ষ নিম যথা—(১) নিমের শিকড় ২) নিমের ছাল, (৩) পাতা, ৪) ফুল, (৫) ফল, এই পাঁচটী দ্রব্যের কাথ (সম ভাগে একত্র ২ তোলা পাকের বৈদ্যের বিধানে) পান করিলে কুষ্ঠ রোগের অনেক উপকার দর্শে। নিমের তৈল—কুষ্ঠ,

বাতরক্ত, পাদা প্রভৃতি রক্ত রোগে ব্যবহারে উপকার হয়।

১৬। লোহনে—নিমের শিকড় ঘষিয়ে এক প্রকার মাটী বাহির হয়, সেই মাটী ১ রতি পরিমাণ মিছরির সহিত ব্যবহার করিলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জরাব্যাধি আসিতে পারে না।

১৭। অম্লপিত্তে—নিমছাল, গুলঞ্চ, পোলতা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দারুণ অম্লপিত্ত নিবারণ হয়।

১৮। বমন রোগে—নিমছাল, পোলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, কুরালতা, চিরতা, কট্‌কী, ক্ষেৎপাপড়া ইহাদের কাথ পান করিলে ও নিমপাতার বাতাসে দিলে অম্লক ও পক্ত বমন শীঘ্রই বন্ধ হয়। বমনের জন্যেও ইহা মহৌষধ।

১৯। গৃধ্রসী রোগে পুরাতন নিমবীজের সার তুলে ৯ তোলা তৈলাক্ত সেবন করিলে গৃধ্রসী (সাইটিকা) রোগে বিশেষ উপকার হয়।

২০। বাতের জড়তায়—নিমের ধাতন করিলে এবং নিম কাঠের দাঁত-তোলা ব্যবহার করিলে বাতের জড়তা ও তোতলামি আরাম হয়।

'শরীরমাদ্যম্'

হৃদয় ও রক্তের স্বাস্থ্য

কবিরাজ শ্রীনবারি মোহন ঘোষ, এম্. এস্. সি.

রক্তে 'কোলেষ্টেরেল্' নামক পদার্থের পরিমাণ অধিক হলে করোনারি আর্টারীর মধ্যস্থ শ্লেষ্মিত কণিকা জমাট বেঁধে রক্তস্রোত বন্ধ করে হার্ট ফেল করে। করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের এটি প্রধান কারণ বলে অধিক আধুনিক ডাক্তারগণ মত প্রকাশ করছে।

এতে প্রমাণিত হয় হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ রক্তসঞ্চালনের Central pump এর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তৎসংশ্লিষ্ট শিরাসমূহের রক্তধারা বন্ধ হওয়ার ফলে।

চাই ব্লাড্‌প্রেসার থেকে করোনারি থ্রম্বোসিসের আক্রমণ আজকাল বেশী দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এক প্রবীণ ডাক্তারের মুখে শুনেছিলাম অত্যন্ত বেশী ছুঁচ ফোঁড়ানোর (injection) প্রতি আসক্তি বা বিষাক্তকল্প ঔষধ কথায় কথায় ইন্‌জেকশন্ নেয়, পরিণত বয়সে এসে এরাই নির্দিষ্ট সময়ে তাদের 'করোনারি আর্টারী' বা হৃৎপিণ্ডে পরি পড়ে। সে জন্য শিরা বা ধমনীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়, এমন কি, রক্তের তলানীতে শিরাবেধ বন্ধ হয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। এটা বেশীর ভাগই হয়ে থাকে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট (৪৫-৬০) বছর বয়সের মধ্যে।

ব্লাড্ প্রেসার উচ্চ 'গ্রামে' ওঠে কেন সে বিষয়ে যুক্তি দিতে গিয়ে ডাক্তারেরা বলে' থাকেন তরলতা-বিরোধক শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুতগতি হয়, তাঁতে করে ব্লাড্‌প্রেসার বেড়ে যায়। সুতরাং প্রথমেই চোখ বুজে রোগীর লবণ খাওয়া বন্ধ করা হয়। কারণ, নুন রক্তে তরলতা আনয়ন করে।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে—একদিকে রক্ত তরলতা কম হওয়ার দরুণ ঘনরক্ত থ্রম্বোসিসের কারণ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, অপর দিকে লবণ বন্ধ করে রোগীর রক্তকে সেই অবস্থা সম্পাদনে সাহায্য করা হচ্ছে।

একদম পরস্পরবিরোধী উক্তি আধুনিক বিজ্ঞানীরা চোখেমুখে করে থাকেন যা তুলনা বিচারে একেবারেই টেঁকে না। কিন্তু তা বললে কি হবে? প্রাচীনকালে যেমন সব ব্যাকরণ শাস্ত্রের যুক্তিকে চটাতে না পেরে খাস প্রয়োগ বলে হাস্যিকের মুখ বন্ধ করা হয়, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানীরা অবোধ্য বা দুর্বোধ্য লাটিন শব্দ ও উদ্ভট আঙ্কিক প্রভাব দ্বারা 'লে ম্যানদের' ঠাণ্ডা করেন।

হাজারটি X-Ray যন্ত্রে হাজার রকমের ছায়া পড়ে। একটি রক্তের পরীক্ষায় শত শত মাইক্রোস্কোপে শত শত বিরোধী জীবাণু ও নানা রকমের ক্ষোভ বা cell এর সন্ধান পাওয়া যায়। তবু যেমন নিরেট-গুরু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যখন বলছে তখন টীকা অত্যাবশ্যক অর্থাৎ বিনা বিজ্ঞান যন্ত্র যে সৃষ্টি করেছে সেই মানুষের ভুল হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞান-যন্ত্র নির্ভুল। ফলে যা হবার তা-ই হচ্ছে। থ্রম্বোসিসের আক্রমণ, রোগের ভোগফল বা মৃত্যু ঘথানিয়মে চলছে, অন্ততঃ বাহুতে যই কমছে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী, যারা সব কিছুর জন্যেই জীবাণু খুঁজে বেড়ান তাঁরা ব্লাড্ প্রেসার ও থ্রম্বোসিস্ রোগের বেলায় আজও এর কারণ —জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছেন না।

আয়ুর্বেদে এ রোগের প্রতিষেধক ও চিকিৎসার কথা, আহার বিহার, ঔষধ পথ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অতি সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদের রক্ত-মূর্চ্ছা-সন্ন্যাস রোগগুলের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে পড়ে আজকের ব্লাড্প্রেসার, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ করোনারি থ্রম্বোসিস্।

সেরিব্রো-করোনারি থ্রম্বো আয়ুর্বেদ চিকেইটিক্স্-গাইডবুক' এ যদি চলতে পারে, 'রক্ত-মূর্চ্ছা-সন্ন্যাসে' আপত্তি কেন? অবশ্য, পুরনো শব্দ বাদ দিয়ে নিত্য নূতন রোগের নামকরণ না করলে নব্যবিজ্ঞানের ধরিয়া প্রচার ও হয় না, ব্যবসারও সুবিধে হয় না অথোপরি আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্থান পাওয়া যায় না, রোগের কিন্তু প্রতিকার হ'ক বা না-ই হ'ক।

'আর্টিক-অব্স্ট্রাক্টো আর্টারিস্' বলে "লে ম্যান'দের চক্ষুস্থিরে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে রোগের কিছু আসে যায় না। আমে কচি জীবে দয়া বৈষ্ণব মন্ত্রেতে মোক্ষলাভের উপায় হলেও বিজ্ঞানপ্রগতির চোখে পড়ে যন্ত্রের নামে কচি ও জিভে দয়ার স্রোত যাচ্ছে, সমস্যা কমে না। যে সব কারণবশতঃ এই সকল রোগ জন্মে সেগুলো আগের চাইতে বর্তমানে ঢের বেশী হচ্ছে। বিলুপ্ত তোজন, পৌরাণ-মধুন, মাখ মাখন, লস্যার ব্যাল—তারই সঙ্গে ঘৃত, দই, মিষ্টি, সন্দেশ, রসগোল্লা, চপ্, কাটলেট্ একসঙ্গে চলছে। মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দৈব দুর্ঘটনার প্রাপ্ত আঘাত, মারামারি, হানাহানিজনিত আঘাত ও অন্যান্য দুশ্চিন্তায় মানুষ সন্তুলহীন হয়ে পড়ছে। ভেজাল ও কৃত্রিম খাদ্যের কথা বাদ দিচ্ছি।

এই সকলের বাড়ী এবং শিরা-ধমনীস্রোত বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত ও পীড়িত হয় সহজেই অনুমান করা যায়। এই কারণগুলো যথাসম্ভব বর্জন করে চলবার চেষ্টা করলে এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হলেও ঘৃত আমাদের স্বাভাবিক প্রকাশ প্রদেশের মতো অর্থাৎ ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সুতরাং প্রকৃতির অনুকূলে চললে, প্রদেশের সহজ সরল স্বাভাবিক অনুসামান্যনীতির সহিত জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য বিধান করে চললে এসব রোগের ভয় থাকে না।

পথ্য সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এসব রোগে নিম্ন ভাগের পথ্য উত্তম। তারপর,

রোগী বা যাদের রোগ হয়নি তাঁরা চল্লিশ বৎসর পেরিয়ে গেলেই খাওয়ার মাত্রা কমিয়ে দেবেন। যুগুরে ভাত, ডাল,মাছ, তরকারি ইত্যাদি কঠিন খাদ্যে পাকস্থলীর দুই ভাগ, এক ভাগ পেয় কি জলে পরিপূর্ণ করে এবং একভাগ খালি রেখে খাবেন। বার বার আধপেটা খাওয়া বরং ভালো, তবু একবারে ভেসে খাওয়া উচিত নয়। আর একটি কথা, যার যা চিরন্তন খাওয়া অভ্যাস তার উপর নির্ভর করেই উপরি উক্ত নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে আমার 'পথ্য বিজ্ঞানে' বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। চিরিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি—মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত দরকার এই সব রোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে হ'লে। তাই শাস্ত্র বলেছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"।

জ্ঞানবিজ্ঞান বিভাগ

চরকের "মনোবীক্ষণের" রূপ রেখা

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ ঠাকুর পঞ্চতীর্থ

আজ শুধু বাংলায় নয় অথবা ভারতেই নয়, বিশ্বের যেখানেই মানব জাতি সেইখানেই দেখছি, শুনছি এখন আমাদের "প্রাণ বাঁচিয়ে প্রাণায়াম"। সম্পূর্ণ সুস্থ মন তো এখন আর কোন দেহেই নেই, তবুও দেখা যায় যাঁরা সুস্থ মন পেয়েছিলেন তাঁরা বলেন দেহের ব্যাধির কতকটা পরিমাপ করা যায়, মনের ব্যাধির ইয়ত্তা করা যায় না। "কৃতান্ত কৃপাণি যেষু যাদৃচ্ছাঃ প্রোতরন্তি" (চ বিমান স্থান) মনোবহ স্রোত অর্থাৎ—কতক দৃষ্ট, বাকী অদৃষ্ট।

মনের মূল প্রবাহ তিনটি —প্রাণের, মনের আর পরলোকের। আমি বাঁচবো, ধনী হবো, আর দেহ ছেলেও অমর হবো। তিনটিতেই ব্যক্তিত্বকে স্থায়ী করার দাবী। কিন্তু প্রাণের স্রোতে তো বাসনা জাগে না, সেটিতো মূল দেহের অথবা কয়েকটি প্রণালীর মাত্র সমষ্টিগত নামকরণ, যেমন কল্পনালী থেকে গুহ্যস্থান, বলাশয় আর বস্তি। তবে বলা চলে,এদিকে প্রাণ বায়ুর মূল প্রবাহ চলে কিন্তু এখানে বাসনা জাগার কিছু নেই। তাই মহামুনি চরক বলেছেন"ক্ষুদ্রঃ মূলং মহাস্রোতসঃ"—প্রাণবহ স্রোতের মধ্যমণি ক্ষুদ্র। এটিই হোলো মনের নিবাস। অখিল বাসনারাশি, আর ক্ষুদ্রান্ত্রের এই স্থান থেকেই সুরু; আমি বাঁচবো, আমি অমর হবো, যেমন করে পারি আমার অস্তিত্বকে ধরে রাখবো, অন্তর এ প্রচেষ্টার মূলে আছে প্রাণবহ স্রোতের মূলের প্রক্রিয়া।

এ প্রক্রিয়ার ধারা সুস্থ সরল ধারায় চলে না, অসংখ্য তার গ্রন্থি, অথবা কম্প্লেক্স্ কখনও দেহের কোষে এদের কোষ, কখনও স্নায়ুর কোষে এরা মুক্ত। "স্রোতাংসি স্রোতাংসেব যাতয়ন্ত যাতৃন্ প্রযুঞ্জন্তি", "ইন্দ্রিয়েষ্বা বা প্রকোপাৎ ইত্যাদি।"

এই জন্যই হয়তো পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করেছেন—"নো মাইণ্ড্, উইদাউট্ ম্যাটার, নো ম্যাটার উইদাউট্ মাইণ্ড।" তা তাঁরা করুন, আমরা শুধু উল্লেখ করছি, মহামুনি চরকের কত আগেন দেহেন্দ্রিয় বর্ণনবাদ।

দেহের রোগ দেখে আমরা তার কারণ খুঁজি, আর কোথায় সেটির অস্তিত্ব তাও বের করি বা বের করার চেষ্টা করি, পরে করি তার চিকিৎসা। মনের রোগের ও কারণ আছে, তার অস্তিত্ব কোথায় তাও জানার পথ আছে। যেমন উপায় একটি মনের

রোগ, তার কারণ বায়ু, ক্রোধ,লোভ, ঈর্ষা, ভয়, শোক চিন্তা, আর ইত্যাদি। এক কালেই সবগুলি কারণ হয় না, এক একটিই সাধারণতঃ। চরক বলছেন - "মনসঃ উপসৃষ্টা অনেকবিধানি শ্রোতাংসি আবৃত্য জনয়ন্ত্যাময়ান্"। তাহলেই জানতে পেরেছি, আর প্রশ্ন করতে পারি—মনের কি উপায়ই একটি মাত্র ব্যাধি?

উত্তরে চরক বলেছেন "না"। মনোবহ স্রোত যেমন অনেক, রোগও তেমনি তার অনেক। অবশ্য-গুলি দেখা যায়, কতকগুলি অনুমান করা যায়, কতক বা বিজ্ঞ ব্যক্তির ঐতিহ্য কথায় মেনে নিতে হয়।

নিজের ইন্দ্রিয় মন দিয়ে কতক প্রত্যক্ষ করা যায়, কতক বা যুক্তি তর্ক দিয়ে অনুমান করতে হয়, বাকী ঐতিহ্য যেমন চোখ, মুখ দেখে, শরীর স্পর্শ করে শরীরের রোগ প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি ক্রোধ, ঈর্ষা, বিষাদ, ভয় প্রভৃতি দেখে মনের বিকার প্রত্যক্ষ করা যায়। সবই কিন্তু সেই মনোবহ স্রোতের দ্বারা। এবং সব বিষয় ব্যাধিও বটে।

এখানে প্রশ্ন করেছেন—মনোবহ স্রোত ও প্রাণ-বহ স্রোতে ব্যাধি হয় কেন? সে ব্যাধির কারণ কি অসংখ্য? উত্তরে বলেছেন, ব্যাধির কারণ অসংখ্য নয়, ব্যাধি অসংখ্য। অতএব ব্যাধির কথা তো ব'লে শেষ করা যাবে না, তার কারণই বলা যায়। মনোবহ ব্যাধির চারটিই আজ পর্যন্ত কারণ নিরূপণ করা গিয়েছে। (শারীর)

চরকের অনস্থিরাই বোধহয় পৃথিবীতে আত্রেয় নামে লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছেন। তিনি বলেছেন—সেই চারটি কারণই আবার "অহিতাহ্যুপাতাৎ অসাত্ম্যতো" (বিমান)। মনের গতি প্রতিবেশের অর্থাৎ 'সংযোগের' অপেক্ষায় থেকে যদি রজিত হয় কিংবা অল্পাপত্তিত হয় অর্থাৎ নানা কারণে আলোড়িত হয়, তবে তার গতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

সেই চারটি কারণও সংযোগাপেক্ষী, অর্থাৎ পরিবেশগত অবস্থায় ভিন্নভাবে হয়। কখনও বিকৃতিত হয় রজিত হ'য়ে, কখনও বা অল্পাপত্তিত হ'য়ে। 'মোহ' তার মধ্যে একটি কারণ। এই মোহ যদি রজিত হ'য়ে থাকে কিংবা অল্পাপত্তিত হ'য়ে থাকে, তবে তার থেকে অর্থাৎ মনোবহ স্রোতে নানা প্রকারে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিতই এক এক প্রকার ব্যাধি।

(একটি রেখাচিত্র দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করছি)

রজিত বা আলোড়িত মনের মোহ হ'তে উৎপত্তি

হয়

অহঙ্কার, আসক্তি, সংক্ষেপ, অতিস্রব, অল্পাপত্তি, বিপ্রত্যয়, বিক্ষেপ, অনুশয়

একটা উদাহরণ দিই। ধরুন কোন জায়গায় গানবাদ্য বা কৃষ্ণনাম কীর্তন হচ্ছে। গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠস্বরটী মনোরম, চেহারাটী সুন্দর। আপনি কীর্তনে মুগ্ধ হবেন নিশ্চয় এবং হ'লেনও, আহা নামের কী শক্তি, ভাবে ভিজিয়ে দেয়, শরীরে পুলক আসে, চোখে আপনা আপনি জল আসে। ছেড়ে আসা যায় না, দীর্ঘ সময়টী কখন যে পার হ'য়ে গেল জানতে পারলেন না।

সেই আপনাকেই যদি আর একদিন অমনি নাম সোনাতে নিয়ে যাওয়া যায়, আর (আপনার নাম কীর্তনে রুচি নেই) সেখানে যদি গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠস্বরটী ভাঙ্গা কাঁসার মত, গলার মত, কিংবা

ছোঁয়াচ লাগে, আর পাচক বা খাদিকারে চোরাবটিও হয় বলাকার অর্থাৎ পা ছুঁচলো গোল, তার ওপর চালা পাতার মত ছাঁদছে, নাকটি বেজায় মোটা আর চাপা, পাঁতগুলি ফাঁক ফিকে, কাঁক বা ঠোঁট ছাড়িয়ে উঠু, পেটটা মাঝা বা কুমড়োপেটা, তবে সেখানে হুজুগও কীর্তন শুনতে চাইবেন না। নামে কচি আপনার কতখানি নিজেই বুঝতে পারবেন। তবুনি পালিয়ে আসবেন। যদি তখন বলা যায় - আপনার তা হ'লে নামে কচি নয়, রূপের আর স্বরের গুণেই মোহ।

নিশ্চয় সেটি আপনার মনের একটি স্বরূপ কথা বলা হবে। তার পরই বলা চলবে মোহের ৩টি উপাদান, রূপ আর গুণ। ওটেই মনের সামা পরিবেশ ঘটেছে। রসিক বা আলোড়িত মন জেগে উঠেছে। ওটির পেছনে রয়েছে আপনার অহংকার। অর্থাৎ আমি ভাল জোড়া, বলজ, ভাবুক, বোদ্ধা, ইত্যাদি। এই অহংকারটি প্রকাশ্য বিস্তার পরতে আর আটটি কুড়িকে সুরক্ষা করছে জানবেন, অর্থাৎ মোহিত এবং অহংকারের জনক আপনার মন ৩টি

জন্ম লাভ করে

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

আমি ভদ্রজাতি, রূপ, বুদ্ধি, চরিত্র, বিদ্যা, বংশ, যৌবন, শক্তি প্রভাব

(বা ঐশ্বর্য)

(ক্রমশঃ আরীরস্থান, ৪ অঃ)

চক্রের মনোবীক্ষণের ধারা বা সূত্রপথ যাঁরা অনুশীলন করেন, তাঁরাও বোধ হয় ঘুরে যান তাঁর প্রথমে বিদ্যা শক্তির বৈপুল্যে। আমরা আজ ত্রিভুবনের মত এর দুয়ার, তার দুয়ারে মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছি মনোবিদ্যার যে আলোকপাত করেছেন তাতে। কিন্তু এমন কেউ কি নেই যিনি বলবেন, ফিরে চল মহাভূমি চক্রের পরতলে, মনের বিশাল রাজ্যের রূপ দেখবে চল, সেখানের উত্তরাধিকারী তুমি।

(ক্রমশঃ)

জনস্বাস্থ্য বিভাগ

সংক্রামক ব্যাধি

কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন কবিরত্ন, সাংখ্যযুগল, চিকিৎসক ও অধ্যাপক, গুপ্তোদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ।

সংক্রামক ব্যাধি বলিতে যে রোগ এক মানুষ হইতে অন্য মানুষে সংক্রামিত হয় তাহাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাহা বিষম ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

যথা —প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ
সহভোজনাৎ
একশয্যাসনাচ্চাপি
বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ।
কুষ্ঠজ্বরোপসর্গাচ্চ
নেত্রাভিষ্যন্দিবায়ুষ্ঠ
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ
সংক্রামন্তি নরান্নরম্।

ত্রিয়তে যদিকুষ্ঠেন
পুনর্জাতস্তবেদ্ ভবেৎ
তত্তো নিন্দিত রোগোঽয়ং
কুষ্ঠং কষ্ট প্রকীর্তিতম্।
(ত্রিতাবপ্রকাশঃ)

শুদ্ধতে— কণ্ডুকুষ্ঠ পাঠের পরিবর্তে
কুষ্ঠং অলঙ্ক শোষঙ্ক
নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
এই পাঠ আছে।

উহার দ্বারা দেখা যায় আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন—

সংস্পর্শ মৈথুন দ্বারা, গাত্র সংস্পর্শ দ্বারা, নিশ্বাস দ্বারা, একত্রে ভোজন দ্বারা, একশয্যায় শয়ন, আসন এবং রোগীর বস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা, রোগীর ব্যবহৃত মালা ধারণের দ্বারা, রোগীর ব্যবহৃত চন্দনাদি অনুলেপন ব্যবহারের দ্বারা সংক্রামক রোগ সমূহ এক নরদেহ হইতে অন্য নরদেহে সংক্রামিত হয়। বিশেষ করিয়া কণ্ডু, (চুলকানি ইত্যাদি) কুষ্ঠ, উপদংশ, মূত্রোদ্বাদ, জ্বর, অম্ল ও মহাপাতকজন্য ঔপসর্গিক রোগসমূহ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে আক্রমিত হয়। শুক্রতের মতে, কুষ্ঠ শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ রোগও একদের হইতে অন্যদেহে একত্রে খেলাধেলার জন্য, একত্রে ভোজনাদি। জন্য সংক্রামিত হয়।

ঔপসর্গিক রোগ সমূহ বলিতে গেলে শুক্রতের টীকায় মহাপাতকজন্য রোগ, যথা বিসূচিকা (কলেরা), বসূরিকা (বসন্ত রোগ), বিসর্প রোগ, ঔপসর্গিক জ্বর, অক্ষিরোধিনী (গ্লেগ), শীতলা, কর্ণমূলী, যক্ষ্মা, বিষাক্তজ্বর ও জনপদবিধ্বংসি ব্যাধিসমূহ এক নরদেহে উৎপন্ন হইয়া অন্যদেহে খেলাধেলা দ্বারা, একত্রে ভোজনদ্বারা, একশয্যায় শয়ন দ্বারা, রোগীকে স্পর্শ দ্বারা অন্য নরদেহে সেই রোগ আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই সব ঔপসর্গিক রোগ যে জায়গায় অর্থাৎ গ্রামে বা সহরে আরম্ভ হয় সেখানে জল বায়ু কলুষিত করে এবং অস্থি রোহিণী (গ্লেগ), কলেরা, বসন্তপ্রভৃতি রোগাক্রান্ত গ্রামে বা সহরে লোক গিয়া কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে মানবশূন্য করিয়া দিতে পারে। তাহার জন্য আয়ুর্বেদ এই সব রোগকে জনপদবিধ্বংসি রোগ আখ্যা দিয়াছে। মহাকুষ্ঠ সম্বন্ধে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন যে, কুষ্ঠ রোগীর রোগ অন্যকে সংক্রামিত না করেই, তাহাড়া মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিলে এই কষ্টদায়ক ব্যাধি লইয়াই সেই ব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ঔপসর্গিক চোখরোগ বা কিনজংচোখ রোগে আক্রান্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্র অন্য লোকে পরিধান করিলে তাহা হইতে এই রোগ সংক্রামিত হয়। এই বস্ত্র দ্বারা চক্ষু মুছিলে চক্ষু চিরতরে বিনষ্ট হয়। এইরূপ অভিষ্যন্দ রোগের সম্বন্ধেও বলা যায়। জ্বর রোগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে বহু সময় লাগিবে, তাই একটি রোগ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সেটি হইল "বসন্ত রোগ"

আয়ুর্বেদে ইহাকে মসূরিকা বলে। নানা কারণে বসন্ত বীজের সৃষ্টি হয়। কটু আম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য ও বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণে পুনরায় ভোজন, দূষিত মিষ্টান্ন ও দূষিত জলবায়ু সেবন দ্বারা প্রদূষিত দোষ দূষিত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া মানবদেহে মসূরের ন্যায় আকৃতি ও পরিমানবিশিষ্ট যে পীড়কা উৎপাদন করে তাহারই নাম মসূরিকা বা বসন্ত রোগ। ৪ দিন হইতে ৮ দিনের মধ্যে উহার গুটিকাগুলি বাহির হয় ও পুষ্ট হয়। এই পূর্বের সময় হইতে শুষ্ক হইয়া একেবারে নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত রোগীর গাত্র সংস্পর্শ, নিশ্বাস, এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন কিম্বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহারের দ্বারা এই

বসন্তের বীজ এক দেহ হইতে অন্যের দেহে প্রবেশ করে।

এইরূপে বসন্তের বীজ দেশে ব্যাপিয়া পড়ে। বসন্তগুটি যখন বিস্তৃত হয় তখন তাহার কৃমিগুলির সূক্ষ্মকণা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আহার দ্রব্যে পড়িলে তাহা ভক্ষিত হইলে তৎক্ষণ বসন্ত রোগ সংক্রামিত হয়, অথবা মাছি, পিপীলিকা মুখে লইয়া সূতের চারি পাশে ছড়াইয়া রোগোৎপত্তির কারণ করে। এই জন্য এই সব বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কৃমিগুলি উঠিলে তাহা ছাই ও জল মিশ্রিত পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়, সেগুলিকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা বা অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলা উচিৎ। রোগীর ঘর সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়, ধূপ ধুনা দেওয়া উচিত ও নিয়মপাতা রাখিতে হয়।

এই বসন্ত রোগ পাঁচ প্রকার— বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিজ, রক্তজ। কুপিত বায়ু পিত্তজ দোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র প্রভৃতি সপ্ত ধাতুর কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া নানা-প্রকারের রূপ ও আকার বিশিষ্ট গুটি প্রস্তুত করে এবং এমন অনেক বসন্তও আছে যাহাতে রোগ প্রকাশের পূর্বেই রোগীর জীবনান্ত হয়।

প্রবল জ্বর, প্রলাপাদি সান্নিপাতিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বিজ্ঞ চিকিৎসক সাবধানতা অবলম্বন করিবেন গুটিগুলি বহির্মুখী করার জন্য প্রয়োজন বোধে অস্ত্র দ্বারা কিছু কিছু স্থান কাটিয়া দিবেন।

শীতের পর বসন্তকাল আসিতেছে। এই বসন্ত-কালে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভকালে এই রোগ দেখা যায়। বসন্তকালে শরীর শ্লেষ্মা গ্রহণ করে, মানবের অগ্নিবল কমিয়া যায়। শারীরিক বায়ু বৈষম্য প্রভৃতি কারণে দোষ সমূহের সহায়তায় বসন্ত রোগ আক্রমণ করে। এই সময়ে নিয়মপালন, আতপসেবন ও ভ্রমণ দোষ-সামাবারক। এই সময় প্রাতঃদিন ৫০ ফোটা করিয়া তুলসীর রস সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। নিয়ম নিত্য পালন করা বিধেয়। প্রাতে কটিকারীর মূল ।০ আনা ২টী মোলমরিচসহ বাটিয়া তিন দিন সেবন করিলে বসন্ত রোগ হইবার ভয় থাকে না। তেঁতুল বীজের খোসা ছাড়াইয়া উহাকে চিবাইয়া গুড়সহ ৭ দিন ভোজন করিলে বসন্তের প্রতিষেধ করে। মেথী জলে ভিজাইয়া এই সময় পান করিলে এবং পলতার রস ১ তোলা পরিমাণে অন্ন গ্রহণের পূর্বে খাইয়া অন্ন আহার করিলে বসন্ত রোগপ্রতিষেধক হয়। কলা পাতার রস ১ তোলা ও হরিদ্রাচূর্ণ ।০ আনা সেবন করিলে রোমন্তী রোগ ১, জ্বর, বিস্ফোটক ও মসূরিকা প্রভৃতিও প্রতিষেধ হয়।

নিম ছাল /০, যষ্টিমধুবীজ /০ আনা ও হরিদ্রা /০ একত্রে জলে বাটিয়া পান করিলে বসন্ত-রোগ হয় না।

মোচরস সহ খেতচন্দন অথবা বাসক পাতার রস মধু অথবা তাতি পত্রের রস ও যষ্টিমধু চূর্ণ সেবন করিলে শীতলা রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। রক্তচন্দন, বালক, মুথা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা মিলিত ২ তোলা পূর্ব দিন /৪০ সোয়া জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে পান করিলে শীতলার নিবারণ হয়।

১। কণ্টকারীর মূলের ক্বাথ তিনদিন সেবনে বসন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

২। ২৪টী জয়ন্তী বীজ বাসীজলে পেষণ করিয়া ঘৃতসহ সেবন করিলে বসন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

৩। সুপারী বৃক্ষের মূল বাসীজলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

৪। মহুলা মূল ২৪টি খেজিনার বাসীজলে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

৫। শিরীষ মূল বাসীজলে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

৬। নাটাকরঞ্জের মূল ১০টী মরিচসহ বাসীজলে বাঁটিয়া সেবন করিলে বলস্থ রোগ বিনষ্ট হয়।

৭। টুঁইকটিক মূল অতুলোদকে পেষণ করিয়া সেবনে বলস্থ রোগ বিনষ্ট হয়।

৮। অনন্তমূল তণ্ডুলোদকসহ সেবনে বলস্থ বিনষ্ট হয়।

৯। খেয়াল কাঁটার মূল তণ্ডুলোদকসহ সেবনে বলস্থ বিনষ্ট হয়।

১০। পাকুড় ২ তোলা, মরিচ ১ তোলা একত্রে বাসীজলে বাঁটিয়া সেবন করিলে বলস্থ রোগ বিনষ্ট হয়।

১১। ভরিদ্রার পাতা ও কেঁচুল পাতা সমভাগে একত্র বাঁটিয়া পানে করিলে বলস্থ রোগ বিনষ্ট হয়।

১২। রোগীর মাতৃগুলি বলস্থগুলি বাহির হইয়াছে তাতগুলি চালতাপাতা লইয়া রোগীর নাম করিয়া ছিঁড়িয়া দিলে বলস্থ আর সংখ্যায় বাড়ে না। চালতা গাছের ছালের পীচকবারা দ্বারা গাত্র সিঞ্চন করিলে বলস্থের গুটি সকল শুকাইয়া যায়।

মুষ্টিযোগ বা সহজ চিকিৎসা

চক্ষুরোগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭। বলস্থ রোগের প্রতিষেধক কটিকারীর মূল /০ আনা আড়াইটী গোলমরিচসহ একত্রে বাসী সেবন করিলে এক বৎসরের মধ্যে বলস্থ হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

৮। ক্লিমির ঔষধ এক তোলা পরিমাণ আনারসের পাতার রস মধুসহ প্রত্যহ সেবন করিলে ক্লিমি রোগ নিবারিত হয়। ইহাতে তাইট পাতার রস ও বেশ কাজ করে।

৯ হাপানি কাশি—এক তোলা পরিমাণ সোহাগাভিজান জলে বার বার একখানি ইষ্টি কাপড় ভিজাইয়া ও শুকাইয়া হাপানির টানের সময় তাহার ধূম পান করিলে তৎক্ষণাৎ হাপানি বন্ধ হয়।

১০। এক শিরা—যে দিকের অণ্ডকোষ স্ফীত হইয়াছে তাহার বিপরীত দিকের পদের অঙ্গুষ্ঠে তামার আংটি ধারণ করিলে তাহার যন্ত্রণা অবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

১১। বাসক বেলা অতি প্রত্যুষের পরদিন হইতে সিকি তোলা হাঁচুটির রস ও সিকি তোলা পানের রস একত্রে মিশাইয়া তিন দিবস প্রাতঃকালে সেবনে বাসক বাসক বেদনা নিবারিত হইবে।

১২। পঞ্চতুল কাটা—আদা ও চূণা ভাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া অগ্নির উত্তাপে সেক দিলে অচিরে আরোগ্য হয়।

১৩। নখকুণী—চুঁইয়া তিজান জল বস্তুদণ্ডে লাগাইয়া উহা বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়।

১৪। চক্ষুর ছানি নিবারণ—শ্বেত পুনর্ণবার শিকড় পুরাতন কাঁজিতে ঘর্ষণ করিয়া লাগাইলে ছানি কাটিয়া যায়।

আয়ুর্বেদের সূক্তি

প্রাণতোষ

১। ব্যায়াম নিত্য জীর্ণাশী নবশোধনভোজনঃ
সপ্তৈতানুপকুর্বীত ত্রয় উপস্তম্ভা বিমুক্তয়ে।

চরক সূ ২৩ অ

পরিশ্রমরত মিতভোজী ব্যক্তি যব খোসুর ভোজন করিয়া সপ্তপীড়নিত রোগ ও মুলতা হইতে মুক্ত হয়। বাঙালীর পক্ষে অহই বাস্থ, যব ও খোসুর বিশেষ অবস্থায় প্রযুজ্য।

২। মাত্রাবদ্ধাশনমিতমনুপহতা প্রকৃতি বলবর্ণসুখায়ুষা যোজয়ত্যুপযোক্তারমবস্তুমিতি।

—মাত্রানুযায়ী আহার করিলে প্রকৃতির ব্যাঘাত হয় না এবং ভোক্তা অবশ্যই বল, বর্ণ, সুখ ও পরমায়ু লাভ করে।

৩। সৈষা ভবত্যতিবিলাপেক্ষিণী মাত্রা নক্ত
মাপেক্ষতে দ্রব্যম্।

মাত্রা অগ্নিবল অপেক্ষা করে, দ্রব্যের গুরু লঘুত্ব অপেক্ষা করে না।

৪। যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুষ্ণং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি চযুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্।

চরক সূ-১ অ:

যথাযথ ব্যবহারের ফলে বিষও ঔষধ হয়। আবার প্রয়োগ দোষে প্রকৃত ঔষধও তীক্ষ্ণ বিষে পরিণত হয়।

৫। রক্ত নিত্যং প্রযুঞ্জীত বাতাং নেবাস্তুবর্তনে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরং হি তৎ।

চরক সূ-৫ অ:

—যে দ্রব্য বাতের প্রতিকূল নহে এবং অজাত ব্যাধি উৎপাদক নহে, তাহাই নিত্য ভোজন করিবে।

৬। স্নিগ্ধে শীতানিলস্পর্শদংবৃতে বলীনাং বলী। পক্তা তদ্বতি স্নেহমে মাত্রা দ্রব্য গুরু ক্ষয়ঃ।

চরক সূ-৬ অ:

—শীতকালে শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের পৃষ্ঠাদ্বারে সংরুদ্ধ হওয়াতে বলবানদিগের অগ্নি বলবান হয়। এই জন্য স্নেহযুক্ত মানুষের অগ্নি গুরুমাত্রা ও গুরু দ্রব্য পক্ত করিতে পারে।

ইণ্টারন্যাশন্যাল অপটিক্যাল ও ডেণ্টাল কর্পোরেশন

২৮-এ বহুবাজার ষ্ট্রীট (লালবাজারের নিকট)
কলিকাতা-১২
ফোন—১১-৬০৬২

(ভাল চশমা ও দাঁতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান)
বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে, পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গর্ভবতী নারী

কবিরাজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিভূষণ, বৈদ্যশাস্ত্রী

গর্ভবতী নারী মাত্রই যে পীড়িতা তাহা নহে। নারী যখন সন্তানবতী হন, তখন সন্তান ও মাতার সংযোগ হয় ফুল বা অমরা। এই ফুল প্রথম মাস হইতে দ্বিতীয় মাস পর্যন্ত গর্ভের চারি দিকে বেষ্টিত থাকে। এই ফুল ক্রমশঃ ২ মাস পরে দৃঢ়তর হয় এবং এই ফুলের ছিদ্র দিয়া মাতার শরীর হইতে সন্তানের পোষণ কার্য হইতে থাকে। এই ফুলটি যদি সুস্থ না থাকে তবে মাতার শরীরের মধ্যে বিষাক্ত দ্রব্য তৈরী হয়, ইহাকে ডাক্তারী মতে Toxin ইত্যাকার নাম দেওয়া হয়, কবিরাজী মতে ফলে একপ্রকার বিষাক্ত অম্লরসের সৃষ্টি এবং এই বিষাক্ত রস গর্ভিনীর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এই বিষাক্ত রস হইতে নানা প্রকার অসুস্থতা ও পীড়া প্রকাশ পায়।

গর্ভিনী প্রথম ২।৩ মাস প্রত্যূষে বমন ও শরীর খারাপ বোধ করে, কিছুই খাইতে পারে না, ক্রমশঃ দুর্বলতা বৃদ্ধি হয়, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে জল পর্যন্ত পেটে থাকে না। এই প্রকার অবস্থায় বমন-নিবারক ঔষধ বিশেষ প্রয়োজন, বমননিবারক ঔষধ গুলি বিশেষ কার্যকরী হয়, যথা বড় এলাচ, মৌরি ভিজান জল, যুঁইর জল, আদা বাটিয়া, আদাবেদানা, আমলকীর চাটনী, নানাপ্রকার আচার, আমসি এবং ঔষধের মধ্যে মুক্তাযুক্ত, অম্বরোক্ত ষোগ, তাজার লবঙ্গ বড়ি, ডাবের জল, মিশ্রির জল, মৌরি মিশ্রি সোনামুখী পাতা ভিজান জল, পুদিনার চাটনি, কচি কলার রস, কিসমিস্, আলুবোখরার চাটনি ইত্যাদি দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই উপকার পাওয়া যায়। মুক্তাযুক্ত মালাসুরাসিক চিকিৎসাক্রমে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই বিমান দেখা হইতেই ক্রমশঃ দোষের চয়, প্রকোপ, প্রসার ও স্থান সংশ্রয় করিয়া রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই কারণে প্রথম হইতেই নিরাময় ঔষধ বা পথ্য যথা নিয়মে ব্যবস্থা না হইলে অর্থাৎ প্রথম হইতেই অপ্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ দোষ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং কিছু কিছু রোগের পূর্ব লক্ষণ দেখা যায়। অবশ্য ২।৩ মাসের মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি লক্ষণ দেখা যায়, যথা অতি ভীষণ রকমের মাথার যন্ত্রণা বা মাথাধরা বাহ্য ও প্রস্রাবের পরিষ্কার না হওয়ার পায়ে, মুখে ও হাতে শোথ দেখা যায় এবং রক্তহীনতা। এই প্রকার অবস্থা কিছুদিন হইতে থাকিলে ক্রমশঃ রোগের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ ফুলকা বা Eclamsia আরম্ভ হয় এবং কোন ২ ক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া যায়।

এক্ষনে আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে প্রথম হইতে এই রোগ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা প্রথম হইতে একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম হইতে এই জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে গর্ভিনীর বাহ্য, প্রস্রাব ঠিকমত পরিষ্কার হইতেছে কি না, মাথার যন্ত্রণা হয় কি না, ঘুম ভাল হয় কি না এবং হাতে পায়ে শোথ দেখা যায় কি না। সর্ব প্রথম হইতেই গর্ভিনীকে চর্বি জাতিয় দ্রব্য একেবারে বর্জন করিতে হইবে।

প্রথম হইতেই বাহ্য ও প্রস্রাব যাহাতে পরিষ্কার হয় তজ্জন্য মৌরি, মিশ্রি ও সোনামুখীপাতা ভিজান জল, ডাবের জল দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পক্ক ডুমুরের ক্বাথ পান, ডুমুরের তরকারী খেতে পর্শটী ও নবাঙ্গে বিশেষ উপকার হয়। কুষ্মাণ্ডমুখ,

বারচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস ইত্যাদি ব্যবহারে – আমার মতামতে মহারাণীর মহালক্ষ্মীবিলাস ব্রাণ্ডীআকের বল বা বলের গুড়া বা পানের রসসহ সেবনে উপকার হয়। ক্রমশঃ খারাপ অবস্থা হইলে বজ্রক্ষার ক্ষোটকাদ্যচূর্ণ ও মিশ্রির জলসহ এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন, যার

১ বিধান, ২। অবসাদক ঔষধ, ৩। দুগ্ধ ও সাবু, ফলের রস, পলা ভাত, মুগ মাষের ঝোল ইত্যাদি খাওয়া।

দাস্ত পরিষ্কারের জন্য সাবান জলের (এনিমা) পিচকারী দিতে হইবে। বেল্লির তৈলও খেতে দেওয়া যায়।

উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা ছাড়া চিকিৎসাসম্বন্ধে আরও অনেক কিছু আছে সুজ্ঞান ও চতুরে দেখা যায়।

কাজেই প্রথম হইতে এই রোগ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা পূর্ব হইতে বিশেষভাবে প্রয়োজন। গর্ভিনীর ঠিক অষ্টমির ২৯ মাস গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৮৯ মাস থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভিনীকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে এবং অনেকের ধারণা যে গর্ভিনী নারীর চিকিৎসার প্রয়োজন নাই বা চিকিৎসা করান অবিধেয়। এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়া বেশির ভাগলোকই এই প্রকার অগ্রাহ্য করিয়া থাকে এবং এই অগ্রাহ্যের ফলেই এই ভীষণ রোগের সৃষ্টি হইয়া শেষে মরণাপন্ন হইয়া পড়ে।

এই সমস্ত কারণে যাহাতে আমাদের পূর্ব ধারণা নষ্ট হইয়া এই বিষয় সাধারণের বোধগম্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং এই দুর্ধর্ষ রোগ যাহাতে হইতে না পারে তাহার জন্যও এই বিষয় সাধারণের নিকট প্রচার এবং সকলের যাহাতে বোধগম্য হয় তাহার জন্য আমাদের লেখার চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি।

আশা করি, সমবেত চেষ্টার দ্বারা ক্রমশঃ এই দুর্ধর্ষ রোগ হইতে অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথম হইতে সতর্কতা প্রয়োজন। শাস্ত্র মতে নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমাদের মনে হয় এই রোগ কিছুতেই হইবে না এবং অকাল মৃত্যু নিবারণ হইবে। আমাদের দেশে পূর্বে এই রোগের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না, পূর্বে শাস্ত্রানুসারে লোকে চলিত। এক্ষণে সমস্তই বাহিরের হইয়া নানা প্রকার উপসর্গ দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে প্রথম মাস হইতে প্রসবের সময় পর্যন্ত যে যে নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে। (ক্রমশঃ)

(৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের বহির্জগতের জ্ঞান হয়। আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন হইতেছে একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহাকে বলা হয় অন্তরিন্দ্রিয় বা উভয়েন্দ্রিয়, যার এই মনকে জয় করিতে পারিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। ভগবান মনু বলেন—

'একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ।'

চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা

রায়বৈদ্য কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ইহা চিকিৎসকের সাধারণ অভিজ্ঞতা—যখন অল্প অল্প উপসর্গ দেখা দেয়, তখন অগ্রাহ্য করিবার ফলে রোগ জটিল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। একটু লাঘব খাওয়া দাওয়ায়, চলাফেরায় হয়ত রোগের অনুবন্ধ নিশ্চিহ্ন হয় কিন্তু অবহেলায় যন্ত্রণা ও দুশ্চিকিৎস্য অবস্থায় পড়িতে হয়। আকস্মিক কারণ ব্যতীত প্রায় স্থানেই ইঙ্গিত না দিয়া কোন রোগ আসে না। এই জন্য প্রত্যেকের নিজের প্রকৃতি ও বিকৃতির কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষার সঙ্গে নীতি ও সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। রোগের মাত্রা যখন বাড়ে, তখনই বড় হইয়া উঠে তখন।

কয়েক মাস আগের কথা। বেলঘরিয়া হইতে আমার নিকট একটী রোগী আসেন। তাহার নাম শ্রীযুক্তবিহারী সান্যাল, বয়স ৪০।৪৫, সাধারণ গৃহস্থ, পূর্ববঙ্গবাসী। ৮।১০ বৎসর পূর্বে তাহার ক্ষুধা হইত না, পেটে বায়ু, কোষ্ঠ কঠিন ছিল। ক্রমান্বয়ে বমিও হইত। ডাক্তারী চিকিৎসা চলিতে লাগিল বৎসরের পর বৎসর। তারপর শেষে রক্ত বমিও হইত—অন্যান্য লক্ষণ তো আছেই। ডাক্তারী ইনজেকশন ২০০।৩০০, কি তাহার বেশিও নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কিছু কমে, আবার বাড়ে, মোটের পর এক রকমই রহিয়া যাইতেছে। নিরুপায় হইয়া এক বন্ধুর পরামর্শে আমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিলেন।

আমি দেখিলাম মূল রোগ অগ্নিগত। অম্লোদ্গিত হওয়ায় উপসর্গগুলি অসহ্য ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। মনে হয় যেন ঐগুলি এক একটা রোগ। কারণ প্রথমাবস্থায় যাহা অগ্নিদীপক ও মূল রোগের ঔষধ দিলে সারে, পরে বহুদিন স্থায়ী হওয়ায় জটিলতার ফলে লক্ষণগুলি তীব্র হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দেওয়া দরকার হয়। অতিরিক্ত পিত্তদোষ রক্ত বমি হইতে পারে।

২৩-১১-৬০ তারিখে প্রথম সপ্তাহে দিলাম।

(১) ৪ বার চিন্তামণি-প্রাতে চালমোগরা তেল ও মধুসহ।

(২) হিঙ্গুষ্টক যোগ—দুপুরে আহারান্তে ঘৃত যৌরি ভিজান জলসহ।

(৩) নবায়স—অপরাহ্ণে দুর্বার রস ও মধুসহ।

(৪) বাত্রীলৌহ—সন্ধ্যাকালে আমলকী ভিজান জল ও মধুসহ।

(৫) মহাশঙ্খবটী—রাত্রে আহারান্তে দুধের জলসহ।

পথ্য : সকালে ও বৈকালে চিড়া ও দই, বা মুড়ি নারিকেল সামান্য মিষ্টিসহ, আর দুপুরে ও রাত্রে রুটী, খিচ, খিচুড়ি, মাগুর, কি ছোট রুই ও তরকারী ঝোল। তরকারী কাঁচকলা, পেঁপে, ঝিঙা, অবশ্য মাঝে মাঝে অবস্থানুসারে একটু ইতর বিশেষ করিয়া পথ্য দিতে হয়। রাত্রে ক্ষুধা না থাকিলে একেবারে আহার বন্ধ করিতে হইত।

ফলে অম্ল, পেটের বায়ু, রক্ত পড়া প্রভৃতি হ্রাস পাইল। এই ভাবে ২।৩ সপ্তাহ চলিল।

২৪।১২-৬০

মাথা ঘোরা পায়ে ব্যথা ও পেটে আলা একটু হওয়ায় এই ঔষধ শুরু হইল –

(১) মহালক্ষ্মী বিলাস—প্রাতে আমার রস ও মধুসহ।

(২) বিষ্ণুতৈল যোগ—দুপুরে আহারান্তে গরম জলসহ।

(৩) যোগেন্দ্র রস · অপরাহ্ণ ৩।৪টায় ডিকে-মালের রস ও মধুসহ।

সন্ধ্যায় ও রাত্রে আহারান্তে পূর্ববৎ চলিল।

২৫-১-৬১

পেটে আলা ও অম্ল আমার একটু বেশী বেওয়ায় এই ব্যবস্থামত ঔষধ বেওয়া হইল—

(১) যোগেন্দ্র রস—প্রাতে ডিকেমালের রস ও মধুসহ।

(২) ধাত্রীলৌহ দুপুরে আহারের ২০ মিনিট পূর্বে ও সন্ধ্যায় আমলকী ভিজান জল ও মধুসহ।

(৩) ত্রিফলাঘৃতযোগ—রাত্রে আহারান্তে গরম দুধ ও গরম জলসহ। পূর্বে বেলু বন্ধ হইয়া না। অন্যান্য ঔষধ পূর্ববৎ চলিল।

২২-২-৬১

ঔষধগুলি পূর্ববৎ বেওয়া হইল। একটু সর্দি হওয়ায় মৃতসঞ্জীবন লৌহ পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ সন্ধ্যা-কালে প্রদত্ত হইল।

৩১-৩-৬১

(১) কুমারকল্যাণ—প্রাতে ত্রিফলার জল ও মধুসহ (জলপেটে বায়ু থাকায়)

(২) নবায়স—অপরাহ্ণে ৩।৪টায় থানকুনি পাতার রস ও মধুসহ (আম বেশী বেওয়ায়) অন্যান্য সময়ের ঔষধ পূর্ববৎ।

আরও কিছু দিন ঔষধ সেবনের পর চিকিৎসা বন্ধ আছে। রোগী ভালই আছেন। তবে নিয়মমত আহার ও চলাফেরা করিতে হয়, অনিয়ম সহ্য হয় না। ইহা বহুদিন অসুখে ভোগার ফল। অবশ্য আরও কিছুদিন এইভাবে চলিতে চলিতে বল ও রক্ত-শক্তি বাড়িবে। তখন স্বাভাবিক অবস্থা আসিবে।

অবসর বিনোদন

॥ আয়ুর্বিজ্ঞানের আলোকোৎসব ॥

দার্শনিক কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র

আলোর কাজ অন্ধকারকে দূর করা—বিপদ আপদের লক্ষণকে মেরিয়ে দেওয়া। আলো তা সরিয়ে দিতে পারে না, সরিয়ে নিতে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায়। আলোর ঐ উৎস থেকে মানুষ প্রথম জানতে শিখলো দুঃখের রহস্য ভেদ করে জয়-যাত্রার মাধ্যমটুকু হলো তার আয়ু। দেহ-আধার এবং মন, আয়ু ও আত্মা এই তিন তত্ত্বের নিয়ে তার জীবন। সুদূর অতীতের সেদিন থেকে সে অনুভব করলো প্রাণীজগতের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক এবং কালজয়ী সম্ভাবনার সত্য হলো আত্মা।

তখন মানুষের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। নূতন আলোক-সম্পাতে এগিয়ে এলো মানুষ অনেক দূর। অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথ্বীচেতনায় সে জেনে নিল জীবনের প্রাথমিকতার মূল উপাদান আয়ু। সত্যই সেদিন জীবন সম্পর্কে আলো মানুষের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করেছিলো বলেই তো মানুষকে কেন্দ্র করে

ফুলে বরলো তার পঞ্চমী কন্যারূপে 'আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান'।

দেহ ও মনের পুষ্টি সাধন, মারণাদে চাকা পড়লো ব্যাধির আক্রমণ এবং তার নিরোধ ও নিরাময় নিরূপণ এই সবের শিক্ষা প্রণালী নিয়েই বিস্তৃত বিজ্ঞান। ইহার তাৎপর্য ও মূল উৎস—জ্ঞানের আলো। আলোর সাধনে আয়ুকে জানা—আয়ুর্বেদ। অতএব উভয়-মিলে 'আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান।' এই নাম অতীব সুন্দর। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ হতে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে আসছে কিন্তু কেহই ইহার কাল নির্ণয় করতে সমর্থ হননি, একমাত্র অনন্তকালই তার সাক্ষ্য।

যুগ যুগ পূর্বে প্রাচ্যের নিসর্গে আয়ুর্বেদ নামের উদ্ভব ঘটেছিলো, ইহা মানবতা-বোধের পরিচিতি এবং আয়ুর্বেদ যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হয়েও বিশ্ব-পরিমণ্ডলে সবচেয়ে সুপ্রাচীন ও আপন সাতন্ত্র্যের মহিমায় সমুজ্জ্বল, তার প্রমাণ। বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পার্থিব সত্তার ঊর্ধ্বে যে একটি সার্বভৌম অধ্যায় লক্ষ্য করা যায়, তার অনুভূতি, তার স্বীকৃতি ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে বলা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের গৌরব এবং অনবদ্য অবদান হলো আয়ুর্বেদ।

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের বর্তমান গতি ও উন্নতি কেন তবে ক্ষীয়মান? এ প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগা স্বাভাবিক, যাঁরা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ অথবা পাশ্চাত্য-চিকিৎসার প্রভাবে প্রভাবিত। শুধু তাই নয়, প্রশ্নের সঙ্গে হয়তো বা তাঁদের কাছে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান পরিচয়ের মুখপত্র 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রচেষ্টা অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে কিন্তু বিশ্বকল্যাণের কোন কাজ অপ্রয়োজনীয় বা নগণ্য নয়। তার প্রমাণ, মহাকালের কালস্রোতে যুগ যুগ কাটিয়ে বর্তমানের অত্যাধুনিক ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খায় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান মূর্ত হয়েছে। বিচারের মানদণ্ডে তাঁদের জানা উচিত—কুলনার সুর সঙ্গীতের ন্যায় কখনও উহা ক্ষুণ্ণ, কখনও বা লয়ে বিলম্বিত। ভবিষ্যতে আবার যে মহাসাগরের ঢেউয়ের চাঞ্চল্যে জেগে উঠবে না, তা কে বলতে পারে?

অতএব উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের পুরাণো সংস্কৃতি এবং আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের লুপ্ত ঐতিহ্য যাতে আবার প্রাণের পরশ পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সৃজনশীলতাই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা গড়ে তোলে, অনুকরকরা নয়।

সুতরাং সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী হয়ে ভারতীয়দের নিজস্ব বিশিষ্ট ধারা বজায় রাখবার জন্য স্মরণ করা প্রয়োজন—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।'—অর্থাৎ নিজের ধর্মের যদি কোনও গুণ না থাকে তথাপি তা' সুঅনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হয়েছে ঐশী অনুজ্ঞা। উক্ত শ্লোকে 'স্ব' এবং 'পর' এই দুটি শব্দের মধ্যেই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে। 'স্ব' শব্দের অর্থ নিজ বা আপন। জীবের আপন কে? আত্মীয়-পরিজন, দেহ, ধন, ইন্দ্রিয় কোনটিই আপন নয়। কেননা, দেহ আশ্রয়েই ব্যাধি হয়, ব্যাধির নির্মম আক্রমণে জীবন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে, অবশেষে কোনটির সঙ্গে কোন না কোন সময় বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র আত্মাই জীবের আপন। আত্মার ধর্মই তার 'স্বধর্ম'। তবে চিকিৎসার আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা আছে বৈ কি? ইহার নিদানে রয়েছে দুটি তত্ত্বের দুটি ধারা। একটিতে বিলাস ব্যসনশ্রিয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাভিনী,

দেহ কাছে চিকিৎসালাভ হলো তেমনি দেহ-মনের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রণালী। অপরদিকে ভারতীয়েরা ব্যাধি নিরোধ ও নিরাময়ে বিজ্ঞানের সহায়তা নিলেও আত্মিক প্রেরণার উপর তাদের নির্ভরশীল ও ছুটে চলেছে।

এই বিশ্বাস তাঁদের অন্তরে আয়ুর্বেদের আলোক-সম্পাতে, চেতনা, ইন্দ্রিয়গণ ও তাদের অধিষ্ঠানকে মন আত্মার বিকল্পহারী এবং নিজের মহিমা মাঝে বিরোধ, সেই পথ। অতএব আয়ুর্বেদ বা স্বাস্থ্যই-ই আত্মিক প্রেরণার মূল। তাই জ্ঞানেন্দ্রিয় সুস্থ দেহ ও মন ছাড়া আত্মতত্ত্বলাভ যেমন সুকঠিন, আধুনিক জীবনের দেহ ও মনের চিকিৎসা সেইরূপ ভিত্তিহীন।

কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমের ছায়াপাতে আয়ুর্বেদের আলোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই ছায়াপাতে বহুদিন দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও ছাত্রমণ্ডলের মনে ভারতীয় আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের মনে ভাব সুস্পষ্ট থাকবে, চতুর্দিন তবিষ্যৎ তাঁদের কাছে অস্পষ্ট থাকা স্বাভাবিক এবং এই দুর্বল ভিত্তির উপর ভারতীয় আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সৌধ নির্মিত হতে পারে না।

অতএব, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে আয়ুর্বেদের আয়ু সম্বন্ধে গভীর পর্যালোচনা ও গবেষণাদ্বারা প্রাণবায়ুর, আজই আমাদের পক্ষে নিজের পুনর্মূল্যায়ন না করতে পারলে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের কঙ্কালই অবশেষ উদ্ভুক্ত হবে না। আর এই কথা স্মরণ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় আমাদের সম্প্রতিকার বর্তমান আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচার ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ অবলম্বনে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে আয়ুর্বেদের বিশেষ সম্পর্ক ও অনেকটা ছিন্ন হয়েছে। সুতরাং আয়ুর্বেদের শিক্ষার আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি ও প্রণালী গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে যে পুনরুদ্বিগ্নের কাছে আমাদের যোগের আয়ুর আলোকবর্তিকা নিয়ে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান আমাদের উদ্ভাসিত করতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে—

কীভাবে আজিনাতে
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানেরে
নিজের দেশে না হারি যেন,
বিদেশে মিই সম্মানে।
জগতে যত মানুষ আছে
ওষধি হলে প্রমাণ তাতে
যোগের ঘরে ঘরে।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে
লিকোরিণা
সাভার কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১/১ অক্রুর লেন, কলিকাতা-১৪

বিচিত্র-প্রসঙ্গ

২৯তম বার্ষিক আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ সম্মেলনের বিবরণী

২৫শে পৌষ হইতে ১লা মাঘ, ১৩৬৭

আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ২৯তম ব্যাপী ২৯তম বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে প্রথমেই ২৫শে পৌষ, ১৩৬৭, শনিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সিটিমিশিপাল সিটিজিয়ামে (৭ই জানুয়ারী, ১৯৬১) আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকালিদাস নাগ বলেন যে, সাধারণী চীন ও রুশ সরকার দেশী চিকিৎসার প্রবর্তন করিয়াছেন, আর এখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার আয়ুর্বেদের জন্য কিছুই করেন নাই, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর সান্যাল স্বাগত সম্ভাষণ জানান। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়মুলার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রারম্ভেই পরিষদের ২৮ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী ও বর্তমান অধিবেশনের কার্যসূচী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। কবিরাজ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চাটার্জি, কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, কবিরাজ শ্রীসুধাবিনোদন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীফণীভূষণ রায় প্রভৃতিও বক্তৃতা প্রসঙ্গে করেন।

বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন

রবিবার, ২৬শে পৌষ, ১৩৬৭ (৮ই জানুয়ারী, ১৯৬১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় চলে ২৯তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনোপলক্ষে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু এম,আর,এস মহোদয় বলেন যে, আয়ুর্বেদের অমূল্য অবদানের কথা স্বীকার করিলেও গবেষণার সাহায্যে উহার অধিকতর উন্নতি সাধন করা কবিরাজদের কর্তব্য। এই দিকে পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি প্রশংসনীয়।

সভাপতির লিখিত ভাষণে কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়মুলার পরিষদের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যাবলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পরিষদ তাহার রজতজয়ন্তির সুযোগে নানারূপ সভা, বিজ্ঞান বিভাগ স্বাস্থ্য-সমীক্ষা, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অন্যান্য উপায়ে আয়ুর্বেদের অনুশীলন ও প্রচার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে ব্যাপৃত। কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেন, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ সেন ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বিভাগীয় সভা

বিভাগীয় সভাগুলি সোমবার, ২৭শে পৌষ হইতে শুক্রবার, ২২শে পৌষ, ১৩৬৭, ৯ই জানুয়ারী —১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬১) অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ারস্থিত ইউনিভার্সিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগগুলি ও সভাপতিবৃন্দের নাম (১) কায় চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীহরিপদ ভূষণ ভট্ট, (২) শল্য শালাক্য—কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী, (৩) স্ত্রীরোগ—কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেনের

অনুপস্থিতে কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার, (৪) গুপ্তরোগ—কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর লাহাল, (৫) শারীর ক্রিয়া বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি, (৬) বন্ধ্যারোগ—কবিরাজ শ্রীসুধীনাথ রায়, (৭) স্ত্রীরোগ-বন্ধ্যা—কবিরাজ শ্রীসচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, (৮) দ্রব্য বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, (৯) মনোবিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, (১০) রস শাস্ত্র—কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্র নাথ রায় শর্মা। বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত কবিরাজগণ নিজ নিজ গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যরাজি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবিনয় কুমার রায় গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন, কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীজগেন্দ্র চন্দ্র নাগ, কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মা, কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঘোষ, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা।

বিভাগীয় সভায় কয় নিয়মুণ কি স্বাস্থ্যকর? আধুনিকতার বিপর্যয়, সংক্রামক ব্যাধি, দ্রব্য পরিচিতি ও সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সূচনা করেন কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার।

আয়ুর্বেদ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ধাতু, পাহাড়-পর্বত ও স্বাস্থ্যবিধির চার্ট, শুষ্ক দ্রব্যাদি, মুক্তক ও পুঁথি ইত্যাদি ছিল। প্রতিদিন ২৪শে পৌষ হইতে ২৯শে পৌষ, ১৩৬৭ অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকে এবং অপরাহ্ণ ৫টার পর জনপ্রিয় বক্তৃতামালা আয়োজিত হইয়াছিল। বক্তা ও বিষয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—খাদ্য—কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন, চরকের স্বাস্থ্যবিধি—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী, সংক্রামক ব্যাধি—কবিরাজ শ্রীঅমলা চরণ সেন, পারিবারিক চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, টোট্‌কা—কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা, আয়ুর্বেদ ও ভিন ধর্ম—কবিরাজ শ্রীকুসুম চন্দ্র ভট্টাচার্য।

তৃতীয় বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের সহিত এই তিন বৎসর ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের সমগ্র সংস্কৃতির সহিত আয়ুর্বেদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই এই সম্মেলনে নানাবিষয়ে আলোচনার অবসর উপস্থিত হয় এবং বিশেষজ্ঞগণ ইহাতে যোগদান করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতে সমর্থ হন। এবারের অধিবেশনে ডাকরাজা হলে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক ডঃ শ্রীশ্রীকুমার ব্যানার্জি সভাপতির আসনে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার নিজস্ব আচার ব্যবহার, আদর্শ, সমাজ, ধর্ম-নীতি প্রভৃতি বিশিষ্ট ছাপ বহন করে—ইহার প্রতি সকলের দৃষ্টি প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেন যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলন একটী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিবে। আধুনিকতার তরঙ্গে ভারত তাহার নিজস্ব চিন্তাধারা হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র, কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, ডঃ শ্রীসুধাংশু ভূষণ দাস, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা, শ্রীনগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি (কাউন্সিলার), কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মা, শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিষয়ের অবতারণা করেন।

• • •

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশত্তম বার্ষিক

অধিবেশন ২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী হইতে ২১শে জানুয়ারী, ১৯৬২) হইতে ৭ই মাঘ, ১৩৬৮ পর্যন্ত চলিবে। ১৩ই পৌষ ও ১৪ই পৌষ যথাক্রমে আয়ুর্বেদ প্রদর্শনী ও বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন সিটিনিসিপাল সিটিমিয়াম ও যাদবপুর হলে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) হইবে। কলেজ ফোয়ারস্থিত ইউনেটস্ হলে ও যাদবপুর হলে যথাক্রমে বিভাগীয় সভাগুলি ও ৪র্থ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন ১লা মাঘ—৪ঠা মাঘ এবং ৭ই মাঘ, অনুষ্ঠিত হইবে। বিভাগীয় সভাগুলির বিষয় সমূহ এই—(১) কায়-চিকিৎসা, (২) শল্য-শালাক্য, (৩) সুশ্রুত-সংহিতা, (৪) চরক-সংহিতা, (৫) দ্রব্য বিজ্ঞান, (৬) প্রসূতি বিজ্ঞান (৭) সংক্রামক ব্যাধি এবং (৮) মনোবিজ্ঞান।

• • •

বিগত ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮ শনিবার রাত্রিকালীন সুবর্ণ জয়ন্তী আয়ুর্বেদ কলেজ ভবনে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলনের আগামীবারের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আয়ুর্বেদের প্রাচীনত্ব, উন্নতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্নক্ষেত্রে উহার বিস্তৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও অশোকের অবদান সম্বন্ধে বলেন। কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র মল্লিক সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় মহাশয় স্বাগত সম্ভাষণ জানান। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন 'আয়ুর্বেদের সার্বজনীনতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীঅনিলেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্তও বক্তৃতা করেন। শ্রীঅমলীকান্ত মৈত্র মঙ্গলাচরণ করেন ও কবিরাজ জ্যোতিঃ প্রসন্ন সেন ধন্যবাদ প্রদান করেন।

• • •

বিগত রবিবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ বঙ্গীয় উদ্যান আশ্রমে ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডঃ লিওন ওয়াল্ফেন্ স্টাইকোসোম্যাটিক ডিজর্ডার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীসরোজ নাথ বসু সৌম্যদর্শিত করেন। উদ্যান আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-তত্ত্বাবধায়ক কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী ঘোষ সভাপতিত্ব জানান। কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার বসুমহাশয়, অধ্যাপক শ্রী পি, এন, চৌবে, অধ্যাপক শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী, কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ও বহু মনস্তত্ত্ববিদ্ উপস্থিত ছিলেন।

• • •

বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ শুক্রবার একাদশ বার্ষিক ভেষজ প্রদর্শনী দিবস কলেজ ফোয়ারস্থিত ইউনেটস্ হলে কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসুমল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র কর উহার উদ্বোধন প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের উন্নতি ও প্রসার কামনা করেন। কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার বসুমহাশয় সভাপতির সম্বর্ধনা জানান আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন ও কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জিও বক্তৃতা করেন।

১৭নং বেচু, ১ মং পটুয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার বসুমহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১, মহারাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে তাঁহার কর্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্বেদ-ভারতীর নিয়মাবলী

১। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বৃহত্তর ও প্রাচীনের আয়ুর্বিজ্ঞানের তথ্য-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ইহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ও যথাসম্ভব উহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

৩। বাংলা বৎসর অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদকের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সম্পাদক "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতীতে" প্রকাশের জন্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

বহু প্রত্যাশিত "আধুনিক রোগের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রকাশিত হইল।" আধুনিক রোগের ইংরাজী নামের পাশাপাশি নাম দিয়া ইংরাজী জানা অনভিজ্ঞ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ অনেক সময় বিপাকে পড়েন। তাঁহাদের এই বিপদটি নিবারণকল্পে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাশুল ১৭১ নয়া পয়সা। যদি আপনি এই পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন তবে নমুনা অর্ডার দিয়া বাধিত করিবেন। অন্যান্য প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

১।	বঙ্গ চিকিৎসা ২য় সংস্করণ ১ম ভাগ	৩৲	৯। হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৫৲
২।	বঙ্গ চিকিৎসা ,, ,, ২য় ভাগ	৩৲	১০। আয়ুর্বেদের ইতিহাস	৬৲
৩।	বঙ্গ চিকিৎসা ,, ৩য় ভাগ	২৲	১১। রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা (হিন্দী)	১০৲
৪।	বঙ্গা চিকিৎসা ১ম ভাগ	৫৲	১২। বঙ্গ চিকিৎসা (হিন্দী)	৬৲
৫।	বঙ্গা চিকিৎসা ২য় ভাগ	৬৲	১৩। আমবাত চিকিৎসা (হিন্দী)	৬৲
৬।	আমবাত চিকিৎসা ২য় সংস্করণ	৩৲	১৪। আমবাত চিকিৎসা (গুজরাটী)	২৲
৭।	দুষ্টব্রণ চিকিৎসা	৩৲	১৫। বঙ্গ চিকিৎসা (উড়িয়া)	৩৲
৮।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে	৪৲	১৬। Ayurvedic treatment of cancer	10/-

রাজবৈদ্য কবিরাজ ডাঃ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়,

১২৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

PIONEER
VESTS

ARE
HYGIENICALLY BLEACHED !

EVERY BODY
NEEDS
PIONEER VESTS

Also Tee shirts,
Jersey shirts,
Chest Shields,
Drawers &
Briefs

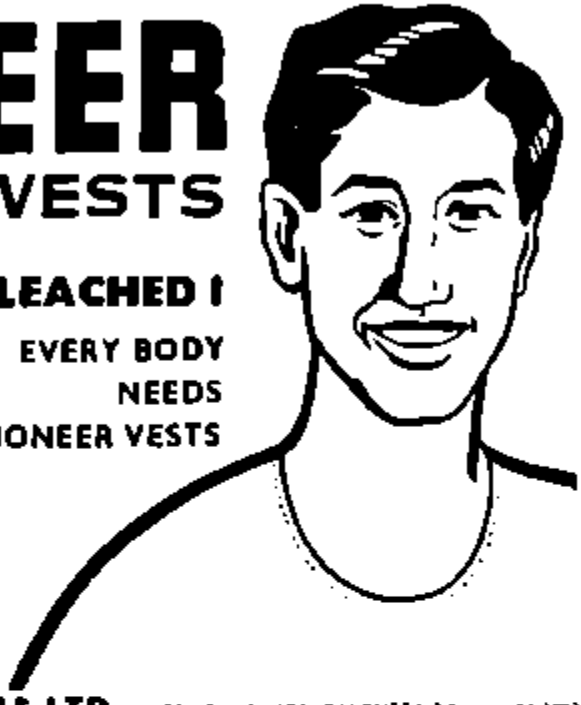

PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-7 Phone : 34-[illegible]

THE 'AYURVEDA-BHARATI'

A multilingual Quarterly Journal is the right vehicle for the dissemination of cultural and scientific matters, specially of the knowledge of Ayurveda and its practice It seeks unstinted support and sympathy from the Profession and the Public.

Editor,

AYURVEDA-BHARATI.

আয়ুর্বেদ-ভারতী

বার্ষিক

★

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম. এ. আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়

১১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

পূর্ণ সংখ্যা ১৪ ন.প. মাঘ ১৩৬৮ বার্ষিক—সডাক ৬৲

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৬৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	শুভেচ্ছা জ্ঞাপন—	৭৫
২।	সম্পাদকীয়—	৭৬
৩।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ২২ তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতির অভিভাষণ।	৭৭
৪।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩০তম বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান-সূচী	৭৯
৫।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ২০তম বার্ষিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৭৩
৬।	সমগ্র বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে অভ্যর্থনা সমিতির বিবরণ	৭৭
৭।	আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান—	
	পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী	৭৮
৮।	মনের মতন—	
	অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত	৭৯
৯।	বিশ্ব মনের ক্রমবিকাশের ধারা—	
	অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার [illegible]	৯০
১০।	আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধি বৈজ্ঞানিকী চিকিৎসানুমোদিত যোগ—কবিরাজ শ্রীসুধাবিনোদন ঘোষ	৯১
১১।	সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ—শ্রীঅমলেন্দু মৈত্র	৯১
১২।	অমরবীণ্ড নাথ (কবিতা)—	
	শ্রীঅমলকুমার মজুমদার	৯৯

পাইওনিয়রের সেফ্টি রেজারসমূহ ইস্পাতে তৈরী। সুতরাং প্রথম ব্যবহারকাল হিসাবে পাইওনিয়রের সেফ্টি ব্যবহার করা উচিত।

পাইওনিয়ার লিটিং মিলস লিঃ

"পাইওনিয়ার বিল্ডিং"

বি, টী, রোড, কলিকাতা-২

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আকার ১ ডবল ক্রাউন। ইহাতে এককালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রত্যেকটি :

প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা	১২৫৲	সাধারণ পৃষ্ঠা	১০০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	১০০৲	সম্পাদকীয় অন্যান্য প্রকাশ্য প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ স্থানের হার—	
তৃতীয় পৃষ্ঠা	১০০৲		১৫০৲ বা অধিক।
চতুর্থ পৃষ্ঠা	১৫০৲		

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে আবশ্যক ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিকট করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার পর অগ্রিম দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা বাধ্যতামূলক নিয়ম হিসাবে প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদ ভারতী' অফিস,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী

আয়ুর্বেদ-ভারতী

বার্ষিকী

"আয়ুষো বর্ধনং নরাণাম্"

ত্রৈমাসিক ১ম বর্ষ	মাঘ, ১৩৬৮	দ্বিতীয় সংখ্যা (জানুয়ারী, ১৯৬২)

শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ এস, রাধাকৃষ্ণান্ লিখিতেছেন :

Vice-President
India
December 18, 1961.

Dear Sri Bagala Majumdar,

Thank you for your letter. There is no liklihood of my coming to Calcutta in the month of January. However, I send my best wishes for the success of the 30th session of the Ayurveda Bijnan Parishad.

Yours Sincerely,
(Sd.) S. Radhakrishnan

কেরলের রাজ্যপাল শ্রী ভি, ভি, গিরির বাণী :

Raj Bhavan,
Trivandram,
6th January, 1962.

I am happy to learn that the 30th session of Ayurveda Bijnan Parishad is to be held at Calcutta from the 13th January, 1962.

Ayurveda had been neglected in the post but it is heartening to know that this ancient art of healing is being revived throughout India. Much work has to be done especially in the field of research for making this system perfect and I am sure that the Parishad will give a lead to this important work.

I wish the endeavours of the Parishad every success.

Sd. V. V. Giri

Kaviraj Shri Bagala Kumar Majumdar,
Founder-President, Ayurveda Bijnan Parishad,
52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.

সম্পাদকীয়

বসন্তের ঐশ্বর্যে যেমন বনভূমি নব নব পত্র পুষ্পে সজ্জীবিত হয়ে ওঠে, আবার শীতের স্পর্শে সব শ্রীহীন প্রাপ্ত হয়, মানুষের জীবনও তেমনি—চিন্তবিকারে তার পরিবর্তন আসে, কালে অকালে জরা পড়ে—এ সত্য হলেও নির্মম নিষ্ঠুরতা। বাংলার দুর্ভাগ্য, এগারো জনের এক বছরের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রিকাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সাংবাদিক হেরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শিক্ষাবিদ ডাঃ নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত, বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, কবি সজনীকান্ত দাস, ডাঃ সুবোধ চন্দ্র মিত্র, পরিশেষে রসায়নবিদ ডাঃ ধীরেশচন্দ্র গুহকে আমরা হারিয়েছি। তাঁদের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এবার আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন বিষয়ের বৈচিত্র্যে, নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিশ্লেষণে এবং আলোচনার গভীরতা ও মৌলিকতায় স্মরণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুধাবন, ব্যবহারিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অনুসন্ধানের ফল চিকিৎসাক্ষেত্রে নূতন আলোক সম্পাত করেছে। রোগের লক্ষণানুযায়ী শারীরবৃত্তীয় বিকৃতির অনুধাবন, ওষধি ও রসায়ন প্রয়োগ, বীর্য বিপাকাদির বিচার ও আন্তরিক প্রয়োগ, পথ্যের রোগানুসারী ভেষজগুণ ও দোষানুগ ক্রিয়া—ঋতু ও পারিবারিক বিচিত্র ব্যবহার, জলবায়ু দিন ও অনুকূল, রস ও খাদ্য বিচার, ত্রিদোষের ও ত্রিগুণের প্রকৃতি ও বিকৃতির কারণে মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির উৎপত্তির বিশ্লেষণ—প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞানের ঐশ্বর্য বিজ্ঞানে নিষ্ঠ মনোযোগের নিদর্শন।

ক্ষুদ্র হলেও নানা প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদিতে আয়ুর্বেদ-প্রবর্তনী জনসাধারণের মনে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার বিভিন্ন উপকরণ ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ ও প্রত্যুত্তরাদি সম্বন্ধে একটি চাক্ষুষ ও নির্ভুল ধারণা সৃষ্টির করতে সমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ উত্তরের চিন্তাপটে গভীরতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। জটিল ও আকস্মিক ব্যাধির জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন থাকলেও দৈনন্দিন জীবনের আরোগ্যের, চলাফেরার সুষ্ঠু আচরণে যেন রোগমুক্ত এবং যেন দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ সম্ভব হতে পারে তাই আয়ুর্বেদের মূল লক্ষ্য।

যন্ত্রসভ্যতার যৌবনে যখন মানুষকে অতিকূল ও জীবনঘাতী করে তোলে তখন উহা ঘটায় বিপদের কারণ ও প্রযুক্তিবিদ্যার অকল্যাণ। জীবনে থাকে গতির বৈচিত্র্য—মন্থর, অপরিমিত; সুতরাং জড়-বিজ্ঞান ওপর মানুষের সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভুত্ব ও সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার, নচেৎ প্রতিবেশকের মতন সে অকরুণ এবং একটু ভুলে রোগাস্তর সৃষ্টি। এমন কি

(দেখানে ৯৮ পৃষ্ঠায়)

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন—১৩৩৮

স্থান : মহারাজা মনি. ঈ্ডেন্ট্ মনি ও
মিউজিলিপ্যাল মিউজিয়ম

উদ্বোধন উৎসব

মহারাজা মনি- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

বন্ধুগণ,

আমার আশা এক বৎসর পরে মিলিত হয়েছি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন উৎসবে প্রাচীন ও আধুনিক মনীষার সমন্বয়ক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক, মনীষার উদ্গাতা, মনোপতি, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান-আয়ুর্বেদের বিধানী এবং তার উৎকর্ষ সাধনে ও অনুশীলনে ব্রতী। আপনারা আমার আন্তরিক নমস্কার গ্রহণ করুন।

প্রথমেই আমি পরিষদের পক্ষ হতে সভাপতি ডাক্তার পদ্মভূষণ মহামহোপাধ্যায় গণিনাথ সিংহ-মহাশয় মহাশয়কে পদ্মশোভনমণ্ডনে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তিনি যে খানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার, ও খানি সংস্কৃত গ্রন্থের লেখক, সর্বোপরি বিরাট ভারতবর্ষের এক দল রোগের যথার্থ ও পুনর্মূল্য করেছেন যারা জীবন আজীবন পরিশ্রম করে। জ্ঞানের সাধক, ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক, ঋষিপ্রতিম দর্শন সিদ্ধান্তবাগীশের আজীবন সাধি কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মহাযুদ্ধের দামামা ও অর্থসঙ্কটের বিভিন্ন ধাক্কায় অবধারিত ভাবে পরিষদ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তার অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে, অপরিসীম হয়েছে অনেক ক্ষতিস্বীকার। আপনাদের সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রাঙ্গণে তা অবশ্য পরিমিত লাভ করবে, আশা করি। বাস্তুহারা বেদনা, একের পর এক বিপদ হয়ে উপনীত হয়েছে, প্রত্যেক বেদনা মূক-ভাষা পূর্ণ করে উঠত, তেমন ভাষা কর্ম ও সবেদনার মাধ্যমে অজ্ঞাতকে জানবার, অনন্তমুখকে উপলব্ধি করবার মুক্ত আকাশে, অপূর্বকে পূর্ণ করবার অভিযানের ব্রত পরিষদ গ্রহণ করেছে। মনীষা রোগের যত প্রকারভেদ আছে বিভিন্ন ধারা দায়িত্ব বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে, ভিন্নধারা হতে পারে না—প্রকৃতির প্রকৃতিকে, জীব ও জগতের চিরন্তন উপাদানী শক্তি নিয়ে নতুন সৃষ্টি করেই চলেছে।

আয়ুর্বেদের নানা অবদান জ্ঞানে বিজ্ঞানে, দর্শনে চিন্ত কথায়, সাহিত্যে, ভাষায় ও ভাবনায়, আর তার কি। আধুনিক বিজ্ঞানের সমাবেশের চারিদিকে বিস্তৃতির, তা হয়ত, অনেক সময় কুণ্ঠিত ও বিধিত করে অবলম্বনাহরণকে, অথবা আনে নিজের দেশের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি। কিন্তু ইহা ভুলতে চলবে না—ভারতীয় বিজ্ঞানের আলোকোৎসে অবলম্বনাধার ও আকাশী—পরিব্রাজকম, অন্বেষক ও সাধকদের মনোভাবের অভিব্যক্তির মধ্যেও তার চিকাগোর চিকিৎসাক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সৃষ্টিকর্তার ভাবনে পর পরাধীন বিধির আন্ত উদ্ভিন্ন করে চলেছে। আয়ুর্বেদ শুধু ভারতীয়ের চিকিৎসার বেদ নয়—বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিয়ামক ও মূলনীতি। আজে সংবিজ্ঞানের বেদোদ্যানে পুষ্পিত, ভবিষ্যে ফলবান হবার মতন মানবমনের বিভিন্ন প্রকাশের যে মনীষা মূল মূল সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবলম্বন করেছে নানাভাবে, যেমন নানাবর্ণের ফুল উদ্যানের শোভা বর্ধন করে, তাকে সমকলাপ (uniformity) অভিধায় আবদ্ধ করলে এর সব কটির তার লঘু হবে, ফলে মানুষের মনের সহজাত গতি-শীলতা অন্ধ-রাগতা নবীন পরিণতা প্রাপ্ত হবে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় অন্নদাকান্ত দাস-বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করেছেন যে, ভারত সরকার ডাক্তারী ও অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানগুলির পাশাপাশি অবস্থান সমর্থন করেন না, তথা তিনি কলেজে পাঠরতী ছাত্রীদিগকে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে জ্ঞানের উন্নয়ন করবেন। ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হ'লো আয়ুর্বেদের অতিত্ব লোপ করে দিয়ে ইহার অমূল্য ঔষধগুলি ও অন্যান্য যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা ডাক্তারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। কেন না, আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলিকে আধুনিকীকরণের মধ্যে ভারতীয় এলোপাথীর স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে নিহিত রয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার পর হ'তে অদ্যাবধি স্বার্থান্বেষী আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ কয়েক জন ইংরাজী সরকারী নীতির পরামর্শদাতা। যার ফলে, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী তেমন স্বচ্ছ বা এলোপ্যাথিদের অন্যই সহীর্ণতার ঘারা নিয়ন্ত্রিত হবে না আশাকরি।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক। ইহার মৌলিক-নীতি এলোপ্যাথী হতে ভিন্ন—তার স্বাভাবিক বিজ্ঞান, স্পর্শ, মাত্রাভিজ্ঞান, রোগনির্ণয় প্রথা, ঔষধনির্মাণ-বিধি, দ্রব্য-বিশ্লেষণ, পথ্য বিজ্ঞান, দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও বিকৃতির অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতিও ভিন্ন। সুতরাং ঔষধগুলির আধুনিকীকরণ ও আয়ুর্বেদীয় দু'একটা বুলি আওড়ালেই আয়ুর্বেদ শিক্ষা হয় না। ইহা একটি মানসিক বিজ্ঞান। যেদিকের কলেজে ছাত্রের ধারণার মধ্যে তার অভিজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা আধুনিকের পরিচয় বহন করে পারে, যা হবে কিন্তু তার নিজের বিজ্ঞানের পরিধি, তার সমাধি ভঙ্গ করা হবে তার অবাঞ্ছনীয় ভাবে।

স্বাধীনতার পূর্বকালে ভারত তার অনেক নিজস্ব সৃষ্টি হারিয়েছে—অনেক সরকার নিজস্ব সৃষ্টি হয়েছে তার, তবু আয়ুর্বেদের ঔষধ সমস্ত ভারতে কত শত লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ইহাকে সরকে ঔষধ তার নীতি আন্তর্জাতীক ভারতীয় বিজ্ঞানের মুষ্টিমেয়, যেন, যব ও আমার মানসিক বিশ্লেষণের ধীরা, চিকিৎসার সরল ও সহজলভ্য পথ, যেমন কি, বিশ্ববিজ্ঞানে চিন্তা ও কল্পিত বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট আদর্শের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি সাহিত্য—সর্ববিষয়ে এর মত প্রকাশ হৈচিত্র্য মূল সত্যেরই আরাধনায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের সরলকে চালাও, আমার সত্য নিহিত হয়ে যায় তার অন্তরে। আয়ুর্বেদের বেলায়ও তা ঘটাতে চেষ্টা চলেছে যদিও ইহা একটি জীবন্ত বিজ্ঞান। ইহার বিভিন্ন ও বিচিত্র বিজ্ঞানসমূহের যার উদ্ঘাটনের মত রয়েছে পড়ে রয়েছে।

আয়ুর্বেদের জন্মোৎপত্তির ইতিহাস একটি বিজ্ঞানের জন্মলাভের মূলে তথা আবিষ্কার ও অনুশীলনের ইতিহাস। বিভিন্ন আচার্যদের প্রতিভার মৌলিক ঔষধ, ব্যবচ্ছেদ, রোগবিজ্ঞান, বিশ্লেষণতন্ত্রের বিকৃত ও নানা ব্যাখ্যা, দ্রব্যবিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, সমীক্ষা, যোগের পর, আহারের উৎকর্ষ ও পরেক্ষা ও বিবিধ বিজ্ঞানের তার প্রভাব। শুধু মানুষের চিকিৎসা নয়ে, পশু, অশ্ব, গজ প্রভৃতির ও চিকিৎসা—হস্তায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ ও অশ্বায়ুর্বেদ তার সাক্ষ্য। অতএব ইহাকে পিতিনীয় বলা চলে না। যেখানে আশা করা বিশ্লেষিত পরেক্ষা ও স্বাধীন সরকার-কর্তৃক হয়ে আয়ুর্বেদের উন্নয়নের বিধিব্যবস্থা করবেন সেখানে মনে হয় যেন আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদজ্ঞদিগের অন্তরায়স্বরূপ। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতোত্তর যত ঔষধালয় তা পাশ্চাত্যেরই পুরস্কৃত বৃদ্ধি ও অনুকরণ। তর্ক হলেও যে সৃষ্টি হয় না, তা নেতা নেতা। স্বাধীনতার ফলে সমস্ত জাতির মূল্যায়ন, তাতে আয়ুর্বেদ যদি তার অতীত ঐতিহ্যের সেতু ধরে জ্ঞানের অন্বেষণের পথে চলে তার মৌলিক নীতি অব্যাহত রেখে, তবে বিজ্ঞানজগতে ভারত তার বিশিষ্ট অবদানের গৌরব লাভ করবে—পরের আলোয় আলোকিত হয়ে সে মহান লাভ অসম্ভব। তা বলে জ্ঞানবিজ্ঞানে লাভ ও ভারতের নীতির বিরোধিতা করছি না - নিজের কি আছে ও কি সৃষ্টি করে পারি তারও তথ্য রাখা ও মূল্যনীতি দিয়ে অনুধাবন করা দরকার।

আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি ও নীতি ঐতিহাসিক বিজ্ঞানেরই তাদের সূচনা করে। তাদের অনুশীলন ও সম্প্রসারণের দিকে পরিচয় বজায় রাখা চেষ্টা করে আসছে। ইহাদের সমস্যা সমাধানার্থে যে বিশ্লেষণের জীব ও অনুকরণ

সম্মানজনক অভিযান তার মূলনীতিই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বর্তমানে নানা আবিষ্কারের চাকচিক্যে যান্ত্রিকতা আয়ুর্বেদি অপেক্ষা করে চলেছে বেশির ভাগ লোক এবং প্রতিষেধক হিসেবে ওষুধপত্র ও নিদান অকপটে ব্যবহার করছে। কিন্তু ইহা আমাদের সমরণে রাখিতে হবে, রোগের আক্রমণের পরিবর্তে প্রতিষেধক পদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ-প্রতিষেধক। তাই প্রতিনিয়ত জীবনের মধ্যে রোগের লোক মুক্ত থাকে। সাধারণত রোগের আক্রমণ, ব্যথা ও অন্যান্য বিভিন্ন বৈষম্য ও ব্যাধিবিধির ব্যবস্থা। এই রোগের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে রোগ এই রোগের আয়ুর্বেদের বৈষম্য, আহারাচার, বিধিনিষেধে বেশি ভাবনাশীল ও সাবধান।

প্রতিষ্ঠিত দুঃ রাজ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পরিবর্তনশীল রয়েছে। যেখানে ব্যক্তির কারণের ওপর নীতি ও বৈষম্যের পরিবর্তন, তখনকার নির্ভর করে সেখানে বিপর্যয় ঘটেছে। সুতরাং পুরাতন আর নতুন বলে কোন বস্তু গ্রহণ বা বর্জনের কথা, তা নয়—সত্যের সহজবোধই বড় কথা।

স্বাধীনতা ও যথেষ্ট বিজ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা অবিবেচনা। বহু আবেদন, নিবেদন ও আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ বিল পাশ হলো—রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও আজ আইন। বড়ই আনন্দের বিষয়, অনেক বাদ অতিবাহিত হলো তবু উহাকে কার্যকরী করবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আয়ুর্বেদের দরদী ও সমর্থক, তাকে কোথায় বিলের গতি অবরুদ্ধ হলো, এ এক বিস্ময়ের বিষয়। আশা করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সরকার অবস্থিবিলম্বে ইহার প্রণয়নে অগ্রণী হবেন। এতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কি রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি পাবে না, জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক ও নিরাপদ, রোগমুক্ত ও সুস্থ-প্রসূত চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রসারিত হবে।

পরিষদের বিজ্ঞান বিভাগ, গবেষণাগার, স্বাস্থ্যসমীক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে উপদেষ্টার ব্যবস্থা, গবেষণামূলক মাসিক আলোচনা—তার আয়োজনালয় সম্মেলন ও চরক প্রভৃতি বিদেশ পালন প্রভৃতি আয়ুর্বেদের উন্নতির সাধনে সহায়তা করে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আয়োজনালয় সম্মেলন ও একাদশ বার্ষিক চরক প্রভৃতি বিদেশ পালনের উদ্যোক্তা করেন তখনকার ডঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়চন্দ্র কর এবং মহাপল্লির ভবনের কবিরাজ শ্রীরাম চন্দ্র মল্লিক ও কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার, কবিরাজ শ্রীহরিপদ চাটার্জি, অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধুভূষণ সেন গুপ্তা, কবিরাজ শ্রীসুধাবিনোদের ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবিমলকৃষ্ণ সেন, কবিরাজ শ্রীসত্যনারায়ণ সেন, কবিরাজ শ্রীসত্যনারায়ণ সেন, শ্রীমতী আশা বৈদ্য প্রভৃতি ভূতপূর্বী ও সাময়িক বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধুভূষণ সেন গুপ্তা, কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার সেন, কবিরাজ শ্রীহরিপদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীসুধাবিনোদের ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার প্রভৃতি বক্তাদের আয়ুর্বেদ সাহিত্যের ঐতিহ্য, আধি ও ব্যাধি, পঞ্চকর্ম, জীবোদ, পথ্য বিচার, ঔষধিবিধান ও চরকের মূল্যবান সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন ও সভা প্রতিষ্ঠাত্রী-মহাপল্লির পৌরোহিত্যে অতীতের ন্যায় এবং নানা বিষয়ে উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হয় অনুশীলন ও নিজ নিজ অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের জন্য।

এবারের অধিবেশনের চারটী প্রধান আয়োজন করা হয়েছে, যথা—(১) আয়ুর্বিজ্ঞান, (২) পল্লী-সাধারণ, (৩) স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, (৪) পথ্য বিজ্ঞান, (৫) সংক্রামক ব্যাধি, (৬) দ্রব্য বিজ্ঞান, (৭) স্বস্থ-সুস্থসূত্র, (৮) মনোবিজ্ঞান। এইসঙ্গে আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী এবং জনসভার বক্তৃতামালার আয়োজনও রয়েছে।

আমাদের গবেষণাগার ও রোগোদ্ধার বাগানের পরিকল্পনা আছে। আশা করি, সত্বর তদনুযায়ীরূপের সাহায্যে তা অচিরেই রূপায়িত হবে।

অবশেষে আবার আপনাদিগকে স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি।

এই সুদীর্ঘ দিনের যাত্রাপথে কত পেয়েছি, কত হারিয়েছি, কত আলো ও মলিনতা, ঘাটে ঘাটে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের অপলাপ ও অসত্যের প্রলাপ, মহাজনের কোন বিরোধের, কখনোপরিত অবজ্ঞার দুঃখ কিরিয়েছে, বীচিতে দোলি, তা হলেছি, চলবার অধিকার সবারেই আছে। নবীনের বিশ্বাসে চিরন্তন অবজ্ঞাত, অবাঞ্ছিত দুঃখে যুগে যুগে মহাপল্লির সহানুভূতি সহায়তার ইঙ্গিত করা করেছে—প্রতি ঘাটে মানুষের চিন্তাজগতে ও চিকিৎসনে বিরাট এনেছে—নূতনকে আহ্বান জানিয়েছে সত্যের মধ্যে পুরাতনের আবিষ্কারের মধ্যে দীপ হ'য়ে দীপান্বিতে যেমন। আজ, সেই যাত্রাপথে সত্যের বেদীমূলে আমরা সকলে মিলিত হই যেমন মুক্ত অগ্নির মন্ত্রের দিকে যাবিত হয় মহাগিনদের আবহে।

যথেষ্টাত্মম্

কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন ১৩৬৮

অনুষ্ঠান সূচী

শনিবার, ১৮শে পৌষ, ১৩৬৮

(৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৬২)

স্থান—মিউনিসিপাল মিউজিয়াম,

কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বৈকাল ৪টা আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন

(ক) বন্দনাগীতি ও মাঙ্গলাচরণ

(খ) স্বাগত সম্ভাষণ—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসুমল্লার

(গ) উদ্বোধন—শ্রীযুক্তেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেয়র,

কলিকাতা কর্পোরেশন

(ঘ) উপস্থিত জন মণ্ডলীকে বক্তব্য

(ঙ) সভাপতির অভিভাষণ—

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(চ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন

রবিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৬৮

(১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬২)

স্থান : রাজভাষা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈকাল ৫-৩০টা—বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন

(ক) বন্দনাগীতি ও মাঙ্গলাচরণ

(খ) স্বাগত সম্ভাষণ—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসুমল্লার

প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

(গ) উদ্বোধন—ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

(ঘ) উপস্থিত জন মণ্ডলীকে বক্তব্য

(ঙ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন—

কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দনাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক

রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৬৮, বৈকাল ৪টা

(২১শে জানুয়ারী, ১৯৬২)

স্থান : রাজভাষা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

সভাপতি : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

(ক) বন্দনাগীতি ও মাঙ্গলাচরণ

(খ) সভাপতি—কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রকুমার বসুমল্লার

(গ) ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্নধারা :

বক্তা—অধ্যাপক ডঃ শ্রীবাগীশ্বরী শাস্ত্রী

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন শাস্ত্রী

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীউমাশঙ্কর শাস্ত্রী

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীবনবীহারী মৈত্র

কবিরাজ শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন

অধ্যাপক ডি, এন, চক্রবর্ত্তী

ডঃ শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীবিজয়েন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী প্রভৃতি

(ঙ) সভাপতির অভিভাষণ

(চ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সোমবার, ১লা মাঘ, ১৩৬৮, বেলা ২টা

(১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬২)

স্থান : ইউনিভার্সিটি হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাখা :

সভাপতি—পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

প্রবন্ধ পাঠ :
প্রবন্ধযোগ—কবিরাজ শ্রীবনমালাকুল সেন
ইমান-মাজীকরণ—কবিরাজ শ্রীমধুসূদন সেন
আলোচনা চক্র : বিষয়ে যত্ন
বক্তা—কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর
কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী
কবিরাজ শ্রীনাথীলাল পর্ব।

বৈকাল ৫টা।
সভা-সমিতি পাঠ :
সভাপতি—
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন, এম, এ
প্রবন্ধ পাঠ :
প্রবন্ধযোগ—কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, এল, এ, এম, এস, ভিষক্‌তীর্থ
প্রবন্ধযোগ—কবিরাজ শ্রীমধুসূদন ঘোষায়ী, ভিষক্‌তীর্থ
বিজ্ঞানীয়—কবিরাজ শ্রীসত্যজ্যোতি চক্রবর্তী
এল, এ, এম, এস, ভিষক্‌তীর্থ
বৈকাল ৫টা - অবশ্যিত বক্তৃতা।
স্থান :]ষ্টেডিয়াম
বিষয় : স্বাস্থ
বক্তা—কবিরাজ শ্রীমধুসূদন সেন
কবিরাজ শ্রীনিরিবালাবর মজুমদার

মঙ্গলবার, ২৪া মাঘ, ১৩৬৮, বেলা ২টা
(১৬ই জানুয়ারী, ১৯৬২)

স্থান - ষ্টুডেন্টস্ হল
প্রবন্ধযোগ—ফুসফুস রোগ পাঠ :
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীরাধানাথ সেন কাব্যতীর্থ
অবতারণা—কবিরাজ শ্রীমহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম, এ : এম, বি
প্রবন্ধ পাঠ :
প্রবন্ধযোগ—কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রবন্ধযোগ (Thrombosis)—কবিরাজ শ্রীনিবারণ রায়
এল, এ, এম, এস, ভিষক্‌তীর্থ
প্রবন্ধযোগ—কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেনগুপ্ত
এল, এ, এম, এস, ভিষক্‌তীর্থ
আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা :
বক্তা—কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্তকবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী
কাব্যতীর্থ, এল, এ, এম, এস

বৈকালে ৫টা
ব্রতী বিজ্ঞান পাঠ :
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গুপ্ত, এম, এ
প্রবন্ধ পাঠ :
কৈবর্তবিধান—কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ভূষিতীর্থ
ব্রতপরিচয় ও সংগ্রহ—কবিরাজ শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
এল, এ, এম, এস, ভিষক্‌তীর্থ
আলোচনা চক্র : ব্রতবিজ্ঞানের প্রগতি
বক্তা—কবিরাজ অমিয়কৃষ্ণ পাত্রী
কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন পর্ব।
কবিরাজ শ্রীঅমৃতপ্রসাদ পাত্রী

বৈকাল ৪টা—অবশ্যিত বক্তৃতা
মূর্ছারোগ—কবিরাজ অনিলবিহারী পর্ব।
কবিরাজ শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য
এল, এ, এম, এস, ভিষক্‌তীর্থ

বুধবার, ৩রা মাঘ, ১৩৬৮, বেলা ২টা
(১৭ই জানুয়ারী, ১৯৬২)

স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল
সংক্রামক ব্যাধি পাঠ :
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ গুপ্ত মজুমদার
অবতারণা—কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, এম, বি
প্রবন্ধ পাঠ :
মহামারি—কবিরাজ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত
বসন্ত—কবিরাজ শ্রীহরিপদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যভূষণ
রোগ—কবিরাজ শ্রীনিবারণ সেন, এম, এ, এস, এস
ভিষক্‌তীর্থ
আলোচনা চক্র : প্রতিষেধক পাঠ

বক্তা—কবিরাজ শ্রীসুধাংশিমোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ
কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তী
বৈকাল ৩টা
প্রশ্ন-গ্রন্থি রোগ পাঠ :
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীমধুসূদন সেন, বিদ্যারত্ন
প্রবন্ধ পাঠ :
গ্রন্থি রোগ—কবিরাজ শ্রীমনসমুদার সেন গুপ্ত
বাতব্যাধি—কবিরাজ শ্রীমতিলাল চাটার্জি
বৈকাল ৪টা—অনুষ্ঠান সুরু
স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল
সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ সেন শাস্ত্রী
কবিরাজ শ্রীহরিপদ ঘোষ তর্কতীর্থ

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা মাঘ ১৩৬৮, বেলা ২টা
(১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬২)
স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল

পদার্থ বিজ্ঞান পাঠ :
সভাপতি—কবিরাজ ত্রৈলোক্যনাথ চাটার্জি, এম, এ
অধ্যাপক :—কবিরাজ শ্রীসুধীরনাথ রায়
প্রবন্ধ পাঠ :
যোনীর পথ্য—কবিরাজ ত্রৈলোক্যনাথ প্রসাদ সেন
পথ্য ও ঔষধ—কবিরাজ শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য
এল, এ, এম, এস, তীর্থভূষণ
পথ্যের শারীরক্রিয়াবিজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা
বৈকাল ৩টা
অঙ্গবিজ্ঞান পাঠ :
সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ সেন শাস্ত্রী, এম, এ
অধ্যাপক :—কবিরাজ শ্রীমকুল বিহারী গুপ্ত বি, এম, পি
প্রবন্ধ পাঠ :
মনের ওপর বিষক্রিয়ার রীতি—
অধ্যাপক শ্রী পি, এন, ঘোষের
আলোচনা চক্র : সমাজ ও চিকিৎসা
বক্তা—কবিরাজ শ্রীনিবিড়া পদ্মজা দাশগুপ্তা
কবিরাজ—শ্রীযোগিনিদ্র ভট্টাচার্য এম, এ

অনুষ্ঠান সমূহ।
স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল

বৈকাল ৩টা
দেশী ও বিদেশী পথ্য :
বক্তা—কবিরাজ শ্রীসুধাংশি ঘোষের ঘোষ কাব্যতীর্থ
কবিরাজ শ্রীমধুসূদনসুদার রায় গুপ্ত

পরিষদ, ১৮শে পৌষ হইতে পরিষদ ৩রা মাঘ, ১৩৬৮ প্রতি দিন বৈকাল ৩টা হইতে ৬টা পর্যন্ত আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকিবে।

আবেদন

যোগ দিবার নাম না থাকিলেও যুবক ও ছাত্রগণ উপস্থিত হইতে পারিবেন। একটি অনুরোধ—সভাপতিমহাশয়ের ভাষণ ও প্রবন্ধগুলি লিখিয়া আনিলে আয়ুর্বেদ-ভারতী—মাঘ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। লেখাগুলি আয়ুর্বেদের গভীর তত্ত্ব, অভিজ্ঞতা ও মনীষার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিলে ভাল হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদান আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই দাখীলকরণ যৌগিকই যথার্থ আয়ুর্বেদ-সেবীর অনুসরণীয়।

কবিরাজ শ্রীযমলাকুমার বসুমল্লার
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

কার্যালয় :
৫১, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
ভবানীপুর-২৬

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ১৩৬৮

বারভাঙ্গা হলে উদ্বোধন

রবিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৬৮ (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারভাঙ্গা হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লিখিত ঔষধ ও ওষধির অনুসন্ধান এবং গুণাগুণ গবেষণার মাধ্যমে পুনরায় নির্ধারণ করিতে কবিরাজগণকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, কেবল অধুনা বিলুপ্ত ভেষজই নহে, বিদেশাগত পাশ্চাত্যঔষধেরও সম্যক্ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যে সকল ঔষধ আবিষ্কার হইয়াছে, কবিরাজী ঔষধ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এই চিন্তা কেহ যেন করেন না। ভারতের এই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পাশ্চাত্যের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রে যে সব ভেষজের উল্লেখ রহিয়াছে তাহার বর্তমান নাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে অধুনা-লুপ্ত ভেষজের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ভারতে এমন অনেক গাছ আমদানী হইয়াছে যাহা পূর্বে ছিল না। গাঁদা ফুল (Marigold) বিদেশীয় আমদানী বলিয়া এক সময়ে পূজায় লাগিত না। এই সকল ভেষজেরও গবেষণা প্রয়োজন। নবীন চিকিৎসকগণ যাহাতে সংস্কৃত জ্ঞান অর্জন করিয়া আয়ুর্বেদের মূল গ্রন্থ পাঠে লাভবান হইতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেও তিনি অনুরোধ জানান।

* প্রারম্ভেই স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় অনুরোধ করেন যে, সকলের সক্রিয় সহানুভূতি ও কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা আয়ুর্বেদ তাহার হৃত গৌরব ফিরাইয়া পাইবে। সকলের মনে নব জাগরণ আনা দরকার যাহাতে আয়ুর্বেদের নানা অঙ্গ সম্বন্ধে শাস্ত্র সংকলন, বিচার ও অনুশীলনের দ্বারা নূতন করিয়া আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইতে পারে।

মূল সভাপতি কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ গুপ্ত তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সাধারণের সাহায্যেই বরাবর চলিয়াছে। এখনও তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য কবিরাজদের চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে জনসাধারণে সহজে কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতে পারেন তাহার জন্য বিনা অনুপানে ঔষধ প্রয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি আরও বলেন যে, আয়ুর্বেদের সহিত ডাক্তারীর সংমিশ্রণে আয়ুর্বেদ নিশ্চিহ্ন হইবে। সুতরাং সরকারী এই নীতির বিরোধিতা করা উচিত। স্বাধীনতার পর স্বদেশী সরকারের আয়ুর্বেদের প্রতি ভাবগতিক দেখিয়া পরিতাপের বিষয়। যাহাতে এই নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং কবিরাজগণ শুধু চিকিৎসা ব্যবসায় নয়, আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের জন্যও চিন্তা ও কর্তব্য সাধন করেন তাহার জন্য অনুরোধ করেন। আয়ুর্বেদ বিল কার্যকরী করিবার জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান।

* অতঃপর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ।

কবিরাজ শ্রীবেদাচার্য মল্লিক বলেন যে, বর্তমানে স্বাধীন সরকার আয়ুর্বেদের সর্বতোভাবে উন্নতি করিতে থাকে ও বাচক, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ বিল এখনও কার্যকরী করা হইল না, ইহা বড়ই বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আয়ুর্বেদের দরদী এবং দেশের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সমর্থক। আশা করি, অবিলম্বে বিল কার্যে পরিণত হইয়া বাংলাদেশের বহুদিনের অভাব মোচন হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির আয়ুর্বেদের জন্য অন্যান্য পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হউক। কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ পরিষদের নানা কার্যসম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করেন ও আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য অনুষ্ঠান সাগ্রহে করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। পরিষদের চেষ্টার সহিত কবিরাজ ও জনসাধারণের প্রচেষ্টা সম্মিলিত হইলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন বলেন যে, পরিষদ আয়ুর্বেদের বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, ইহা খুব প্রশংসার কথা। অন্যেরাও যদি এই কাজে সহযোগিতা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র শর্মা বলেন যে, অন্যান্য রাজ্যে আয়ুর্বেদের জন্য সরকার কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রদেশে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মর্মাহত হইতেছি। আশা করি, শীঘ্রই সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে। শ্রীনিবপদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ৩০ বৎসর কাল পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির সাধনায় কবিরাজগণ যোগদান করিয়া আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করুন তবেই জনসাধারণের মধ্যে ইহার সুফল ফলিবে। শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র বলেন যে, বহু প্রাচীন আয়ুর্বেদের পরাজয় হইতে পারে না—বৈদিক ঋষির বাণী ব্যর্থ হইতে পারে না।

সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন—

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের অন্যতম এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, যেহেতু কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রী ডি, পি, কাইমাবকার মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতে কেবলমাত্র একটী প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও সুপ্রতিষ্ঠা ভারত সরকার সমর্থন করেন এবং অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে পাশাপাশিভাবে সমমর্যাদা ও সহকারী সরকারের সমসুযোগ দান করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করাকে সরকার নীতিগতভাবে সমর্থন করেন না এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নিজস্ব সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রোগনির্ণয় ও ঔষধপ্রয়োগ ঔষধ ব্যবস্থায় যে প্রণালী যুগ যুগান্তর ধরিয়া সত্য ও সুফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আসিয়াছে সেই সত্যকে ভারত সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ অস্বীকার করাতে সমবেত আয়ুর্বেদানুরাগী বিশিষ্ট জ্ঞানী, গুণীবৃন্দ এবং পশ্চিমবঙ্গের কবিরাজবৃন্দ বিশেষ ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই অনুরোধ করিতেছেন যে ভারতের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য এই প্রস্তাব নীতি বর্জন করা হউক এবং সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া আয়ুর্বেদকে আত্মসাৎ করিবার দুরভিসন্ধিও অবলুপ্ত হউক। আজ স্বাধীন সরকারের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের পুনরুত্থানের দায়িত্ব বর্তাইয়াছে, তাই তাহার অবদৃষ্টি দেশের অমঙ্গলই সূচনা করে। ভারতের জনসাধারণের মুখে এই পরাজয়ের ভার নিশ্চিতই নিন্দনীয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল

এবং উহার প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অবশেষে সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপনের পর সভা শুরু হয়।

আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনের প্রস্তাবক্রমে ও কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন ও কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জির সমর্থনে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষগুপ্ত উদ্বোধক ও কবিরাজ শ্রীসুধীরনাথ রায় সভাপতি নির্বাচিত হইলেন বিগত ২৮শে পৌষ, ১৩৬২, শনিবার (১৩ই জানুয়ারী, ১৩৬২) কলিকাতা কর্পোরেশনের মিউনিসিপাল মিউজিয়ামে পরিষদের দ্বিতীয়বর্ষ বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষ্যে আয়োজিত আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায়। ডঃ শ্রীহেমেন্দ্র নাথ ঘোষ গুপ্ত বলেন যে, আয়ুর্বেদ ভারতের চিরন্তন চিকিৎসা বিজ্ঞান। ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত গাছগাছড়া, ধাতু, জনবাস্থ্যের চার্ট, যন্ত্রপাতি, পুটপাকবিধি, পারিবারিক চিকিৎসা, মুষ্টিযোগ, দ্রব্যগুণের চার্ট, আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ও পুঁথি, শুষ্ক দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রদর্শনী ও আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন। দেশের জলবায়ু ও জনস্বাস্থ্যের সহিত আয়ুর্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উহার পুনরুজ্জীবনের পথে পরিষদের উদ্যোগ অগ্রদূত হইবে, এই আশা তিনি পোষণ করেন।

পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়বাহাদুর, সরস্বতী ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন যে, প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের চাক্ষুষ জ্ঞান সম্ভব হয়। অন্যদিকে অন্বেষকদের পক্ষে নূতন সৃষ্টি খুলিয়া যায়, যেন না, পুরাতন ঘষা দিয়া নূতনের সন্ধান মেলে। পরিষদের নানা কর্ম-পদ্ধতির সহিত তাহার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিকে শাস্ত্রীয় তথ্যের সন্ধান ও প্রয়োগ, অন্যদিকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নূতন সন্ধানে আবিষ্কার। দিকে দিকে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদের গভীরতর প্রত্যক্ষীভূত করিবার বৃহৎ আয়োজনের ভার কবিরাজদের নিতে হইবে। বাস্তবিক অধিবেশনের সহিত বিজ্ঞানের প্রদর্শনী কবিরাজ ও অকবিরাজ সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। সেইরূপ আয়োজন করিতে বিবিধ সম্ভার সংগ্রহের ভার আয়ুর্বেদসেবীদের উপর। ইহা আকারে বৃহৎ না হইলেও মূল্যের বীজ উহাতে নিহিত আছে।

ডঃ ঘোষগুপ্তের উদ্বোধনে আমাদের আয়োজন সার্থক হইয়াছে। আশাকরি, তাঁহার সহানুভূতি আমাদের অধিবেশনের সাফল্য এবং আয়ুর্বেদের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত করিবে।

সভাপতি কবিরাজ শ্রীসুধীরনাথ রায় পরিষদ ও প্রদর্শনীর শুভ কামনা করেন।

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন বর্তমান আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অবস্থা, প্রদর্শনী ও কবিরাজদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন শাস্ত্রী প্রাচীনকালের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উৎকর্ষ, বর্তমানের প্রয়োজনীয়তা, প্রদর্শনী আয়োজনের গুরুত্ব ও জনস্বাস্থ্যের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র, কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ সেনও প্রদর্শনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করেন। অবশেষে কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপনপূর্বক প্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্যাদি উপস্থাপিত হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণ করেন।

বিভাগীয় সভাগুলি ও জনপ্রিয় বক্তৃতামালা

বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ১লা মাঘ হইতে ৮ই মাঘ, ১৩৬৮ (১৭ই জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬২) প্রতিদিন বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বিভাগীয় সভাগুলি এবং বেলা ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত প্রতিদিন জনপ্রিয় বক্তৃতামালা কলেজ কোয়ার্টস্থিত ইডেন্‌টস্ হলে অনুষ্ঠিত হয়।

কায়চিকিৎসা, বালা-বালরোগ, জ্বর-কৃমিঘ্ন-রোগ, স্ত্রী-বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি, যকৃৎ-প্লীহারোগ, পথ্যবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান শাখাগুলিতে যথাক্রমে পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ শর্মা, কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর সান্যাল (অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীবিজয়-কালী ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতিতে), কবিরাজ শ্রীঅমরা প্রসাদ শাস্ত্রী (কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন ভাষ্য-তীর্থের অনুপস্থিতিতে), অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ গুপ্ত এম, এ, কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার (কবি-রাজ শ্রীশিবকণ্ঠ গুপ্ত মজুমদারের অনুপস্থিতিতে), কবিরাজ শ্রীমঙ্গলাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি এম, এ, আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী এম, এ, সভাপতিত্ব করেন। ইঁহাদের অভিভাষণ 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'তে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

শাখাসভাগুলিতে কবিরাজ শ্রীউমাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেন, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি, কবিরাজ শ্রীঅমরা প্রসাদ লাহিড়ী শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর সান্যাল, কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন, কবিরাজ শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পি, এন, চৌবে, কবিরাজ শ্রীরবীন্দ্র নাথ রায়, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা প্রভৃতির মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধ পাঠ, কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রবন্ধ ও আলোচনা আয়ুর্বেদ-ভারতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রতিষেধক শক্তি ও পথ্যের শারীরবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনার সূচনা করেন কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার। ত্রিদোষতত্ত্ব, আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা সমরাভাবে হয় নাই। রসবিজ্ঞানের প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীঅমরা প্রসাদ শাস্ত্রী পারদ ও অন্যান্য ধাতু এবং ষড়্‌রসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। ধাতুগুলির প্রয়োগ ও ছয় প্রকার রসের গুণাগুণ সম্বন্ধে সংস্কৃতে বক্তৃতা দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় খুব চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল।

'স্নান', 'বৃষ্টি যোগ', পথ্যকৃত ও দেশী ও বিদেশী পথ্য সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতাগুলি যথাক্রমে কবিরাজ শ্রীউমাচরণ সেন, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী ও কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতাগুলির সারাংশ 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'তে প্রকাশিত হইবে।

চতুর্থ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

পরিষদের ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিগত ৭ই মাঘ, ১৩৬৮ (২১শে জানুয়ারী, ১৯৬২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে চতুর্থ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুমার মজুমদারের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। কবিরাজ শ্রীমজুমদার তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আয়ুর্বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ—ইহা কেবলমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান নহে, ইহাতে দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়নী বিদ্যা প্রভৃতিও নিহিত আছে। অতীতে বিদেশী আক্রমণে বিধ্বস্ত হইলেও ভারতের মূল সত্তা নষ্ট একেবারে হয় নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতি হইয়াছে। যে উন্নতির মূল সম্মুখে প্রতিভাত তাহা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির নবা বিকৃত রূপায়নে যুগের নিদর্শন বহন করিবে। পরানুকৃতি নহে—পরের ভাবৈশ্বর্য, চিত্রকলা, সাহিত্য প্রভৃতির সংস্পর্শে মৌলিক চিন্তার উন্মেষে ভারতীয় মনীষার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী করিবার প্রেরণা লাভ করা। সৃষ্টির বিচিত্র অভিযান চারিদিকে বিচ্ছুরিত-প্রাণ ও গ্রহণের মধ্য দিয়া যে বিশিষ্ট প্রকাশ চিত্তক্ষেত্রে মূলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে উহা ভারতেরই জলবায়ুতে সম্ভব। সুতরাং ভারতের সমাজ, ভারতের ধর্ম, ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান তাহার নিজের পথে প্রবাহিত—রূপ ও অরূপের সংমিশ্রণে বিস্ময়কর সৃষ্টির উপকরণ নিত্য বিদ্যমান। ইহা মরিবার নহে—পরিবর্তিত হইবে বিচিত্ররূপে। বিশ্ব সংস্কৃতিতে ভারতের অবদান চিরস্মরণীয়—উহা অবিসংবাদ্য।

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী বলেন যে, মহাভারতে আছে—গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ যত দিন আছে, ততদিন ভারত একতাবদ্ধ থাকিবে। ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত সংস্কৃত ভাষায় লেখা, অতএব সংস্কৃতই ভারতের ইতিকথা বলিবার অধিকার রাখে। তিনি মহাভারতের বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ ভারতের দর্শন, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন। মোক্ষমূলার, নিসার, উইন্টারনিজ ভারতের অন্যতম। বিদেশাগত ছাত্রগণ ভারতীয় পণ্ডিতের নিকট তত্ত্বশাস্ত্র পাঠ করেন। আয়ুর্বেদের চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যান্য চিকিৎসাপ্রণালীর মাতাস্বরূপ, বিশেষত পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের। স্বাধীনতার জয়যাত্রার মুখরিত ভারতীয় সংস্কৃতি ও আয়ুর্বেদের বিস্ময়কর পুনরুজ্জীবন হোক্, ইহাই কামা।

অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী বলেন যে, আয়ুর্বেদের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। আয়ুর্বেদের ভাষা ও ঔষধের নামগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে কত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন আয়ুর্বেদাচার্যগণ! আয়ুর্বেদের রস সাহিত্যের রসের মত না হইলেও দুইটার গুণগত সামঞ্জস্য আছে—একটি দেহের, অন্যটী সাহিত্যের পুষ্টিসাধক। এই সংস্কৃতি সম্মেলনের গুরুত্ব আছে। ভারতের বৈশিষ্ট্য তাহার সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ এবং আয়ুর্বেদ তাহাতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা ও আলোচনা সকলের অনুধাবন করিয়া দেখা দরকার। আধুনিক বলিলেই একটা নবীন আবিষ্কার বলিয়া মনে হওয়া উচিত নয়। প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে অতি আধুনিকতার বিষয়গুলির

বিবরণ আছে। আয়ুর্বেদের নীতি, বিজ্ঞান ও ঔষধের বৈশিষ্ট্য লোককল্যাণে কল্পতরু বলিয়াই উহা বাঁচিয়া আছে। উহার উৎকর্ষের জন্য সকলের অক্লান্ত চেষ্টা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন বলেন যে, চরকে প্রাণ, ধন ও পরলোকের প্রার্থনার কথা আছে। আয়ুর্বেদে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে। পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রাচীনকালেও ছিল, এখনও আছে।

অধ্যাপক শ্রীত্রিবেণীপ্রসাদ নাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত বক্তৃতায় ও বাংলায় একটি পত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য, আয়ুর্বেদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি বলেন যে, বিদেশী শাসনে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক ক্ষতিসাধন হইয়াছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এখন ভারতের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিলে উহার বিলুপ্তি অনিবার্য।

কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতিসম্বন্ধে বলিতে গিয়া আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরস্পর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

কবি শ্রীজগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায় প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় চিকিৎসার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কথা বিশদভাবে বলেন।

দার্শনিক কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র ভারতীয় দর্শন ও আয়ুর্বেদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধিকন্তু, তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন ও ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কর্তৃপক্ষগণকে বার্ষিক অধিবেশনের জন্য স্থান দান করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বার্ষিক অধিবেশনের মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিগণ, প্রবন্ধ লেখক ও বক্তৃগণ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উদ্যোক্তাগণকেও তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কায়চিকিৎসা বিভাগ

আয়ুর্বেদ কি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্মী বৈদ্যশাস্ত্রী

স্বস্যোপযোগিবিজ্ঞানৌ সুখদুঃখোদয়ৌ যথা।
তথাবেদয়তো বন্দে পার্ব্বতীপাদপঙ্কজৌ।

মনুষ্যদিগের জীবিত কালের নাম আয়ু। অনুকূলরূপে দীর্ঘ ও সুখকর আয়ু লাভের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। ঋষি চরক বলিয়াছেন, "মনুষ্যের আয়ু চারি প্রকার হইয়া থাকে,—যথা হিত আয়ু ও অহিত আয়ু, সুখ আয়ু ও দুঃখ আয়ু। যে আয়ু জগতের হিতকর কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হয় তাহা হিত আয়ু, তাহার বিপরীত অহিত আয়ু। যে আয়ু সুখের সহিত ভোগ হয় তাহাকে সুখ আয়ু বলে, তাহার বিপরীত দুঃখ আয়ু। মানুষ যাহাতে হিত আয়ু ও সুখ আয়ু

লাভ করিতে পারে, তাহারই উপায় নির্ধারণার্থ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে।"

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন যে "আয়ুর্বেদের প্রয়োজন দুই প্রকার, সুস্থ লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং রোগ হইলে তাহার প্রতিকার"। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চিকিৎসাও দুই প্রকার বলা হইয়াছে—দৈবজ ব্যপাশ্রয় ও সত্ত্বসাত্ম্য। ইহা হইতেই আয়ুর্বেদের দুই সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে। কায় চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physicians) এবং শল্যচিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Surgeons)। কিন্তু কেবল সুস্থ শরীর ও দীর্ঘ আয়ু লইয়াই মানুষ সুখী হইতে পারে না। ধর্ম, অর্থ, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত মানুষের সুখ দুঃখের সম্বন্ধ। সেই জন্য ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজ নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান উপদেশ আয়ুর্বেদে নিহিত আছে। পক্ষান্তরে কেবল মনুষ্য জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা আয়ুর্বেদের আলোচ্য নহে, তাবতীয় উদ্ভিদ প্রাণী এবং স্থাবর জীব পদার্থাদির উপরেও আয়ুর্বেদকারগণের কল্পনা বর্ষিত হইয়াছিল। সেই জন্য অশ্বায়ুর্বেদ, গবায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ প্রভৃতি আয়ুর্বেদের উপাঙ্গসমূহ সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে "শালিহোত্র সংহিতা" ও "পালকাপ্য" সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাবলী এখনও বর্তমান।

প্রাচীন কাল হইতেই আয়ুর্বেদীয় পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঙ্গেরই চিকিৎসা ব্যবস্থা পৃথগ্‌ভাবে সমুন্নত হইয়া "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ রাষ্ট্রবিপ্লবের দারুণ বিপর্যয় হেতু বহু মূল্যবান আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদির লোপ হওয়ায় এবং বিদেশী শাসকগণের প্রভাব হেতু ইউনানি (ইউনানি) চিকিৎসা রাজকীয় চিকিৎসা রূপে গণ্য হওয়ার ফলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আর তেমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই বটে কিন্তু তখনও বাংলার মনীষাসম্পন্ন প্রাজ্ঞ কবিরাজকুল বিদেশের তালে, "কায় চিকিৎসা" ক্ষেত্রে অসাধারণ চিকিৎসা নৈপুণ্য প্রদর্শনে বাংলা তথা ইহার বাহিরও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায় পর্যন্তও সগৌরবে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমুন্নত রাখিয়া আয়ুর্বেদের মাহাত্ম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পুনরায় সমগ্র ভারত ইংরেজ শাসনে শিষ্ট হইলে দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবাসী বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে এবং বাংলার সমুন্নত আয়ুর্বেদ-ধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে "রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা"রূপে পরিগণিতকরত অন্যায়ভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের ঐতিহ্যে মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। যাহার ফলে আয়ুর্বেদের আর তেমন উন্নতি করা সম্ভব হয় নাই। এতৎসত্ত্বেও বাংলার প্রবীণ কবিরাজগণ তীব্র সাধনা ও প্রচেষ্টায় আয়ুর্বেদের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, শারীর বিদ্যা না শিখিয়া চিকিৎসা করা চলিবে না। এই শারীর বিদ্যা যে কেবল শল্যচিকিৎসকেরই শিখিতে হইত তাহা নহে, কায়চিকিৎসকেরও এই শারীর বিদ্যা অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। সেই জন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন যে "শারীরং সর্বথা সর্বং সর্বথা বেদ যো ভিষক্। আয়ুর্বেদং স কৃৎস্নেন বেদ লোকসুখপ্রদম্"। অর্থাৎ যিনি সমগ্র শারীরবিদ্যা সকল প্রকারে জানিয়াছেন এবং শারীর বিদ্যার সকল কথা যাহার সর্বথা বুদ্ধিগোচর, তিনিই "আয়ুর্বেদে" সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন।

সুশ্রুতও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন : -

"শারীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টাঃ সম্যক্ বিকারাঃ।

দৃষ্টকর্মাণাঃ সম্যগ্ঘোপায়ঃ কর্ম ভিষজাঃ।

অর্থাৎ "শরীর ও শাস্ত্র উভয় মিলাইয়া দেখিয়া শারীর বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিবেন এবং এই উপায়ে নিঃসংশয় জ্ঞানার্জন করিয়া চিকিৎসা করিবেন"।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

"রোগ মাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তর মৌষধম্।

ততঃ কর্ম ভিষক্ পশ্চাজ্জ্ঞানপূর্বং সমাচরেৎ।

যস্তু রোগ মবিজ্ঞায় কর্মাণ্যারভতে ভিষক্।

অপৌরুষেয়বিধানস্য স্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া।

যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্বভৈষজ্যকোবিদঃ।

দেশকালপ্রমাণজ্ঞস্তস্য সিদ্ধমসংশয়ম্।"

—"প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিয়া, পরে ঔষধ পরীক্ষা করিবে, অনন্তর চিকিৎসক জ্ঞানপূর্বক চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন। যে বৈদ্য রোগ না জানিয়া কর্ম আরম্ভ করেন, তিনি ঔষধ প্রয়োগে অভিজ্ঞ হইলেও তাহার সিদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে হয়, অর্থাৎ হইতেও পারে, না ও হইতে পারে।"

"যো হেতো র্নিদে প্রশমনে রোগানোষপুনর্ভবে।

জ্ঞানং চতুর্বিধং যস্য স রাজ্ঞো ভিষগোত্তমঃ।

"রোগের হেতু বিষয়ে জ্ঞান রোগের লক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান, রোগের প্রশমন বিষয়ে জ্ঞান, এবং রোগের অপুনর্ভবে, অর্থাৎ যাহাতে আর রোগ পুনরুদ্ভব না হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান, এই চতুর্বিধ জ্ঞান যাহার আছে তিনিই রাজার ভিষক্।"

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল সূত্র এই—

"আতুরৌর্ধঃ শময়তি নাতুরব্যাধি মৌষধম্।

ন তা ক্রিয়া নতু র্যা ব্যাধি হরত্যাতুরমুদ্ধরেৎ।"

"যাহা প্রযুক্ত ব্যাধির উপশম করে এবং নূতন ব্যাধি সৃষ্টি করে না, তাহা উপযুক্ত চিকিৎসা। যাহা ব্যাধির উপশম করিতে যাইয়া নূতন ব্যাধির সৃষ্টি করে, তাহা সুচিকিৎসা নহে।"

অন্যান্য যেমন ডাক্তারেরা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ এই চারিটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রোগনির্ণয়ের চেষ্টা করেন, প্রাচীনকালেও সেইরূপ রোগ নির্ণয় করা হইত।

মহর্ষি চরক এই ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের কথাই বলিয়াছেন। সুশ্রুত আরও অগ্রসর হইয়া ছিলেন, তাঁহার মতে রসনেন্দ্রিয় ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিলনা।

পরবর্তীকালে রোগ নির্ণয় করিবার একটি বিশেষ কৌশল আয়ুর্বেদে আবিষ্কার হইয়া ছিল, তাহার নাম "নাড়ী বিজ্ঞানতন্ত্র"। সূক্ষ্মদর্শী শরীরতত্ত্বজ্ঞ প্রাজ্ঞ প্রাচীন কবিরাজগণ এই নাড়ী বিজ্ঞানের সাহায্যেই ত্রিদোষতত্ত্বের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া নাড়ীর গতিবেগের সহিত তাবৎ রোগেরই চয়, প্রকোপ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেন। অর্থাৎ শরীরের স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, রোগ, আরোগ্য বা ব্যাধির অথবা মৃত্যুর অরিষ্ট লক্ষণসমূহ সম্যক্ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেন।

শার্ঙ্গধর সংহিতা ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"পুংসোদক্ষিণহস্তস্য স্ত্রিয়োবামকরস্যতু,

অঙ্গুষ্ঠমূলগা নাড়ীঃ

পরীক্ষেত ভিষগ্বরঃ। অঙ্গুলীস্তিস্র স্তিস্রোনাড়ী

মবষ্টভ্য সুসংস্থিতঃ।

অঙ্গুষ্ঠেনা সুখং দুঃখং ভাবীত্যাহ

কুশলোঽখিলম্"। ইত্যাদি

ব্যাধির আশ্রয় ও ত্রিদোষতত্ত্ব –

আয়ুর্বেদবিজ্ঞানে মূলতঃ ত্রিদোষতত্ত্বের উপরই ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। চিকিৎসকগণ ইহা সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে পারিলেই চিকিৎসাবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন আর্যঋষিগণ জগতের উপযোগী করিয়া, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াই আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। শুধু ভারতবর্ষে নহে, ভারতকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা দেশের উপযোগী বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংস্থানে ও বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাবে, বিভিন্ন জাতীয় রোগের উদ্ভব, চয় ও প্রকোপসমূহ, এই ত্রিদোষতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়াই একমাত্র ভারতীয় - আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানীই সমাগ্‌ভাবে ব্যাধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"যস্য যেনাস্য যোজন্তঃ তস্যঃ তস্যৌষধং স্মৃতম্।

একই প্রকার রোগের চিকিৎসা, বিভিন্ন দেশ কাল পাত্রানুসারে বিভিন্ন প্রকৃতিতে রোগনির্ণয় প্রকৃতি এই ত্রিদোষতত্ত্বের সূক্ষ্ম ভিত্তির উপরই সুষ্ঠু ভাবে বিজ্ঞান আছে। রসরক্তমেদোস্থি মজ্জা, শুক্র, ধাতু, ধাতুমল, উপধাতু, ত্বক, ওজঃ, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, মর্ম, শিরা, ধমনী, মাংসপেশী, কণ্ডরা, রন্ধ্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে কোন ব্যাধি দেহকে আক্রান্ত করে, তাহার মূল প্রবাহক বায়ু, পিত্ত ও কফ। এই ত্রিদোষদ্বারা উপরোক্ত ধাতুসমূহ আক্রান্ত হইলে ব্যাধি প্রকাশ পায়। এই বায়ু, পিত্ত, কফই ত্রিদোষ নামে আখ্যাত হয়।

"বায়ুঃ পিত্তং কফো দোষাস্ত্রয়ঃ সোক্তাঃ সমাসতঃ।
তন্নানা পঞ্চধাখ্যাতাঃ প্রত্যেকং স্বেষ্বাশ্রয়ে।
পবনস্তেষু বলবান্ বিভাগকরণাদ্যতঃ।
যতো গুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতোষ্ণস্নিগ্ধরূক্ষলঃ।
শরীরধাতবোঽবাধাঃ ধাতবো দেহধারণাৎ।
ধাতু পিত্ত কফাঃ দোষা মলিনীকরণাদ্যতঃ।
পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্রগচ্ছন্তি মেঘবৎ।"

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি দোষ নামে অভিহিত। বায়ু ও মল নামেও ইহারা অভিহিত হইয়া থাকে। শরীর ধারণের জন্য প্রত্যেক দোষ পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরকে রক্ষা করে। দোষত্রয়ের মধ্যে শারীরকেরণ বিষয়ে বায়ুই বলবান। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বায়ুই তাবৎ রোগের বাহক বলিয়া বায়ুকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। কারণ পিত্ত, কফ, মল ও ধাতুসমূহ পঙ্গু অর্থাৎ স্বয়ং কোন স্থানে কখনও গমন করিতে পারেনা, বায়ু কর্তৃক যেখানে নীত হয় সেইখানেই বেগবৎ বর্ষণ করিয়া থাকে অর্থাৎ ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

"শরীরপ্রাণয়োর্যোগঃ সংযোগাদায়ুরুচ্যতে।
কালেন তদ্বিয়োগাচ্চ পক্ষয়ঃ কথ্যতে বুধঃ।
ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যাং দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
অতো মৃত্যুরবর্ধ্যোঽয়ং কিন্তু রোগান্ নিবারয়েৎ।
আশাস্যঃ যাতি সাধ্যত্বং যাপ্যো যত্নাদ্যথাতথম্।—
জীবিতং হন্ত্যসাধ্যত্বং নরস্তাপ্রতিকারিণঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ।
অতঃ জন্তুস্তদ্ভুঃ যত্নেন কর্মবিক্ষপাবিৎ।
যাবৎ তদ্বলা রোগা নাশয়ন্ত্যসমাত্মনম্।
সমাঃ সুখায় বিজ্ঞেয়াঃ বলায়োপচয়াদ্যতঃ।"

শরীর ও প্রাণবায়ুর এইরূপ যোগকে আয়ু কহে। কালে উহাদের বিয়োগ ঘটিলে তাহাকে পক্ষয় কহে। পৃথিবীতে কখনও কোন প্রাণী অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, অতএব মৃত্যু অবধার্য। কিন্তু মৃত্যু অবধার্য হইলেও রোগের নিবারণ করা কর্তব্য। কারণ, রোগের প্রতিকার না করিলে সাধ্য রোগ অসাধ্য এবং যাপ্য রোগ অসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, শেষে প্রাণ নাশ করে। শরীরই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধন, অতএব শুভাশুভ কর্মফলদর্শী ব্যক্তি শরীরকে অবশ্য রক্ষা করিবে। বায়ু, ধাতুমল এবং দোষ উহারা অসম হইলে শরীরকে নাশ করে, সমতা হইলে সুখ, বল ও পুষ্টি সাধন করে। অতএব

বায়ু, বায়ুজন্য এবং দোষ ইহাদের সমতাই চিকিৎসা অর্থাৎ বাতাদি দোষের ও রসরক্তাদি দূষ্যের সমতাই আরোগ্য এবং ইহাদের যে বৈষম্য তাহাই রোগ। অতএব রোগ শান্তি করিতে হইলে যাহাতে দোষ ও দূষ্যের সমতা হয় তাহারই উপায় করা কর্তব্য। অর্থাৎ যেখানে দোষ দূষ্যাদির কোন পদার্থের হ্রাস হইয়াছে তথায় তং সমানধর্মি দ্রব্যসংযোগে তাহার বৃদ্ধি করা এবং যেখানে তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার হ্রাস করাই চিকিৎসা। সেই চিকিৎসাই আয়ুর্বেদের বক্তব্য বিষয়।

রোগের নিদান ও ব্যবহারবিধি

মানব দেহকে অবলম্বন করিয়া যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হউক না কেন, তাহার "মূল সূত্র" অতি সংক্ষেপে বীজাকারে বর্ণনাতীত প্রতিভাসম্পন্ন মানবকুল শিরোমণি মহর্ষি বাগ্ভট্ট সুপ্রসিদ্ধ নিদানস্থানে পঞ্চনিদানের ভূমিকায় শৃঙ্খলিত করিয়া সুনিপুণভাবে গ্রথিত করিয়াছেন এবং যাহার বিশদ ব্যাখ্যা "মধুকোষ" টীকায় বৈদ্যাচার্য শ্রীমল্লিকরক্ষিত মহোদয় অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অষ্টপ্রধিমান-সহকারে রোগবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব অনুশীলন করিলে কোন চিকিৎসককেই রোগ নির্ণয় করিতে বিমোহিত হইতে হয় না। চিকিৎসা জগতে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে এমন সুষ্ঠু প্রণালী অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। তদ্ যথা—

"নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা
সম্প্রাপ্তি শ্চেতি বিজ্ঞানং রোগানাং পঞ্চধা স্মৃতম্।"

রোগ নির্ণয় করিবার প্রধান উপায়, নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি। যেমন সূক্ষ্ম বীজ ভূমিকে অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উদ্ভব ঘটায়, ঠিক তেমনি মানবদেহকে অবলম্বন করিয়া যে কোন রোগ বীজাণু যে কোন ব্যাধির উদ্ভব করিলে, সেই ব্যাধি নির্ণয় করিতে হইলে এই পঞ্চ নিদানই একমাত্র অবলম্বনীয়। কারণ, এই সূত্র "পঞ্চ নিদান-তত্ত্ব" যাবতীয় রোগ নির্ণয়ের মূলসূত্র।

রোগের বিকাশ—

নিজ, আগন্তু ও মানস ভেদে রোগ তিন প্রকার—

শরীরস্থ বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়-জনিত রোগের নাম "নিজ" অর্থাৎ দোষজ।

যে রোগ ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও অভিঘাতাদি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আগন্তুজ।

আর অভীষ্ট পদার্থের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তিবশত যে রোগ জন্মে, তাহাকে "মানস" রোগ বলে।

এই ত্রিবিধ ব্যাধির মধ্যে মানস ব্যাধির উপশম-জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিতর্কিত বিবেচনাপূর্বক লোভ, মোহ ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক অহিতজনক ধর্মার্থ-কামের অনুপসেবা এবং হিতকর ধর্মার্থকামের উপাসনা করিবেন। চক্ষুঃ নাসা, মর্ম, অস্থি সন্ধি এবং কোষ্ঠ এই চারিপ্রকার শরীর—আবয়বকে রোগের স্থান কহে।

রোগমার্গও ত্রিবিধ—(১) বাহ্য রোগমার্গ, (২) মধ্যম রোগমার্গ, (৩) আভ্যন্তর রোগমার্গ। এই ত্রিবিধ রোগমার্গকে অবলম্বন করিয়া এই দেহে যাবতীয় ব্যাধি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শারীরিক রোগপ্রকোপে কেবল শরীরকে অবলম্বন করিয়া তিন প্রকার ঔষধ উপদিষ্ট হইয়াছে,

যথা,—মলপরিমার্জন, বহিঃপরিমার্জন ও শস্ত্রপ্রণিধান।

তন্মধ্যে যে সমস্ত ঔষধ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আহারজাত ব্যাধিসমূহ বিনষ্ট করে, তাহাকে অন্তঃ-পরিমার্জন কহে।

যে সমস্ত ঔষধ বাহিরের ত্বকের উপর অভ্যঙ্গ, সেক, প্রলেপ, পরিষেক ও ঊর্দ্বনাদিরূপে প্রযুক্ত

হইয়া ব্যাধি নিবারণ করে তাহাকে বহিঃপরিমার্জন কহে, আর শস্ত্রবিশেষদ্বারা ছেদন, ভেদন, বেধন, বিস্রাবণ, লেখন, উৎপাটন, প্রচ্ছন সীবন ও এষণ কার্য এবং ক্ষার ও জলৌকা প্রয়োগকে শস্ত্রপ্রণিধান বলে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ঋষিগণ মানব দেহে যত প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াই অতি সূক্ষ্মভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

"একদোষই বিশেষ বিশেষ কারণে কুপিত হইয়া বিশেষ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে" (চরক); অতএব রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠানসমূহ ও নিদান বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করার ব্যবস্থা আয়ুর্বেদশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের এবম্বিধ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়াই আয়ুর্বেদের মৌলিক সত্তার কোন প্রকার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

কায় চিকিৎসাতন্ত্র ও পঞ্চকর্মবিধি

প্রাচীনকালে শরীরকে সুস্থ ও ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আয়ুর্বেদে যথাবিহিত বমন, বিরেচন ও আস্থাপন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং বিশেষ বিশেষ জটিল রোগসমূহে পঞ্চকর্মানুযায়ী যে কোন বিধি বিধান অবলম্বন করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ নিরসন হইত।

পঞ্চকর্ম, যথা —

"প্রথমং বমনং পশ্চাদ্বিরেকানুবাসনম্।
এতানি পঞ্চকর্মাণি নিত্যং মাধবং যথা॥

ভাবপ্রকাশ।

বর্তমানে শল্যচিকিৎসা ও পূর্ণাঙ্গ পঞ্চকর্মবিধি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ কারণে এখনও কোন কোন চিকিৎসক আংশিকভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বমন, বিরেচন ও নিরুহবস্তি অনুবস্তি (চুল) ব্যবহার করিয়া থাকেন। একটী প্রবাদ বাক্য আছে যে "চালনেই সর্বব্যাধি মলতাকে ন চালয়েৎ।" এই প্রবাদ বাক্যের তেমন কোন সার্থকতা নাই, কারণ শরীরকে শোধন না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশু কোন ক্রিয়া হয় না।

পরন্তু বিরেচন, বস্তি ও বমন চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। যে যে রোগে যেরূপ বমন বিরেচন, বস্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা বিশেষপূর্বক রোগীর প্রতি ব্যবহার করিলে আশু ফল লাভ হয়। যেমন নবজ্বরে বমন ব্যবস্থা আছে; মল শুদ্ধি থাকিলে আপনা হইতেই রোগনিবৃত্তি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, "সোজাসে যাওয়া" প্রয়োগে অনেক বিকৃত নবজ্বর লঘু আকার হয়। একস্থলে আছে যে "জ্বরান্তে বিরেচন দিতে হয়," আর একস্থলে আছে যে আরগ্বধাদি পাচন আমনাশক ও বিরেচনাশক কিন্তু উহা যে কেবল জ্বরান্তেই দেওয়া হয় তাহা নহে, উহা জ্বরবেগেও দেওয়া যায়। অর্থাৎ আমজ্বরেও প্রয়োগ করা যায়। আর একস্থলে আছে যে, "নবজ্বরে সপ্তাহের পর ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় কিন্তু বমন ও ষড়ঙ্গ পানীয় নামক ঔষধ, জ্বরের প্রথম দিন হইতেই দেওয়া যায়। আর "বিল্ব" জ্বরের পূর্বরূপেও প্রয়োগ করা যায়, তাহাতে জ্বর নিবৃত্তি না হইলে পাচন প্রয়োগ করা যায়। অন্ত্রগ্রন্থীর কোষ্ঠ শুদ্ধি না থাকিলে ২।৩ দিন অন্তর অন্তর আরগ্বধাদির মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করা উচিৎ।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ২।৩ দিন অন্তর অন্তর লঘুমূল পাচনের সহিত অল্প পরিমাণ এরণ্ড তৈল প্রয়োগে উপকার হয়।

নবজ্বরের প্রথম ২।৩ দিন বলবান রোগীকে বমন দিয়ে

বিশেষ উপকার হয়। নবর ১ তোলা বা ২ তোলা গরম জলের সহিত মিশাইয়া খাইলে বমন হইয়া যায়।

বিরেচন—

যত প্রকার বিরেচন আছে "এরণ্ড তৈল" তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরেচন। ইহা বিভিন্ন রোগে তত্তৎ ব্যাধি উপযোগী কোনও একটী পাচন বা দুধের সঙ্গে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা বাতরক্তনাশক এবং রক্তাতিসারে, কোষ্ঠবদ্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা কফমূলের সহিত ব্যবহারে বাতশ্লেষ্মানাশক হয়, সুতরাং সান্নিপাতিক জ্বর, যাদ, শোথ প্রভৃতিতেও উপকারী হইয়া থাকে। ইহা একশিরা প্রভৃতি বৃদ্ধি রোগেও ব্যবহার্য, অতএব কবিরাজদের বিরেচন কার্যের প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে এরণ্ড তৈল প্রয়োগ করাই উচিত।

বস্তি ক্রিয়া—বস্তি ক্রিয়াও প্রত্যক্ষ লোপ হইয়াছে, কিন্তু নিরূহ বস্তির অনুকল্প "ডুস" যন্ত্র আবিষ্কারের পর অবস্থানুসারে বিভিন্ন কষায় দ্রব্য আর, লবণ প্রভৃতি সহযোগে অন্ত্র ও অবাক্ প্রভৃতিতে বস্তি প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় আশাতীত আশু ফল লাভ হইতে দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ বায়ুজনিত আন্ত্রিক জটিল রোগে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া বস্তি (ডুস) প্রয়োগে আশ্চর্যভাবে নিরাময় হইতে দেখিয়াছি।

আমরা যদি সাধারণভাবে অতি প্রাচীন-সময়কারে লিখিত "আত্রেয় নিদান" গ্রন্থখানাও পঠন পাঠন করি, তবুও কায়চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রায় তাবৎ রোগেরই চিকিৎসা উপলব্ধি করিতে পারি। অনেক সময়, গ্রীষ্মাধিক্যে ঔষধ প্রয়োগের বেশী ব্যবস্থা নাই, কিন্তু পিত্তশ্লৈষ্মিক শ্লীপদরোগ বলিয়া পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর রোগের পাচনসমূহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আবার, রোগের অবস্থা সমাক আলোচনা করিয়া অন্যান্য পিত্তশ্লেষ্মানাশক যোগও প্রয়োগ করা যাইতে পারে (সুশ্রুত), সাধারণের আমাশয় ঠাণ্ডা হইলেও আয়ুর্বেদের মতে গরম, অতএব উহা বাতশ্লৈষ্মিক রোগের কষায় নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা চলে। বস্তিক্রিয়ার প্রচলিত মতে গরম জল হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাধারণত বায়ুরোগ ঠাণ্ডা হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব বস্তিক্রিয়ায় অম্লবিপাক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাল রোগে প্রচলিত মতে ঠাণ্ডাজোলাপ, কিন্তু নৈশিক কাল গরমজোলাপ, অতএব উহাতে নিত্য অবগাহন প্রশস্ত। এই প্রকার যন্ত্রারোগে জ্বর ও কাল থাকিলেও নিত্য স্নানাদি সেবন, তৈলাভ্যঙ্গ ও স্নান আবশ্যক হয়। এমন কি, নবজ্বরে প্রবল উত্তাপ থাকিলে অবগাহন বিধির ব্যবস্থা আছে।

আর্য যুগের পর মধ্যযুগে রসাচার্যদের আবির্ভাব হইবার ফলে আয়ুর্বেদীয় কায়চিকিৎসাক্ষেত্রে একটী নবযুগের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যাহার ফলে বিশুদ্ধ চরকের চিকিৎসা প্রণালী ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। রোগ নিরাময়ের আশুকারিত্বে এবং বহুবিধ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে এই "রসপ্রয়োগ" বৈদ্যমাত্রেই শক্তির মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরবিকারে জ্বরাদি রোগে রসায়ন, বাজীকরণ, ঘৃত প্রভৃতি কারকল্প ব্যবস্থায়, চরকের ভেষজতত্ত্বের চিকিৎসা-বিধান সংযোগে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের প্রতিভাসম্পন্ন বৈদ্যাচার্যগণ চিকিৎসাব্যবস্থার সহিত রসচিকিৎসার সন্নিবেশে সংগ্রহগ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমানে আমরা কায়চিকিৎসাক্ষেত্রে এই মিশ্র চিকিৎসা প্রণালী ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।

প্রাচীন আয়ুর্বেদকারদের ভেষজ পরিচয়, দ্রব্য-সমূহের রস, বিপাক, বীর্য, কোষ্ঠ এবং কালভেদে দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার ও প্রয়োগ প্রণালী প্রভৃতি বিষয় আবিষ্কার করিয়া যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও অদ্ভুতপূর্ব। দ্রব্যের বিপাক বিষয়ে

আজিও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তথা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভেষজ বিজ্ঞানের আবশ্যকতা

এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের ভেষজ বিজ্ঞানসম্বন্ধেও কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রাচীন কালের ব্যবহৃত চরকোক্ত বহু রসায়ন-ভেষজের এখন নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। এমন কি, যাহা লক্ষ্য আয়ুঃপ্রদ ও রসায়নিবারক পরম রসায়ন "অষ্টবর্গ", যথা—মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী প্রভৃতির পরিচয় আমরা ভুলিয়াছি—অশ্বগন্ধা, বরাহাক্রান্তী, ব্রহ্মসুবর্চলা, আমিত্যপর্ণী, পলঙ্কা, সোম প্রভৃতি এখন আমাদের অপরিজ্ঞাত। নিশ্চয়ই ইহারা ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পাহাড়ী, বাস্না, ওসর, পাটলা, ব্রাহ্মী, গন্ধনাকুলি প্রভৃতি ভেষজও ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়।

মহামতি চরক বলিয়াছেন "ভবেদ যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে", অর্থাৎ যাহাই আরোগ্যপ্রদ তাহাই উপযুক্ত ঔষধ।

বিগত ৩৪ শত বৎসরের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, তদানীন্তন আয়ুর্বেদাচার্যগণ বিদেশাগত সোনামুখী, বেটচিনি, তোপচিনি, সালপা, তামাক, আফিং প্রভৃতি বহু ঔষধই চিকিৎসাক্ষেত্রে গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্রব্যগুণগ্রন্থে যথাযথ গুণ ও ব্যবহারপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমানক্ষেত্রে আমাদের একান্ত কর্তব্য অষ্টবর্গ প্রভৃতি যে সমস্ত ভেষজ বর্তমানে আমাদের অজ্ঞাত, তাহাদের পরিচয় সংগ্রহ করা ও বর্তমান কালোপযোগী আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজসমূহ দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত যে সব "মর্ক" আমাদের বিভাগে বল, বিপাক বীর্য প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া আমরা চিকিৎসার উপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে পারি তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া।

উপসংহারে একটী বিষয় আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়া আমার অভিভাষণ শেষ করিব।

আমাদের শাস্ত্রে আছে বর্তমানকাল "বর্ষসহস্রের যুগ"। রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সর্বস্তরেই যুগধর্ম প্রভাবে সাম্যতা প্রাপ্ত হইয়া সমাজের সভ্যকে বাহুগ্রস্ত করিয়াছে। ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতি আজ বিজাতীয় স্রোতভাবে পরিপুষ্ট ও মোহগ্রস্ত। রাষ্ট্রের যাবতীয় চিন্তাধারাই সাম্যধর্মযুক্ত। বর্তমান স্বাধীন ভারতে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানধারা যে খাতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা অনাবশ্যকরূপে বিজাতীয় ভাবপুষ্ট, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই; তথাপি মুক্তকণ্ঠে ইহা বলিতে বাধ্য—ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, আর্যচিকিৎসা প্রভৃতি ভারতীয় সভায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ভেষজসমূহ—রস, বিপাক, বীর্য, দেশ, কালানুযায়ী করিয়া—যদি ভারতীয় প্রকৃতির সহিত সংযোগ করিয়া গৃহীত হয়, তবেই আর্যবিজ্ঞানের উন্নয়ন সার্থক হইবে। এই প্রচেষ্টা সিদ্ধ করিবার জন্য আয়ুর্বেদ গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, পূর্বাচার্যগণের অবশিষ্ট যে সব গ্রন্থরাজী তাহাদের ভ্রম, প্রমাদ সংশোধন, রসশালাপ্রতিষ্ঠা, ঔষধের মাননির্ণয় ও বিজ্ঞাপনের চাটুকারিতায় যাহাতে ভেজাল ঔষধ বিক্রয় না হয় তাহার নিয়ন্ত্রণ ও উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া ঔষধ নির্মাণের কারখানাগুলির মালিকগণকে উপযুক্ত ঔষধ তৈয়ারের জন্য "ছাড়পত্র" দেওয়া প্রভৃতি করণীয়। আশা করি, সুধী আয়ুর্বেদসেবিগণ এবিষয়সম্পর্কে বিশেষ বিবেচন

করিবেন। প্রবন্ধের ত্রুটি সম্বন্ধে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি, শীঘ্রই দুঃখের নিশি অবসান হইবে। বর্তমানে ভারতের আয়ুর্বেদের নব জাগরণই ইহার সূচনা করিতেছে।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিবার্ষিক অধিবেশনে "কায় চিকিৎসা" বিভাগের সভাপতি পদ হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ হাল্দার বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

অনোবিজ্ঞানে বিভাস

মনের গহনে*

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

সভ্যের সুধীগণ,

বর্তমান যুগকে বলা হয় বিশেষজ্ঞের যুগ। (The age of specialisation). কিন্তু প্রাচীন ভারতে জ্ঞানকে খুব খুঁটে ছত্রিশটার কক্ষে বিভক্ত করা হয় নাই। সেকালে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা হইতেন অনেকবিৎ বা সর্বজ্ঞ। একটি উদ্ভট শ্লোকে 'অনেকবিৎ' কথাটি পাণিনির বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। এখনে কেহ যদি একটিমাত্র বিষয় আয়ত্ত করিতে চাহিতেন, তথাপি তাঁহাকে নানা বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইত। জ্ঞান জিনিষটি যে অখণ্ড ও অবিভাজ্য, এরিষ্টটলের মত গ্রীক পণ্ডিতগণও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাই প্রাচীন ভারতে ও গ্রীসে এমন সব পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহাদের মনীষার বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করিলে আমরা বিস্মিত হই। বাস্তবিক, মহামতি চরক অথবা মনস্বী এরিষ্টটলের ন্যায় বিরাট পুরুষের মনের কথা স্মরণ করিলে আমরা স্তম্ভিত হই। অবশ্য, উনিশ শতকের বাংলাতেও আমরা রাজেন্দ্রসুন্দর বা ব্রজেন্দ্র শীলের ন্যায় এমন কয়েকজন পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাঁহাদের মনীষা ছিল সর্বতোমুখী। কিন্তু অনাগত কালে এই শ্রেণীর পণ্ডিত যে বিলুপ্ত হইবে, সে বিষয় একরূপ সুনিশ্চিত।

চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিদের নির্দেশ এই—যিনি আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধিগত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রথমে অন্যান্য শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে হইবে। আমাদের দেশে তাই চিকিৎসককে বলা হইয়াছে 'কবিরাজ' বা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে 'কবি' কথাটির অর্থ খুবই ব্যাপক। যিনি রসস্রষ্টা তিনি কবি, যিনি সত্যদ্রষ্টা বা ক্রান্তদর্শী তিনি কবি, আবার নানা শাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে যাঁহার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে তিনিও কবি। সুতরাং 'কবিরাজ' কথাটি এক কালে খুবই গৌরবসূচক ছিল। আর এখন?

ভারতীয় আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র সাগরের ন্যায় বিশাল ও অতলস্পর্শ। অন্য দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত এদেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ইহারও মূলে আছে অন্য দেশের সঙ্গে ভারতের সৃষ্টি চিন্তার পার্থক্য। যাঁহারা জানে করেন, এদেশের ঋষিগণ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং মুক্তি বা অপবর্গ বা পারলৌকিক

কল্যাণের উপায়ের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাঁরাও মানুষ। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল পূর্ণতা লাভের আদর্শ, সমন্বয়ের আদর্শ। 'যাহাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাহাই ধর্ম', এই সংজ্ঞা হইতে বোঝা যায় যে, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের মধ্যে, ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে, প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তাই এদেশের শাস্ত্রের নির্দেশ এই —মনস্তত্ত্বের চিকিৎসা করিতে হইবে, যে শুধু একটির সেবা করে, সে অধম। 'ধর্মার্থকামা: সমমেব সেব্যা যো হ্যেক সক্ত: স জনো জঘন্য:।' মহামতি চরকও বলিয়াছেন—প্রথমে প্রাণরক্ষার ইচ্ছা করিবে, তারপর মনোপার্জন করিবে এবং পরলৌকিক মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করিবে। কিন্তু যে উপায় সাধুজনের নিন্দিত, সে উপায়ে কখনও অর্থার্জন করিবে না। (ইহার দ্বারা ব্ল্যাক মার্কেটিং প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইল।) আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরলোক-সম্পর্কে নাস্তিকা-বুদ্ধি বা সংশয় ত্যাগ করিবে। (একালে অনেকের মতে নাস্তিক বা সংশয়বাদীরাই তো বুদ্ধিমান। মহর্ষি চরক কিন্তু ইহাদিগকে বুদ্ধিমান বলেন নাই এবং কেন বলেন নাই, তাহার হেতুও নির্দেশ করিয়াছেন।) দেখা যাইতেছে, মহামতি চরকও ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ কল্পনা করেন নাই, তিনি শ্রেয় ও প্রেয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

চরকের ঋষিগণ দেহ ও মনের ব্যাধিকে দেখিয়াছেন জীবনে পূর্ণতালাভের মহান অন্তরায়রূপে, আর আরোগ্যকে দেখিয়াছেন চতুর্বর্গলাভের প্রধান উপায়রূপে। দেহ বা মন যাহার রুগ্ন, তাহার ধর্ম-চর্যা হয় না, অর্থোপার্জন হয় না, বিষয়ভোগ হয় না, মোক্ষলাভ তো হয়ই না। সুতরাং আয়ু বা চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন বিবিধ,—কোন্ কোন্ বিধি পালন করিলে মানুষ দেহ ও মনের ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার নির্দেশ দেওয়া এবং রোগের নিদান ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা। কিন্তু যে ভিত্তির উপর আয়ুর্বেদের 'আট-মহলা ইমারত' নির্মিত হইয়াছিল, সে ভিত্তির নাম ত্রিদোষতত্ত্ব। এই তত্ত্বের সঙ্গে আর একটি পার্শ্বিক তত্ত্বের যোগ আছে, উহার নাম ত্রিগুণতত্ত্ব। চরকের সিদ্ধান্ত এই যে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মের বিকৃতি হইতে ব্যাধির কারণ আর রজোগুণ ও তমোগুণ মনের বিকৃতির কারণ। এই ত্রিদোষ-তত্ত্ব ও ত্রিগুণ-তত্ত্ব উভয়ই ভারতীয় মনীষার অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—

'মানবমনের প্রতিষ্ঠাশালী আদি গুরুদের চক্ষুই স্বতন্ত্র। তাঁহাদের দৃষ্টি এক প্রকার অন্তর্ভেদিনী আলোকচ্ছটা-এক প্রকার এক্স-রে। পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবসায়ীরা যাহা চক্ষে অঙ্গুলি-দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পান না—সেই সকল বিষয়াদি মহাত্মার অতীব স্বল্প উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাশালী বক্তা-গণের দিব্যচক্ষুতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলিয়াছেন ত্রিগুণতত্ত্ব-সম্পর্কে। কথাগুলি ত্রিদোষতত্ত্বের সম্পর্কেও সত্য। বাস্তবিক, আমাদের দেহ ও মনে চলিয়াছে ত্রিদোষের খেলা। বিশেষত প্রত্যেক মানুষের মনের হাটে বসিয়াছে তিন পাগলের মেলা। একটা পাগল বিগড়াইতে বা ঘুরাইতে চায়, তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করিতে চায়, আর একটা পাগল চঞ্চল, সে ছুটাছুটি হানা-হানি মারামারি করিতে চায়, আর একটা পাগল শান্ত, স্থবির, সে নিজের মনের গহনে ঘুম দিতে চায়। সে বলে, 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে'।

প্রাচীনকালে কোন দেশেই মনস্তত্ত্ব বা মনো-বিজ্ঞানকে দর্শন হইতে পৃথক করা হয় নাই। ভারতীয় মনোবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে

হইলে শুধু বহুদর্শন নয়, বৌদ্ধ দর্শনেরও অনুশীলন করা আবশ্যক। তাহা ছাড়া বিভিন্ন তন্ত্রে, পুরাণে ও উপপুরাণে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা মনস্তত্ত্বের উপর আলোকপাত করে। মনের রোগের প্রকার ভেদ ও চিকিৎসা সম্পর্কে আয়ুর্বেদে যে সমস্ত আলোচনা আছে, একালের মানসিক চিকিৎসকের নিকট তাহার উপেক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য দেশে অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়া উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে মনের রাজ্যে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু একালের জন সংখ্যের ফলে মনের রোগ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, মানসিক রোগের এই প্রসারই একালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা। শুধু পাশ্চাত্য দেশে নয়, ভারতবর্ষেও মানসিক রোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় 'আরোগ্য-নিকেতন' বা চিকিৎসকের সংখ্যা কত নগণ্য। পাশ্চাত্য দেশে শার্কট (Charcot), ফ্রয়েড (Sigmund Freud), ইউঙ (Jung), এ্যাডলার (Adler) প্রভৃতি মনস্বিগণ মনোবিকার-সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। একালে মনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি পদ্ধতির প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রথমত, হিপ্‌নটিজম্ বা সংবেশন। ভারতবর্ষে ইহাকে বলা হইত জাদুবী বিদ্যা। কিন্তু সকল রোগীর উপর ইহা প্রয়োগ করা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহার ফল স্থায়ী হয় না। তাহা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরও বিপদের আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডীয় মন-সমীক্ষণ পদ্ধতি। (Psycho-analytic method) ইহা যেমন ব্যয়-সাপেক্ষ তেমনি সময়-সাপেক্ষ। যে সব রোগী বা রোগিনী এই পদ্ধতিতে ব্যাধিমুক্ত হয়, তাহাদের রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। আবার ইহা সর্বজনীন হওয়ার যোগ্যতাও সকলের থাকে না। তাই ফ্রয়েড, বলিয়াছেন—'This excellent method is practicable for one man only, never for an entire Class.' তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক 'শক' চিকিৎসার সুফল পাওয়া যায়। ইহাও বাহ্যসাধ্য ও আধুনিক চিকিৎসা। নিশ্চিতরূপে এই পদ্ধতির প্রয়োগ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, মারাত্মকও বটে। প্রাচীন ভারতেও যে এক প্রকার 'শক' বা 'অভিঘাত' চিকিৎসা ছিল, চরক-সংহিতায় তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু উহাতে কোন যন্ত্রের আবশ্যকতা নাই। যে সমস্ত উন্মাদ রোগী ক্রুদ্ধ বা ভয়ানক রূপে লিপ্ত হয় তাহাদের চিকিৎসায় সর্পদংশনও ব্যবহার ছিল, কিন্তু সর্পদংশ 'ট্রোমাইড' প্রভৃতির মত প্রাণঘাতী অবসাদক। দুঃখের বিষয়, মনের রোগের যে চিকিৎসা-পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত ছিল, সে সম্পর্কে একালের মনোবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রায়ই অজ্ঞ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা শুধু মনের রোগের নিদান-সম্পর্কেই আলোচনা করেন নাই, বিস্তৃত চিকিৎসা-পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করিয়াছেন।

তবে এবিষয়ে একালের পণ্ডিতদের একটী বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা মানসিক রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্লেষণ-শক্তি ও দূরদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানেই মানসিক ব্যাধির অতিলৌকিক কারণ নির্দেশ করিয়াছেন (যেমন, অসুর, গন্ধর্ব, পিশাচ প্রভৃতি), সেখানে একালের মানুষের মন কিছুটা বিরূপ হইতে পারে। কিন্তু মনোবিকৃতির অতিলৌকিক কারণ-গুলির কথা বাদ দিলেও তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, প্রাচীনেরা এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহাতে একালের মানুষের মন সম্পূর্ণ সায় দেয়, যেমন, মনো-বিকৃতির নানা কারণের মধ্যে তাঁহারা মানসিক

দুঃখ ও বিষ দেবতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা অপরাপর যা Nymphomania-র কথাও বলিয়াছেন। 'অপোমারের' একটি মানসিক চিকিৎসাও আছে। 'অপোমারের যিনি লক্ষ্য, তাহার প্রতি ক্রোধ উৎপাদন করিতে পারিলেই রোগের উপশম হয়', প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়াছেন। অবশ্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহার কোন পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কোন কোন চিকিৎসকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা অসাধ্য বলিয়াছেন, আধুনিক পণ্ডিতেরাও ইহা কাহার স্বীকার করেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে সব প্রকার উন্মাদেরই কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বলা হইয়াছে—বুদ্ধির বিভ্রম, চিত্তের চঞ্চলতা, অধীরতা, পর্যাকুল দৃষ্টি, অসংলগ্ন কথা বলা ও হৃদয়ের শূন্যতা।

ঋষি চরক বলেন, মানসিক বিকারের একটি প্রধান কারণ প্রজ্ঞাপরাধ বা জ্ঞানদুষ্টি (জানিয়া শুনিয়া) পাপাচরণ। সংস্কৃতের ভাষায় ইহাকে বলা হয়, 'জ্ঞানের ঘরে চুরি।' সাধকের মনে শুনিতে পাই,—

'চিত্তের বাহির দুই সমান হেথো নাই,
মানুষ যদি হতে চাও'।

মানসিক ব্যাধি আমাদের আত্মাপরাধ-বৃক্ষেরই ফল, আর অনেক ক্ষেত্রে ইহার মূলে আছে আমাদের অবৈধ বাসনা, আমাদের Original Sin. এইজন্য চরক বলেন,—যাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের অল্পতা, তাহারাই সাধারণতঃ মানসিক বিকৃতির অধীন হয়।

যাহারা বৈশ্যের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার বঞ্চিত কিম্বা বৈশ্যের উপযোগিতা বা অনাসক্তি অথবা স্নেহ-মায়ার অতি-বন্ধনে অতিবিক্ত, তাহারাই অনেক সময়ে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আমাদের ছেলে-মেয়েদের প্রায়ই 'পক্ষকাল অবকরে' হয়। ছেলে-মেয়েদের কেমন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, সে সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশে অনেক গবেষণা হইয়াছে। আমাদের দেশে একটি বচন সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ'।

কিন্তু শুধু তাড়া করিলেই চলিবে না, সকল অবস্থাতেই স্নেহধারায় ছেলেদের মানস-মুকুলকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাই মহাভারতে বলা হইয়াছে—'মাতাপিতা দুর্লভ কিছু, দুর্লভ অসাধ্য কিছুই নাই'। শুক্রাচার্যের জননী মহীয়সী সোমাসতি দেবী বলিতেন—

'ছেলে মারে, কাপড় চোঁড়ে
নিজের ক্ষতি নিজে করে'।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে সৌজাত্য বিদ্যা বা ইউজিনিক্সের চর্চা হইতেছে। প্রাচীন ভারতে যে এই বিদ্যা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে মনুসংহিতায়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়, রাজবল্লভের কামশাস্ত্রে, মহাভারতের বনপর্বে সাবিত্রীর উপাখ্যানে। আমাদের মধ্যে মানসিক ব্যাধির বিস্তারের একটি প্রধান কারণ, ভারতের প্রাচীন সৌজাত্য বিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব। আমরা বিবেকী যেখানে অবিবেকী, উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, সেখানে আমাদের সন্তানেরা দেহ ও মনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে, এরূপ আশা করাই বিড়ম্বনা। আমাদের দুঃখ-দুর্গতির একটি প্রধান কারণ, আমরা প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে অনেকাংশে ভ্রষ্ট হইয়াছি। ভারতের মনোজ্ঞ আদর্শকে আবার জীবনের উপযোগী করিয়া প্রচার করিতে হইবে, প্রত্যেকটি বিবাহিত নর-নারীকে ভারতীয় সৌজাত্য বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করিতে হইবে। অবশ্য, সেই সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে, অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কেননা, দারিদ্র্যের সঙ্গে মানসিক বিকৃতির একটা নিকট সম্পর্ক আছে।

পাশ্চাত্ত্যের মূল্যবান গবেষণার দ্বারা আমরা লাভবান হইব, সন্দেহ নাই, কিন্তু কিভাবে মানসিক বিকৃতির সংখ্যা হ্রাস করা যায়, কি ভাবে মানুষ সুস্থ দেহ ও মনের (a sound mind in a sound body) অধিকারী হইতে পারে, একমাত্র সনাতন ভারতবর্ষই তাহার নির্দেশ দিবে।

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের মূলঃ বিষয়ের শাখায় সভাপতি অধ্যাপক শ্রীবিমলচন্দ্র সেন শাস্ত্রীর ভাষণের প্রতি নিধি।

শিশু মনের ক্রমবিকাশের ধারা*

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ চৌধে

পৃথিবীতে জন্মলাভের পরে শিশুর শরীরের যেমন ক্রত বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ভাবেই মানসিক বৃদ্ধির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে। মায়ের শিশুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরনির্ভরশীল হইয়াই বড় হইতে হয়। এই সময় শিশুর বংশগতি হইতে প্রাপ্ত সকল মৌলিক ক্ষমতাগুলির ক্রিয়া কেবলমাত্র চলিতে থাকে। শিশু জন্মের সঙ্গে যে সকল ক্ষমতাগুলি প্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারাই সে শিক্ষা লাভ করে। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাহার মনে শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের ভিত স্থাপিত হইয়া থাকে, এই কথা মনোবিজ্ঞানীরা বলেন। জীবনের প্রথম দিনেই শিশুর ক্রম শিক্ষা লাভ করিবার ক্ষমতাও বর্তমান থাকে।

নবজাত শিশুর যে সকল প্রতিবর্ত (reflex) গুলি কাজ করে তাহা অনুদ্রেক প্রক্ষোভজ প্রতিক্রিয়া (unconditioned emotional response)। শিশুর জন্মের সময়কার প্রতিবর্তগুলির মধ্যে হাঁচি, কাশি ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিই উল্লেখযোগ্য। এই সময় শিশু কোন কোন উদ্দীপকের দ্বারা উদ্বেগজনক ভাবেই সাড়া দেয়। মস্তিষ্কবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর সহজাত বিভিন্ন ক্ষমতাগুলি পূর্ণতা লাভ করে, সেই জন্য শিক্ষা করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

জন্মগতভাবে প্রাপ্ত বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে পার্থক্য থাকে। সুতরাং সকল শিশুকে এক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিয়া উপযুক্ত ফল পাওয়া যায়না। সেইজন্য বিদ্যালয়ের পূর্বেই শিশুর বুদ্ধি ও সামর্থ্যের দ্বারা পরীক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। শিশুদের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার নানারকম পদ্ধতি আছে। কোন কোন মনোবিদ এই কথা বলেন যে ষোল বৎসর বয়সের পরে আর বুদ্ধি বাড়ে না।

শিশুর ক্ষমতা ও আগ্রহের বিরুদ্ধে কোন বিষয় জোর করিয়া শিক্ষা দিলে শিশুর মানসিক গঠনের বিপুল ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। শিশুর সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক গঠনের জন্য আদর্শ স্বাভাবিক পরিবেশ প্রয়োজন, যেমন মাতাপিতার পরস্পরের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ এবং সু-শৃঙ্খল পারিবারিক পরিবেশ। স্বাভাবিক মানসিক গঠনের জন্য অতি শৈশবেই শিশুর মনে নিরাপত্তা ও স্নেহের বোধ জন্মান নিতান্ত প্রয়োজন। আদর্শ পরিবেশে গঠিত ও পরিচালিত নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিশু বিদ্যালয়গুলি শিশুকে শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। কারণ এই সকল বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর উপযোগী পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান

করা হয়। শিশুরা তাদেরকে অবস্থা অনুসারে বাস্তব অভিজ্ঞতায়,মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে।

যে সকল কারণ শিশুর মানসিক গঠনে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এবং বংশগতি তাহার মধ্যে প্রধান। জন্মগত ভাবে শিশু মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলির অধিকারী হয়। পরে পরিবেশের সংস্পর্শে শিশুর অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইজন্য সামাজিক পরিবেশ ও আর্থিক অবস্থা উন্নত হওয়া আবশ্যক।

শিশুর যৌনবোধ নাই সাধারণত এই কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। জন্মের পর মুহূর্ত হইতেই শিশুর মনে সহজাত বৃত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম এই যৌনবোধের প্রবৃত্তিটি বর্ত্তমান থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কৈশোরে স্বাভাবিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শিশুর যৌনজীবন স্বতঃকামী, (autoerotic), স্বকামজ (narcissistic) ও অপর-কামজ প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়া ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বতঃকামী পর্যায়ের শিশুরযৌনবোধ শারীরিক সংবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বকামজ পর্যায়ে নিজের শরীরেই শিশুর যৌন আকর্ষণ নিহিত থাকে। অপরকামজ পর্যায়ের প্রথম দিকে শিশুর সমকামিতাই প্রবল থাকে। ক্রমে এই পর্যায়ের শেষে শিশুর যৌনবোধের স্বাভাবিক বিকাশ পূর্ণ হয় উভয়কামিতায়। প্রত্যেকটি শিশুর যৌনপ্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে এইরূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন কারণে শিশু এই স্তরগুলির কোন একটি স্তরে স্বাভাবিক যৌনবোধ বিকাশে মনে বাধা পায় তবে শিশুর মানসিক গঠনের পথে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বাধার ফল পরবর্তী জীবনে শিশুর চরিত্রে নানা প্রকার বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, যেমন কুনো স্বভাব, ঈর্ষা, ভীরুতা, উৎসাহহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ইত্যাদি। আমরা নানা এইরূপ একটি উদাহরণ এইখানে উল্লেখ করিলাম। বিশেষ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত একটি পরিবার। ছেলেটি বুদ্ধিমান, লেখাপড়ায় অনুরাগী, অল্প বয়সেই পরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু তার পরেই ছেলেটির মানসিক গোলযোগ আরম্ভ হয়। প্রথমদিকে পড়াশুনায় অমনিযোগ, সহপাঠীদের সঙ্গে মতবিরোধ, হঠাৎ কাকে কী বলে বসে—এই ধারণা। তারপর সঙ্গে মেলামেশায় যোরতর আপত্তি, জীবনে হতাশা, অকারণ ঝাড়াঝাটি করা, অনিদ্রা, জামা কাপড় অপরিষ্কার করিয়া রাখা ইত্যাদি গোলমাল এমন বেড়ায় যাকে চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আনা হয়। অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারি মাতাপিতা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। আর্থিক সচ্ছলতা আছে, কিন্তু স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক নাই উভয়েই সন্তানদের সম্মুখে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া একে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই পরিবেশে ছেলেটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে থাকে এবং কৈশোরের শেষ পর্যায়ে আর চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেনা, ফলে মানসিক বিকৃতি দেখা দেয়।

---

* আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিশেষজ্ঞ মানসিক অভিজ্ঞতার অন্যতম সাথীর অন্যতম শ্রীপ্রবোধ ঘোষের 'শিশুমনের ক্রমবিকাশের ধারা' সম্বন্ধে পড়ুয়ার সাহায্যে।

ভারতবর্ষস্যোপযোগিনী বৈজ্ঞানিকী চিকিৎসাঽয়ুর্বেদো নাম্নঃ

লেখক : অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষঃ আয়ুর্বেদাচার্যঃ এ. এম. ডি কায়াচিকিৎসক

যদি পরন্তু রাষ্ট্রেণাস্য স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যাধি-প্রতিষেধ যোগে চিকিৎসাদীনাং ব্যবস্থা সন্তুষ্যেত তর্হি কেবলমেবায়ুর্বেদ-বিজ্ঞানস্যানুশীলনেন, প্রসারেণ, গবেষণয়া চ তদুদ্দিশ্যং সিধ্যতি।

সাম্প্রতমপি প্রাচীনতমমিদমায়ুর্বেদশাস্ত্রং দেবভাষয়া লিখিতং বহুভিঃ ঋষিপ্রতিষাতৈঃ রাষ্ট্রৈঃ বিপর্যয়ৈশ্চ অতিক্রম্য ইদমীদৃশমবস্থামাপন্নম্। অধুনাপি সমুদ্ভাসীশ্চাবতিষ্ঠতে ইতিশ্বরণেন চিরন্তনীসমুদ্ঘোষো-মানমেবাপজায়তে।

নৈবন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রস্য সর্বমেবাকর্মণীয়ঃ অস্যাধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুসারেণ তথাপি আধুনিকবিজ্ঞান-পরীক্ষাতঃ আয়ুর্বেদস্য প্রামাণিকতয়া কেষাঞ্চিৎ সংশয়ঃ ন বর্ত্ততে ?

চারকপ্রাণাদ্যায়ুর্বেদীয় মতৌষধমধুনিক বিজ্ঞানেন স্বীকৃতং প্রধানিকং অন্তত অংশতৌষধরূপেণ। আমলকীম্ ভিটামিন সি, ইতি খ্যাতপ্রায়া বর্ত্ততে। মদনোচ্চেন্ 'ক্যাপসিয়াস' ইত্যাখ্যাতুং আধুনিক-পদার্থো বিদ্যতে। যবা-কুষ্ঠজ-কালমেঘ-সদৃশপর্যায়িণ্ 'alcoloid' ইত্যাখ্যাধুনিক-ক্রিয়াশীল-পদার্থো বর্ত্ততে। এবমপি অধুনৈব স্বীকৃতমস্তে বৈজ্ঞানিকৈঃ।

এতেন মন্যতে ঈশ্বরম্ প্রাচীনায়ুর্বেদশাস্ত্রং নাবৈজ্ঞানিকম্। পরন্তু পূর্ণবিজ্ঞানভিত্তিমূলেষু প্রতি-ষ্ঠিতমিদমায়ুর্বেদশাস্ত্রম্।

যদ্যপ্যধুনায়ুর্বেদস্য সর্ব-তন্ত্রাণি অনাবিষ্কৃতানি একথা নবৈজ্ঞানিকৈঃ অস্য সম্পূর্ণতঃ স্বীকর্তুং সমর্থা ভবিষ্যন্তি। কিন্তু আয়ুর্বেদস্য প্রাচ্যধারাবলম্বনেন বিনা অন্যা ভবিষ্যদ্বেষণায়াঃ পন্থা কথং ভবিষ্যতি।

অস্মদ্দেশীয়ায়ুর্বেদীয়বিজ্ঞপ্তিঃ প্রতীয়তে চারক-প্রাসাদস্য নবাবিজ্ঞান-রসশালায়াং পরীক্ষিতাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠৌষধরূপেণাভিহিতাঃ ন খলু পাশ্চাত্য-বিষয়ভিঃ নির্দিষ্টাঃ ঔষধাদ্যঃ ইতি।

অধুনা কেচিৎ মন্যন্তে ঈশ্বরম্ কিঞ্চিৎ আয়ুর্বেদস্য পাশ্চাত্যতেজস্যা কিঞ্চিৎ মিশ্রয়িত্বা ভারতীয়-চিকিৎসায়াঃ অবমানরূপেণ তস্যাম্ ভ্রমণীয়ম্। এতদসমীচীনমেব। আবশ্যকার্থে 'এলোপ্যাথি-কিমিক্যল' কেমিষ্ট-কিমিক্যল-ব্যাকৃষ্টীরিয়লজী-সাপোর্টে-ক্যাটীনাং পাশ্চাত্যবিষয়াণাং শিক্ষাগ্রহণং তথা ঔষধেষু রস-পঞ্চক-কুটিলা-কজ্জলী-বিষৈঃ সহ মেথোইড কিমিক্যালিস-কোকেনাদিপাশ্চাত্যৌষধানাং মিশ্রণং ন হি একার্থবাচকৌ। যথা যেষাং অনুকল্পেনায়ুঃ মিশ্রচিকিৎসায়াঃ ন্যূনং ইতিহি তস্মিন্ পাশ্চাত্য-দেশেঽপি একাধিক-চিকিৎসাঃ বর্ত্তন্তে, যথা হোমিও-প্যাথোপ্যাথী চ্যাদয়ঃ। অত্র একত্রয়োঃ মিশ্রণেন একঃ নব-চিকিৎসা-প্রবর্ত্তনমস্তি ন জায়তে।

রোগাতমণাং যাবৎ প্রতিষেধ ক্ষমা চ রোগা-ক্রান্তায়াঃ আয়ুরায়াঃ চিকিৎসা একত্রয়োঃ ব্যবস্থাঃ আয়ুর্বেদে সন্তি।

অধুনা বিদ্যিবৈকপাদৈঃ স্বাস্থ্যরক্ষেন অস্য দরিদ্র-দেশস্য আয়ুঃ স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যাধিপ্রতিষেধ-রোগ-চিকিৎসাদয়ঃ সন্তব্যন্তি তদেবাস্য ভ্রমণীয়ম্। তর্হি আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানানুশীলনেন ভবিষ্যতি।

অনাকুলরো নবাবিজ্ঞানোবিরোধী চারকায়ুর্বেদঃ। ঈশ্বরী চিকিৎসা পৃথীব্যাং নাস্তীতি নায়ুক্তিঃ।

একথা অন্যা-সাধারণ-রোগচিকিৎসা-কৌশলকৃত্য-কৃতবিজ্ঞানস্য চারকায়ুর্বেদস্য পূর্ণবিকাশঃ আসীৎ। অধুনাপি অষ্টাঙ্গায়ুর্বেদস্যানুশীলনং ন বিনষ্টং জাতম্।

বিভিন্নদেশেষু বিভিন্নানামভিঃ অন্যা প্রচলনমস্তীতি। অষ্টাঙ্গায়ুর্বেদস্যাধুনোল্লিখিতপ্রকারেণ পুনরুজ্জীবনায় যদি নব্যবিজ্ঞানচিকিৎসাপদ্ধতেঃ সমন্বয়ঃ-পার্শ্বতঃ স্যাৎ তদা প্রভূতলাভস্যঃ প্রবর্তিষ্যতে সম্ভূয়ন্তি আয়ুর্বেদজ্ঞ-পণ্ডিতাঃ। হ্যাম্বি সর্বেষাং রোগানাং নব্যবিজ্ঞানস্য শ্রেষ্ঠতমৌষধি বিশ্বোষাদ্ধে বিদ্যতে। ম্যালেরিয়া-বসন্ত-প্লেগো-বসূচিকা-রোগাণাং বিষনাশ আয়ুর্বেদ-প্রদর্শিতপন্থানুসরণাদি যন্ত্রযন্ত্রেন মহামারী-নিবারণোপায়স্বরূপম্। উক্তঞ্চ হজ্ বিমানস্থানে জনপদো ধ্বংসনীয়াধ্যায়ে মহর্ষি চরকেণ "বৈগুণ্যমুপলভ্যানা-মিত্যাদি.....*

সলিল-বায়ু-দেশকালবৈগুণ্যাৎ হি বিবিধ-মহা-মারীণাং প্রাদুর্ভাবস্তু কারণং, তস্মাৎ এতেষাং শোধনেন যদ্বা মহামারীং নিবারয়িতুং সমর্থাঃ। পরো-পকার-জনসেবা-পার্শ্বত্যাগাদিষু নৈতিকচিকিৎসা প্রতিষ্ঠিতোঽস্তমায়ুর্বেদঃ। যদ্বা চরকঃ-নাম্নার্থং বাপি কামার্থং অযত্নতোঽপি বা ইতি। স্বাস্থ্যরক্ষা-রোগ-প্রতিষেধাদি বিষয়েষু আয়ুর্বেদোপদেশাঃ হি শ্রেষ্ঠ-তমাঃ। এতেনায়ুর্বেদস্তনির্দ্দেশাঃ সর্বথা পালনীয়াঃ একদা নরাণাং ঔদৃশী ধারণাসীৎ। তদা মানবাঃ সত্যযুগে আসন্। অধুনা মানবাঃ প্রায়শঃ ষড়রিপু-সমূহৈঃ ন জীবন্তীতি। তদৌ বিংশশতাব্দ্যাং ন জীবন্তি লোকাঃ ইতিবদন্তঃ প্রত্যক্ষতঃ সার্বজনীনরূপেণ পরি-লক্ষ্যতে। স্বাস্থ্যসংরোধনার্থং গরল-গুল্ম-গুণ্ডগুগ্গুল-কলনাদীনাং ধূমপানা বজ্জাদিষুঃপ্রসঙ্গঃ, জলসংশোধনায় কেরোসীন-কর্পূরৈঃ অভিসন্ধাপাদ্য জলতন্ত্রিরিতি। ভূমি-সংশোধনার্থং গোময়-হরিদ্রা-চূর্ণলীনাং ব্যবহারঃ। শুদ্ধাচারং স্থানপরিবর্ত্তনাদ্যা কালসংশোধনমিতি নির্দ্দেশাঃ নব্যবিজ্ঞানাভিরোধিনঃ। নাস্ত্র কোঽপি সন্দেহঃ। অদ্যাপি সর্বসাধারণ্যাঃ আত্মরক্ষার্থং দীর্ঘসূত্রীতার্কিক অবধানতঃপ্রোক্তিঃ সন্ত্রাসংপ্রতিভাতি।

উদ্যাঃ শয্যাত্যাগে-প্রাতঃকৃত্য-দন্তধাবনাভ্যঙ্গ-ব্যায়াম-স্নানাহার-বিশ্রামাদীন্ সমুচিতকালেষু স্বাস্থ্য-কামী জনঃ। ধর্মো হি সর্বেষাং সুখানাং মূলং, তস্মাৎ স্বাস্থ্যকামায় ধর্মপরায়ণো ভবেৎ। সর্বজীবেষু দয়া সমবুদ্ধিশ্চিত্তসংযমঃ, পরার্থে স্বার্থমুৎসৃজেৎ-এতে উপদেশাঃ আয়ুর্বেদস্য ন কেবলং ঐহিক-সুখসিদ্ধার্থং দীর্ঘসূত্রীতার্কিক।

বিজ্ঞানযোগাদ্যতরোঃপুনরুদয়ঃ হ্যায়ুর্বেদঃ। সম্প্রতিঞ্চ রস-রক্তমলাদীনাং ক্রিয়া, রোগ-চিকিৎসা-নিদানাদয়ঃ—এতৈঃ সহ আধুনিকস্য কঃ সম্পর্কঃ? এতদুপলব্ধ্যর্থং সারমর্ম্মো বার্ণিকতরবঃ অস্মিন আয়ুর্বেদে বর্ত্তন্তে। অপি চায়ং নিজস্য বাবোধনস্বরূপ ঔষধকল্পন-সংগ্রহ-প্রস্তুতবিষয়োঃ বিজ্ঞেয়ঃ। ঔষধ নাম পরিভাষা-বিজ্ঞানমিতি। তৎকালীনপণ্ডিতাগ্র গণ্যাশ্চ যেন অস্যাঃ শাখায়াঃ উন্নতিঃকৃতঃ। ইয়ং পরিভাষা নব্যবিজ্ঞানমতেন 'ফার্মাকোপিয়া' ইতি নাম্না অভিহিতা।

প্রাতঃকালাৎ রাত্রৌ শয্যাগ্রহণপর্যন্তং যাবৎ কর্ত্তব্যবিধিঃ স্বাস্থ্যরক্ষায় তাবৎ বিস্তরাধ্যায়ে বর্ণিতঃ। অনুচ্ছায়াধ্যায়ে পুনঃ ষড়ঋতূনাং কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যানাং উল্লেখঃ। যদ্যপি বাস্তবতঃ—আয়ুর্বিশেষ-তায়ং বিজ্ঞানমেবং প্রতিপাদনার্থমুদ্যতোঽস্তঃ। অতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার্থং আয়ুর্বেদস্য বাণী সর্বজনহিতায় ন কেবলং ধনিনঃ প্রতি, আপামর-দরিদ্রজনাশ্চ প্রতি তস্যাং তঃ প্রতি অস্যাবশ্যং তাবদ্ভঃ ভারতীয়-সংস্কৃতি-রক্ষণেচ্ছু ভিঃ নরৈঃ।

* আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ্ দ্বিসপ্তত্ব-বার্ষিক-অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্তি যোগেশ এবং প্রবন্ধঃ পঠিতঃ।

সংস্কৃতির সংবোধিক*

(সার্বদিক কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র)

জীবন জিজ্ঞাসার প্রথম পরিচয়ে আয়ুর্বেদের উল্লেখ। উহার দয়া নিয়ে পেয়েছে মানুষ প্রচুর স্নেহসেবা ও নতুনতর জ্ঞানলক্ষ। দুর দুর ঘরে চোখের সামনে যা পড়েছে, আর বিজ্ঞানের প্রতিভা নিয়ে তাকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে রচনা করেছে। তাই জীবন চেতনার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে আয়ুর্বেদ ও তার সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি।

কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, সাধারণ লোকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম অর্থ ধরে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। উহা ঠিক নয়। তবে এটাও ঠিক, সভ্যতাকে বাদ দিয়ে নয়, সভ্যতার পথ দিয়েই এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতির সোপানে। অতএব এ থেকে বলা যায়—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকশিত সম্পদই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি আজ সংকটাপন্ন। কেন না, মানুষ আজ তাকে ঠেলে ফেলেছে বিস্মরণে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজ দুরন্ত স্রোতের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ভারতীয়কে অতীতের ঐতিহ্যে অবগাহন করে সেই সংস্কৃতি-শ্রীকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হবে যেমন করে সে একদিন সংস্কৃতির শেষ সোপানে শেষ স্পর্শ দিয়ে মানুষের সপার জ্ঞানক লাভ করেছিল তুলে মানুষে আয়ুর্বেদে অর্থাৎ জীবনকে জানায়।

কিন্তু ভুলে গেছে আলোর মানুষ, ভুলে গেছে মানুষ অমৃতের সন্তান। তাকে নিজেকে নতুন করে জানতে হবে, বিশ্বকে জানতে হবে—ভারতীয় সংস্কৃতি প্রকৃতই বিশ্ব-সংস্কৃতি। তার কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আদর্শ মুক্ত জীবন বোধ—দেহ, মন, বুদ্ধি সব কিছুকে নিয়েই তার সমগ্র জীবন। আর উপর ভিত্তি করে ভারতীয় জীবন-দর্শন—লক্ষ্য অমৃতের সাধনা।

উপনিষদের ঋষি থেকে আরম্ভ করে রামমোহন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে আলোকের ধারা-ধারায় উত্তীর্ণ হয়েছে আনন্দ লোকে কিন্তু চারিয়ে দেখেছে তার বিজ্ঞানের বিচিত্র পদ্ধতি। উহার পুনরাগমনের প্রচেষ্টাই, আয়ুর্বেদ-ভারতী, অগ্রণী হয়েছে। প্রচেষ্টা দেখে শাস্ত্রের বাণী প্রসঙ্গত এসে যায়ে—'অজ্ঞানেন লভতে জ্ঞানম্।'

সত্যই আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ ভারতীয় সংস্কৃতির এই নীতির উপর যে বিশ্বাসী তার প্রমাণ-স্বরূপ তুলে ধরা যায় এই 'আয়ুর্বেদে-ভারতী' - মধুময় প্রজ্ঞাদীপ্ত এই পত্রিকা তার সুষ্ঠুই সাধনার নিদর্শন। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের এক অপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা বলে ইহাকে স্বর্ণাক্ষরে স্বীকৃতি দেবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

* পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভিভাষণ। বার্ষিক ভারতী। সংস্কৃতি সম্মেলনে শ্রীঅবনী কান্ত মৈত্রের বক্তৃতার সারাংশ।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে
লিকোরিণা
সাভার কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১/১ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১৪

সম্পাদকীয়

(৬১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হ'তে পারে। চিকিৎসায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার দরকারই আছে, তাকে সঠিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা না হ'লে বিপন্ন রোগের বিচিত্রতায় লক্ষিত দেহের ও মনের প্রকৃত ও সহজ শক্তির ভাল রাখা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না—তাই দৃষ্টি কর্ম বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। আমুন, অষ্টাঙ্গের অনুশীলন—তার নীতিও ব্যবহারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের পথ দিয়ে দৃঢ়তর আয়ুর্বেদের প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর হই দেশের কল্যাণের জন্য।

স্বাধীনতার ১৪ বৎসরের মধ্যেও ভারত সরকার আয়ুর্বেদসম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে পারেন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভারতীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আয়ুর্বেদের অমূল্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা অনেক পূর্বেই করা উচিত ছিল। ডাক্তারগণ ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগসমূহে নীতি নির্ধারণের উপদেষ্টা। আয়ুর্বেদসম্বন্ধে এঁদের অনধিকার চর্চা এই অব্যবস্থিতচিত্ততার কারণ। আয়ুর্বেদের ঔষধগুলি আত্মসাৎ করে ডাক্তারীর পরিপুষ্টি ও আয়ুর্বেদের জ্ঞাননীতি অনুসরণ করা অন্যায় ও দেশের অকল্যাণকর। ভারত সরকারের কর্তব্য আয়ুর্বেদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা এবং তা কবিরাজদের দ্বারা পরিচালিত করা। আশা করি, এ বিষয়ে সরকারী তন্দ্রমূর্তির উদয় হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য বহুপ্রতীক্ষিত আয়ুর্বেদ বিল কার্যে পরিণত করা। কোন কারণেই তা ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা প্রতিষ্ঠানগত ক্ষোভ-ঈর্ষায় কার্যে-পরিণতি বিলম্বিত হতে দেওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, আয়ুর্বেদের স্বতন্ত্র বিভাগ কার্যকরী হবে।

আজ বাংলা দেশের প্রত্যেক কবিরাজ ও আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি সম্বন্ধে অবহিত হবার সময় এসেছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের ওপরে আয়ুর্বেদ। তার সম্পূর্ণ উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করে শিক্ষার মান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ সর্বতোভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য সকলের চেষ্টা করা প্রয়োজন। ইহার আশু সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে যদি আয়ুর্বেদ বেঁচে থাকতে পারে, তবে স্বাধীন ভারতে সরকারী সাহায্য থাকুক বা না থাকুক, আয়ুর্বেদ বেঁচে থাকতে পারবে, না কেন? সরকারী সহায়তা অতিরিক্ত অবদান হবে, আশা করি। প্রকৃতপক্ষে ভারতে আয়ুর্বেদের স্থান ও উৎকর্ষ নিশ্চিতই ঐতিহ্যগত বিজ্ঞানের মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবে। ইহা স্থাপিত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

প্রাণিক প্রেস, ২১৯১ পটুয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রকাশ: বাগবী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে যথারীতি প্রকাশিত।

অবনীন্দ্র নাথ

শ্রীসদানন্দকুমার মজুমদার

হে রূপকার, তুমি রূপের খনি খুলেছ তব চিতে
তুলিকার আঘাতে আঁকিলে অরূপ যদি নিভৃতে।
তুমি স্রষ্টা—সৃষ্টি করিলে নব চঞ্চলা প্রকৃতি,
ধরাতীর্থে লভিল জীবন, নিত্য বিচিত্র জ্যোতি।
তব চিত্রাকাশে মধুরিত সুমধুর মরকত
মধুলিহ তাই চিত্রে চিত্রে ধ্বনিয়ে কি আনত!
তোমার অমূর্ত সজনীশক্তি ভাতিছে স্বর্গে মর্তে।
বিরচি নতুন পৃথিবী যেন তুলিকায় আবর্তে।
হে কবীন্দ্র, কল্পনার অন্তরেতে রঙে রসনায়
বিচিত্রিলে চিত্রাবলি চক্ষে ছন্দে প্রেম উপাসনে,
কাব্যের লালে, নিখিল রূপসীর বিবিধ বর্ণে,
রেখা চিত্র সুরের মূর্ছনা রূপকলন হরষে।
খুশবোর খুমারি, মাদকি আনন্দ মুরলিং
নিবেদিলে মূর্তিমা সবার মানসের পরিবৃত্ত,

বাক্যহীন রাজা তুমি রূপরাজ্যের রাজ-অন্তরে,
তোমার যোগে তুমি স্পর্শ করেছে ধনী নির্ধনে,
খোকাখুকু জননী আর বিরহী নিয়ে ভিখারিনী
সবলের অন্তরে ছেলেছ অমৃত আবার বাণী।
লোকচিত্তরঞ্জনের পাত্র তুমি বাস্তবপরক
অমূর্তকের রূপে রসে হয়েছিলে তুমি লক্ষ লক্ষ—
চিরকালের প্রাণ লক্ষ্মীরির প্রাণহীন আবেগো
নাড়ি ছুঁয়ে তব বিরহকে ছবির তুমি অমাকো।
নীলাকাশ আর লাল ধরিত্রী সাক্ষী তুমারে
মুক্তি পেল বর্ণে বর্ণে অবর্ণের নিতুই আবার
বাক্ করিলে অবাক্তের অনন্ত প্রকাশ পেলব
বিচুরিল নুতো নুতো সুধা যেন সুমুর নীরব।
বিশ্বের বিলীন তব মহাকাশে অবরুদ্ধ রচি
চিরজীবী তুমি লোকে অলোকে বিশ্বের বরণ্ডই।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের
অপূর্ব সমন্বয়ে
নবীন পদ্ধতিতে

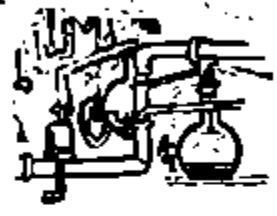

বাতরক্ত ও পুরাতন ক্ষোভা আরোগ্য

উৎ ছাড়া গাত্রে চাকা চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙুলের বক্রতা, একদিকা, ফোলাইসিস্, ফুলিয়া যাওয়া ও অন্যান্য কঠিন রোগসমূহ আরোগ্য করা হয়। দাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লইয়া এবং বিনামূল্যে বিবরণীর পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, পুরাতন হাওড়া (ফোন : ৬৭-১৩৫৯)।

শাখা :- ৩৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)।

আয়ুর্বেদ-ভারতীর নিয়মাবলী

১। "আয়ুর্বেদ-ভারতী" মূলত ও প্রধানত আয়ুর্বিজ্ঞানের তথা-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধও ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

৩। বাংলা বৎসর অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৩এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতীতে" প্রকাশের জন্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি গৃহীত হইয়া থাকে।

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad. ***Baidyanath*** medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD.
CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

THE 'AYURVEDA-BHARATI'

A multilingual Quarterly Journal is the right vehicle for the dissemination of cultural and scientific matters, especially of the knowledge of Ayurveda and its practice. It seeks unstinted support and sympathy from the Profession and the Public.

Founder-Editor,
AYURVEDA-BHARATI.

আয়ুর্বেদ-ভারতী

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম. এ. আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্য্যালয়

৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা ৭৫ ন.প. বৈশাখ, ১৩৬৯ বার্ষিক—সডাক ৪৲

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৬৯

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	রাষ্ট্রপতি ডা. এস. রাধাকৃষ্ণাণ (পদ্য)	শ্রীবলাইচাঁদ মহলানবীশ	৯৭
২।	সম্পাদকীয়		৯৮
৩।	Antiquity of Indian Medical Study	Dr. Radhakumud Mookerji	৯৯
৪।	ঔষধে আয়ুর্বেদ	অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী	১০১
৫।	রক্তের আম্লবীক্ষণে উপরোগ	কবিরাজ শ্রীপঞ্চানন ঠাকুর	১০৩
৬।	ভগ্ন প্রার্থনা (An Appeal)		১০৫
	ভারত বাসিক ভগ্ন প্রার্থনা নিবেদন	পালন বিষয়ক	১০৬

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৮।	আধুনিক চরক সংহিতার অবতারণা	কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়	১০৭
৯।	চরক প্রশস্তি গ্রন্থে	কবিরাজ শ্রীজয়রামদাস আয়ুর্বেদী শাস্ত্রী	১০৯
১০।	ধন্বন্তরি স্তব	কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন শর্মা	১১১
১১।	যক্ষ্ম-প্রীহা	কবিরাজ শ্রীউমেশ চরণ সেন	১১১
১২।	আয়ুর্বেদীয় সংস্কৃতি	অধ্যাপক শ্রীবিভেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	১১১
১৩।	আয়ুর্বেদের সূক্তি	প্রাণাচার্য	১১২
১৪।	আয়ুর্বেদীয় সঙ্ঘ	শ্রীমতী দুর্গা মুখোপাধ্যায়	১১৩
১৫।	আয়ুর্বেদ সেক্টরোগ	কবিরাজ শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত	১১৪

পাইওনিয়ারের সেফ্টি রেজারব্লেড উপহারে সেরা।
সুতরাং প্রথম শ্রেণীর রেজারব্লেড হিসাবে পাইওনিয়ারের সেফ্টি ব্যবহার করা উচিত।

পাইওনিয়ার লিটিং মিলস্ লিঃ
"পাইওনিয়ার বিল্ডিং"
বি, টি, রোড, কলিকাতা-২

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আকার ১ ডবল ক্রাউন। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার—

প্রথম পৃষ্ঠা : ১২৫৲

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—১০০৲

তৃতীয় পৃষ্ঠা—১০০৲

চতুর্থ পৃষ্ঠা—১৫০৲

সাধারণ পৃষ্ঠা—১০০৲

সম্পাদকীয় মন্তব্য অন্যান্য প্রবন্ধাদির অগ্রে বিশেষ স্থানের হার—১৫০৲ বা অধিক।

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে কথাবার্তা ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার পর অগ্রিম দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি হিসাবে প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়
৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Pharmacies by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.

Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE

Baidyanath

AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD.

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

বাতরক্ত ও পলিত কোগ আরোগ্য

ইহা ছাড়া গাত্রে চাকা চাকা দাগ, অঙ্গবক্রতা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দুষিত ক্ষত ও অন্যান্য চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়।—বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্রে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত বিবরণী পুস্তক পাঠান হয়।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন: ৬১-১৩১৭)।

শাখা:— ৩৫নং হরিসভা মাঝী রোড, কলিকাতা-৯ পুরবী সিনেমার পাশে।।

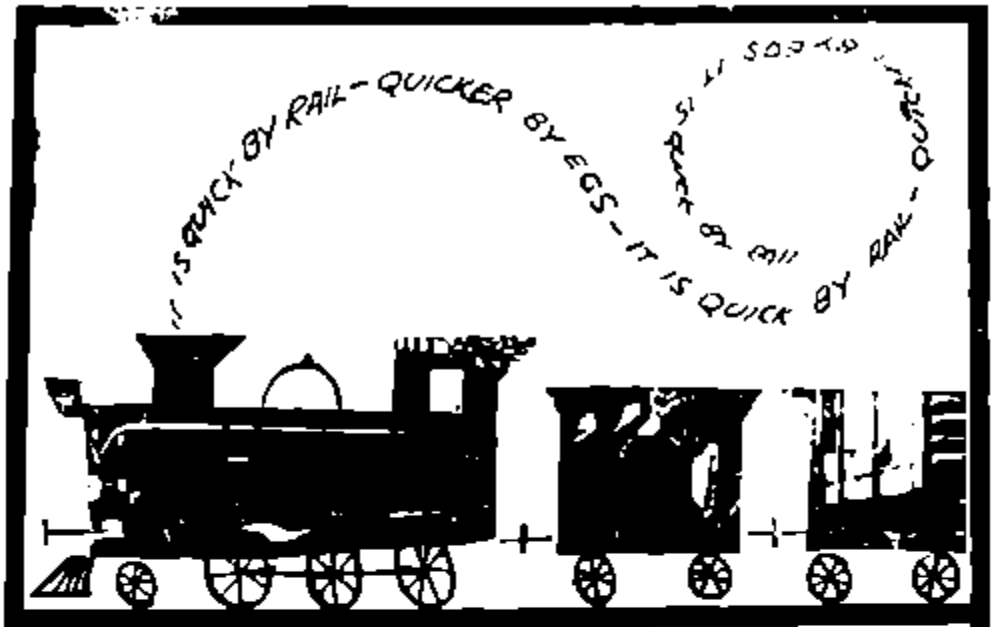

ছোট-ছোট মাল এখন আমরা
পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি
ছাওড়া থেকে

ধানবাদ	২য় দিনে
পাটনা জংশন	৩য় দিনে
গয়া	৩য় দিনে
ভাগলপুর	৩য় দিনে
রামপুরহাট	৩য় দিনে

ব্যাঙ্কার
শুধুমাত্র হুপারহাউসের
এর কাছে বিলম্ব
হিসেবে পাবেন

ছোট মাল পাঠান
তাড়াতাড়ি পৌঁছবে

পূর্ব রেলওয়ে

EGS

এক্সপ্রেস গুডস সার্ভিস

আয়ুর্বেদ-ভারতী

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ ॥"

প্রথম বর্ষ
ত্রৈমাসিক

বৈশাখ, ১৩৬৯

চতুর্থ সংখ্যা
মে, ১৯৬২

রাষ্ট্রপতি ডঃ এস, রাধাকৃষ্ণান

নানা লোকে চলে নানা পথে বাসনার রথে
সুখের স্বপন বহি, দুখেরে ভুলিয়ে আগে ;
বিরহী তুমি সন্ন্যাসে করিলে চির-সাথী
নির্জনে একেলা সম্মুখে ত্যাজি লাভক্ষতি।
জ্ঞানের সাগর তীরে, হে মনীষী ধীরি ধর
ফেলে ফেলে করো আলোচনা নাহি তব পর,
শান্তির সাধনে তুমি অমরকীর্তি পৃথিবীরে
শুনায়েছ মৈত্রীর ললিত কথা বারে বারে।
অজ্ঞানে করো উপেক্ষা চিরাচার শিক্ষাগুরু
উচ্চারিলে বাণী অমৃতের নহে মিথ্যা ভীরু :
তাপেরে করেছ সার ভোগের বিশৃঙ্খলায়
মুক্তি লভিল অমৃতের বরপুত্র নিখিলায়
বৈরাগ্যের শুষ্ক পথে ঘুরে বারোমি সংসার,
সেবাই শ্রেষ্ঠধর্ম এর চেয়ের মানুষের।
শিখরে শিখরে মন্দিরে কি প্রান্তরে ঘুরিয়ে
ইতিহাসের অনন্তের বিচিত্র সম্ভারে
যোগাযোগ নিত্য চিত্তে স্থিত বিপুল প্রকাশ :
মিলনের সেতু হোক তব মঙ্গল পরশে।
যবে ভয় কলহ নেমে আসে নিত্য সংসারে
নিস্পিষ্ট দুর্বল নিষ্ঠুর আঘাতে সবলের
উগ্র লোভ যবে বিপর্যয় সমুদ্রের বুকে
অনাচারে অর্থদৃপ্ত অসুরের হেসে ওঠে,
যবে অত্যাচারে আর্তনাদ ওঠে অসহায়
নিষ্করুণ মানুষের তোমার অন্তর আহত,
তোমার বাক্যের প্রভাত আঘাতে শুভ্রতে
নির্মূল কলুষ যেমন অমনি হউবে।
শান্ত হোক অন্তরীক্ষ, শান্ত হউক পৃথিবী
বিশ্বে স্বর্গ রচনা করো দীর্ঘজীবন লভি।

সম্পাদকীয়

জল ও জীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত—একটি আধার, অপরটি আধেয়। একই প্রকৃতি পরিমণ্ডলে জীব ও পদার্থ পরস্পর পরিপূরক, যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ বিচিত্র সৃষ্টির প্রসবিতা। বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকৃতির জীব ও পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাই দেখি, নানা দেশের কৃষ্টি ও সৃষ্টি, রোগ ও ঔষধ, খাদ্য ও দৈহিক শক্তি, দ্রব্য ও গুণাগুণ, পথ্য ও সুস্বাদু, মন ও দেহে এত বৈপরিত্য ও বৈচিত্র্য। জলবায়ু, খাদ্য ও আচার ব্যবহারের সহিত দেহ ও মনের নিকট সম্বন্ধ। ইহা দেশভিদেবে বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং তাদের আহার প্রধানে আন্তর্জাতিকতার বাঞ্ছিত একটা ঐক্য ও স্বার্থরক্ষা সম্ভাবিত হইলেও জলবায়ু ও আচারাচারে সতর্কতা অবলম্বনীয়। ইহা সত্য যখনের জোরে য়ুরোপের লোকের মধ্যে বিদেশে যাতায়াতে বিদেশী খাদ্য ও জলবায়ু চিকিৎসা অভ্যাস হইয়াছে। তবে সেখানেও বিদেশ বিদেশ রুচি ও পরিপাক শক্তির প্রকৃতি অনুসারে রূপান্তর ঘটিয়াছে। দেশের ও সর্বসাধারণের জন্যে ইহার গুরুত্ব তত্টা নাই। যে যে-দেশের লোক তাহার কাছে সেই সেই দেশের জলবায়ু, আহার, আচার স্বাভাবিক, অন্য দেশেরটা অনভ্যস্ত ও বিপরীত জলপ্রসূ। এমন কি, একই ভারতবর্ষে জলবায়ুর পার্থক্যে বিভিন্ন খাদ্য ও আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও ভাষা বিভিন্ন রাজ্যে পরিবর্তন করে। আমাদের কর্মধারণা কবরী টানিতে পারেন প্রয়োজন মিটাইতে পারেন না। বৈষম্যের মিল করিতে চান বর্ষের মিলনকে বাদ দিয়া। ফলে মনোবাঞ্ছিতের বঞ্চনা ঘুচাইতে বস্তুত মানব ধর্মই এত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র-সেখানে তাহার অন্তরাত্মা "বিশ্বতো মুখম্।"

জগৎ পরিবর্তনশীল নিত্য নূতন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলো ইদ্ভাসিত করে মানুষকে—মানুষকে জানার মধ্যে আনে। কিন্তু নূতনের সমারোহে পুরাতনকে অস্বীকার করিলে জ্ঞানরাজ্যেরই অপচয় ঘটিবে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে আয়ুর্বেদ তাহার কালজয়ী সৃজনী শক্তির প্রভাবে পীড়িত মানবতার কল্যাণ সাধন করিতেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আঁকড়কে অভিভূত অনেকে আয়ুর্বেদের যৌলিকতা, বৈজ্ঞানিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান। বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে আয়ুর্বেদ প্রাচীনতম এবং অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস। ইহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে পরীক্ষিত ও সার্বত্র বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি এতকাল ইহা মর্যাদার সহিত চিকিৎসাক্ষেত্রে মুখ্য প্রধান করিয়া আসিতেছে। ইহার বৈশিষ্ট্য-এক দিকে যেমন ত্রিদোষতত্ত্বের সামগ্রিক চিকিৎসা, ভারতের জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, নীতির যৌলিকতা, রোগের মূলের বিনাশসাধন, ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালীর রীতি, অন্য দিকে তেমন চিকিৎসায় যন্ত্র সম্পূর্ণতা, অনাড়ম্বর ও স্বল্পব্যয়-সাধ্যতা, দর্শন ও নীতি বিচক্ষণতা আদর্শ সমাজ গঠনের সহায়ক এবং প্রগতিশীলতা।

সুতরাং আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য অনস্বীকার্য। ভারতে এই চিকিৎসার ঐতিহাসিক শুধু একটি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মর্যাদা স্বীকার করা নয়, ভারতীয়দের পক্ষে সহজ ও সরল ও সুফলপ্রদ চিকিৎসার সুযোগ অব্যাহত রাখা। জীবনের সর্বস্তরে যদি জটিলতাই সভ্যতার অঙ্গ হয়, তবে তাহা যত দূরে থাকে, ততই কল্যাণজনক। জীবনযাপনে ও চিকিৎসায় সৌষ্ঠবের ও বৈজ্ঞানিকতা সমাজে আনে পরিত্রতা এবং দেহে আনে নিরোগিতা। প্রত্যেক কবিরাজ ও জনসাধারণ আজ জাগ্রত হোক ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাধনায়, অর্ঘে ও যজনে অনুশীলনের একনিষ্ঠতায়, তবেই নব নব উন্মেষের সঞ্জীবনী ধারায় আয়ুর্বেদ ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিবে।

Antiquity of Indian Medical Study

By
Dr. Radha Kumud Mookerji

Medical Science was named *Ayurveda* in ancient India. The term *Ayurveda* means the Veda or Science of *Ayu* or Longevity. The object of the Science was thus the prolongation of life so as to emphasise more the prevention of disease than its cure. The object was thus quite practical and positive

It appears that India was the earliest country in the world to develop the Science of Medicine as the Science of Health. This will be evident from the fact that it forms a part of the Veda which is the oldest work not merely of India but of the world. The knowledge of Medicine is first shown in the Veda called *Atharvaveda* which is full of references to the then prevalent diseases of India and also to their remedies. It mentions the appropriate Medicines to be found in the herbs as their natural sources for diseases like Fever, Leprosy, Jaundice, Dropsy, Scrofula, Cough, Ophthalmia, Baldness, Impotence, and also surgical cases like fractures, wounds, bites of snakes and insects, against poison in general, mania, and other complaints. The *Atharvaveda* shows modern India's anxiety to banish the epidemic of malarial fever to distant regions and peoples like the Mujavans or Bahlikas of north-western frontier—Fever which is described as "now cold, now burning hot", which "makes all men yellow", with its brother Consumption sister Cough, and its phew Herpes (Av. V 22).

Ayurveda as a part of Veda makes medical education a sort of a religious mission charged with profound moral obligations. It begins with its own *Upanayana* ceremony which lays stress on physical and moral qualifications of the novice, on his properly formed bodily organs such as tongue, lips, teeth, eyes, nose and mouth, and several moral attributes, purity of body, mind and speech, cleanliness, good manners and morals, courage, humility, patience, capacity for taking pains and the like. The physician must not be repulsive in appearance but a genial presence to inspire hope and cheerfulness in the patient.

The Ayurvedic student was also enjoined to treat the following classes of patients without charging fees and cost of medicines: the *Guru*, Friend, Ascetic, Saint, Patron, Orphan, Pauper and Guest.

As early as the time of the Buddha (*C.* 500 B.C.), *Ayurveda* was a fully developed science in India. The Pali

texts are full of facts and details recording the medical achievements of a typical physician of the times such as Jivaka who treated successfully difficult and dangerous diseases like "disease in the head", Fistula, Intestinal entanglement, Jaundice, etc.

By the time of Emperor Asoka (*C.* 274-235 B.C.) who ruled over a greater India extending from the border of Persia up to Tamraparni or Ceylon, became known as the home of Medical Science in the ancient world and so Asoka embarked upon his sacred mission of spreading abroad to several European countries the knowledge of Ayurveda as the means of relieving the suffering of God's creatures from diseases in a remarkably catholic and cosmopolitan spirit rare in that age. Asoka sent properly equipped Medical and Peace Missions at the cost of the Indian Exchequer to five foreign European Kings whom he mentions as his contemporaries in his Rock Edict No. XIII. These are thus listed by him : (i) Antiochus Theos II.

(*Antiyoko nama Yona Raja*) (261-246 B.C) of Syria ; (ii) Ptolemy II Philadelphos (Turamaye) of Egypt (285-247 B.C.) ;

(iii) Antigonos Gonatas (*Antikini*) (278-239 B.C.) of Macedon ;

(iv) Magas (*Maka*) (300-250 B.C.) of Cyrene and

(v) Alexander (*Alikasudaro*) (273-258 B.C.) of Epirus.

Not merely was Asoka spreading Ayurvedic treatment in the Europe of his times. He takes credit to himself in his 13th Rock Inscription that his efforts for relief of suffering of all creatures, man and animal alike, by Ayurvedic treatment were achieving success in the aforesaid countries. Asoka was also founding Ayurveda on a very sure and stable basis. He was building up in the country Botanical plantations where would be cultivated select medicinal plants and herbs which served as the sources of vital and valuable Ayurvedic medicines in "herbs, roots and fruits." He also states that his imperial order was passed to the effect that where these medicinal plants were not indigenous growths in India they were to be imported from outside and abroad and planted on Indian soil. It is a matter of regret that the Government of India with its vast resources has not yet encouraged the indigenous medical system of India by the cultivation of the medicinal plants from which will be derived the very medicines upon which the system depends so vitally.

গীতায় আয়ুর্বেদ

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

এ দেশের প্রাচীন ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন—'আমি যেন শত শরৎ অর্থাৎ শত বর্ষ জীবিত থাকি, আমি যেন কখনও দীনতা বা হীনতাকে আশ্রয় না করি'। এই প্রার্থনা শুধু যে মানুষের মনে বল ও শক্তির সঞ্চার করে, তাহাই নহে; এই প্রার্থনা বা ভাবনা মানুষের দীর্ঘ জীবন লাভেরও সহায়তা করে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী',—মনস্তত্ত্ববিদ এ সত্যকে কখনও অস্বীকার করিতে পারেন না।

মহর্ষি চরক বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দীর্ঘজীবী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য আমাদিগকে মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। আর একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে

'শত বর্ষ বাঁচে যদি পাপ আচরিয়া,
সেই প্রার্থনীয় নয়, কি ফল বাঁচিয়া'।

আবার মহীয়সী বিদুলার সঙ্গে একথাও সকলেই বলিবেন যে, চিরকাল ঘুমাইয়া থাকার চেয়ে মুহূর্তকাল জ্বলিয়া ওঠা ভাল। পাশ্চাত্য কবির মুখেও আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই:

'One crowded hour of glorious life,
Is worth an age without a name'.

পৃথিবীর অনেক মহনীয় ও রমণীয় পুরুষ স্বল্পজীবী ছিলেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু তাঁহারা যদি দীর্ঘজীবী হইতেন, তাহা হইলে কি মানবের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন না? স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহাপুরুষ যে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেটা আমাদের পরম দুর্ভাগ্য। যশোভদ্রনাথের ন্যায় শক্তিমান গ্রন্থকার যদি মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন না করিতেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য কতই না ঐশ্বর্যশালী হইত! এই জন্যই সৌরমন্ত্রে দীর্ঘ জীবন মানুষ মাত্রেরই কাম্য। মহর্ষি চরক বলেন, রোগ হইতেছে তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও আয়ুর বিঘ্নকর। তাই মানুষ মাত্রেরই প্রধান দুইটি কর্তব্য আছে, (১) যাহাতে দেহে রোগ না হয়, অর্থাৎ, আয়ুঃসাম্য রক্ষিত হয়, তাহার জন্য আয়ুর্বিধি পালন করা, এবং (২) দেহে বা মনে কোনপ্রকার রোগ হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। মহর্ষি চরক বলেন, মনের রোগের মূল অভোগ অর্থাৎ অভোগ; সুতরাং যাহাকে আমরা বহুবিধ বলি, তাহাও মনের রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং দেহকে যেমন রোগমুক্ত রাখিতে হইবে, মনকেও তেমনই স্থির ও প্রশান্ত রাখিতে হইবে। মনকে স্থির ও অচঞ্চল রাখিবার উপায় কি? উপায় —ত্রিবিধ তপস্যা। এই ত্রিবিধ তপস্যা কি? কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা। শারীর তপস্যা কি? তাহার উত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, শারীর তপস্যা বলিতে বোঝায়—(১) দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, (২) শৌচ, (৩) আর্জব বা সরলতা, (৪) ব্রহ্মচর্য ও (৫) অহিংসা। ভগবদ্বাক্যের ভাষ্যে শ্লোকটি এই—

'দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে'।

পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি যথোচিত-প্রণতি শুধু সদাচারের বিধি-সঙ্গতই নয়, এই পূজার দ্বারা মানুষ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ লাভ করে। মহাকবি কালিদাস

এই কথাটি ব্যতিরেকমুখে বলিয়াছেন—'প্রতিষিদ্ধানি হি যোগঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ'। পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম ঘটিলে আমাদের কল্যাণ ব্যাহত হয়। দেবতার পূজায় আমাদের চিত্তশুদ্ধি ও মনের একাগ্রতা লাভ হয়। যাঁহারা দ্বিজ অর্থাৎ সংস্কারের দ্বারা নবজন্ম লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা শুদ্ধ অর্থাৎ শিশুর মনের অন্ধকার নাশ করেন এবং যাঁহারা শ্রোত্র অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারা সকলেই আমাদের স্নেহের পথ নির্দেশ করিতে পারেন। আজকাল আমরা কোনরূপ আচার বা discipline-ই মানিয়া চলিতে চাই না কিন্তু সদাচারের সঙ্গে স্নেহ ও মনের স্বাস্থ্যের যোগ না থাকিলে মহামতি চরক এ বিষয়ের বিস্তৃত উপদেশ দিতেন না। আচার লইয়া বাড়াবাড়ি করাটাই দোষের, তবু দেখিতে হইবে, আচার পালন করিতে গিয়া যেন আমরা শুচিবায়ুগ্রস্ত না হই। (শুচিবায়ু বা Compulsion-neurosis এক-প্রকার মানসিক ব্যাধি।) তাই বলিয়া সদাচার বা শিষ্টাচারকে একেবারে বর্জন করিলে তো চলিবে না।

শৌচ অর্থাৎ দেহ ও মনের শুচিতা যে স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল, তাহা আজকাল বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আমাদের লক্ষ্য মনের শুচিতা বা পবিত্রতা, কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হইলে দেহকে পরিচ্ছন্ন ও কেশভূষা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। 'Cleanliness is next to godliness', এই ইংরেজি প্রবচনটী সম্পূর্ণ সত্য। আয়ুর্বেদে দেহকে শুচি রাখিবার জন্য নানা নির্দেশ আছে, যেমন প্রতিদিন দুইবার স্নানবাসন, জিহ্বাছোলা, কেশ, নখ, শ্মশ্রু প্রভৃতির ছেদন, মুখে তৈলমর্দন বারণ, অর্শ তৈলপ্রয়োগ, তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান প্রভৃতি। স্নানসম্পর্কে ঋষি চরকের নির্দেশ এই—

'পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং মলক্লেদসহং পরম্।
শরীরবলসন্ধানং স্নানমোজস্করং পরম্'।

স্নান পবিত্র, বলকারক, আয়ুষ্কর, ক্লান্তিনাশক, ঘর্ম ও মলনাশক, শরীরবলের সন্ধানকর ও অত্যন্ত ওজস্কর।

আর্জব অর্থাৎ মনের সরলতার সঙ্গেও দেহের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে। যাঁহারা সরল অর্থাৎ মন-মুখে এক, যাঁহারা অন্যের ক্ষতি করেন না, তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতই প্রসন্ন থাকে। চিত্ত যাঁহাদের প্রসন্ন, তাঁহারা স্বভাবত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক; তাঁহাদের বায়ু বা পিত্ত সহজে দূষিত হয় না বলিয়া তাঁহারা প্রায়ই সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হন।

ব্রহ্মচর্য কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা তাঁহাকেই বলি 'ব্রহ্মচারী' যিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করেন। ইন্দ্রিয়সংযম বা মনঃসংযমে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, তিনি ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। আবার বিষয়ভোগ করিতে হইলেও প্রথমে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, 'ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ'। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ বীর্য লাভ করে। এই ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের কি সম্পর্ক, সে কথা সকলেই জানেন। মহামতি বাগ্‌ভট বলেন, ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা মানুষ ওজোলাভ করে। মানুষের ওজঃধাতুই ওজো-রূপে পরিণত হয়। এই ওজঃ সম্পর্কে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—

'যস্য প্রযত্নতো দেহস্তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়ঃ।
স্বয়ম্মে নিরুজঃ নাশো ব্যাধিক্ষিপ্তেতি জীবনম্।
বিস্পষ্টহৃদয়ো ভাবো বিবিধা দেহসম্পদঃ।
উৎসাহঃ প্রতিভাধৈর্যমালস্যানুদ্ধতাবলা'।

ওজোধাতুর বৃদ্ধি হইলে দেহে তুষ্টি, পুষ্টি ও বল জন্মে, ইহার নাশে সর্বনাশ ঘটে, আর জীবন ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত। দেহসম্পদ বিভিন্ন ভাব, যেমন, উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য, নিরলস্য ও সৌকুমার্য ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়।

মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে অহিংস হয়, তখন

সে চিত্তের প্রশান্তি লাভ করে। ঋষি পতঞ্জলি বলেন, মানুষ যখন অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কোন প্রাণীই তাহাকে হিংসা করিতে পারে না। ঋষি চরক বলেন—'অহিংসা সর্বপ্রাণিনাং প্রাণপর্যন্তানামুপরমতঃ', অর্থাৎ, প্রাণিমাত্রের যাহা প্রাণধর্ম, অহিংসা তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অবশ্য চরক এ কথাও বলিয়াছেন যে 'মাংসো বৃহণানাম্', 'পুষ্টিকর দ্রব্যের মধ্যে মাংস জ্যেষ্ঠ', অথবা 'কুষ্ঠঘ্নো বলানাম্', তথাপি বৌদ্ধযুগে যে সকল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে মাংসের ব্যবহার ছিল না। যে মনীষী বলিয়াছেন, এককালে আমিষাশী ভারতবাসী জ্ঞানে বিজ্ঞানে নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি একেবারে মিথ্যা কথা বলেন নাই।

হিংসার মূলে আছে ক্রোধ বা দ্বেষ। এই দুইটি মনোগুণ হইতে উৎপন্ন। মনোগুণ হইতে শুধু দুঃখ জন্মে না, রোগও উৎপন্ন হয়। ক্রোধ বা দ্বেষ মানুষের মনের ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দেয়।

শারীর তপস্যার স্থান বাক্য ও মানস তপস্যাও যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায়।

বাক্য তপস্যা কি? যে বাক্যে পরের উদ্বেগ জন্মায় না, এমন কথা বলা, সত্য, প্রিয় ও হিতকর কথা বলা এবং প্রতিদিন নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ করা।

মানস তপস্যা কি? মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব (পরহিতৈষণা), মৌন, মনের নিরোধ ও ভাবসংশুদ্ধি। ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ বলেন 'ভাব' অর্থে অভিপ্রায়; সুতরাং 'ভাবসংশুদ্ধি' বলিতে বোঝায় 'অপরকে প্রতারণার চিন্তা হইতে বিরত থাকা'।

চরকের 'মনোবীক্ষণের' রূপ রেখা

কবিরাজ শ্রীকমল চৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ

এই পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় এই প্রবন্ধের যে অংশটী আরম্ভ হ'য়েছে তার পরবর্তী বক্তব্য উপস্থাপিত ক'রতে হ'লে অন্ততঃ 'সূত্র' ধরাতে কিছুটা পূর্ব কথা আবার উল্লেখ করতে হয়, নইলে 'খেই' হারাণ হ'য়ে পড়ে—

পূর্বে বলা হয়েছে মনোবহ স্রোত অসংখ্য, তাই তার ব্যাধিও অগণিত। কতক প্রত্যক্ষ, কতক অনুমান যুক্তিসাপেক্ষ, আর কতক আপ্তোপদেষ্টা ব্যক্তির প্রমাণ-সাপেক্ষ।

মনোবহ স্রোতের ব্যাধি অসংখ্য হ'লেও তাদের কারণ চারটি—(১) মোহ, (২) ইচ্ছা, (৩) দ্বেষ, (৪) কর্ম। এই চারটিতেই মনের প্রবৃত্তি অনুস্যূত হ'য়ে থাকে, এই চারটিই দূষিত এবং অভ্যাবপাতিত হ'লে অসংখ্য রূপধারণ করে। অর্থাৎ দূষিত মোহ, দূষিত ইচ্ছা, দূষিত দ্বেষ এবং দূষিত কর্ম হ'লেই অসংখ্য রূপ আর অসাধ্য ব্যাধি।

এইরূপ যদি অভ্যাবপাতিত মোহ, অভ্যাবপাতিত ইচ্ছা, অভ্যাবপাতিত দ্বেষ ও অভ্যাবপাতিত কর্ম হয়, তাতেও মনের অসংখ্য ব্যাধি হয়।

পূর্ব প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে একটীমাত্র প্রসঙ্গে কিছু জানাতে পেরেছি, অর্থাৎ দূষিত মোহ থেকে আবার কতগুলি সূক্ষ্ম বিকার হয় তাই নিয়ে। এই-খানেই চরক বলেছেন—

"তত্রাদিব ভ্রমমতি বিপুল আধাঃ

তৎযোগক্ষিপ্তয় সুকল: অবস্তত্ত্ব ইতিহাসে।"

(চরক-শারীর স্থান)

দমিত বোধ থেকে অহংকার, আসক্তি ইত্যাদি জন্ম গ্রহণ করে, আবার সেই দমিত বোধ আর অহংকার থেকে আর এক ধাপে এসে জাগে, বুদ্ধি ইত্যাদি বিকারের সম্ভাবনা ধারায়—এই পর্যন্ত একটি রূপরেখা টেনে পূর্ব প্রবন্ধের ক্রমশ পেয় টানা হয়েছে।

এবার সেই দমিত বোধজাত দ্বিতীয় রীপু "আসক্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে। এই আসক্তিটির শক্তি বড় বিপুল। জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও সুপ্ত মনের কোন কোণায় বা কোন স্তরে যে জীবের দেহ মনে জড়িয়ে রয়েছে একমাত্র মনোবিদ্ কবিরাজই নির্ণয় করতে পারবেন, অপরে নয়। চরক বলেছেন "নাস্তবর্গায় সং সমং" অর্থাৎ মুক্তির পথে 'আসক্তিই' চরম বাধা।

এই আসক্তিটি জীবের, বিশেষ করে মানবের সুপ্ত অসুপ্ত সকল প্রকার ভাবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অর্থাৎ দেহ,ধাতুসম সকল অণুরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সহজাত আসক্তিটি আমাদের সমাজের অত্যন্ত রীতি নীতিতে বাধা পেয়েই অর্থাৎ পারিবারিক শিক্ষা, গ্রাম্য বা নাগরিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, ভাল, অন্যায়, পাপ, পুণ্য, কর্তব্য,অকর্তব্য ইত্যাদি নানা বিবেক বুদ্ধির দ্বারে সেই আসক্তিটি প্রবাহিত করা হয় এবং সেই সহজাত আসক্তিটি নানা ভাবে নিজের পরিধিকে বিস্তৃত করে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে, কখনও নিগৃহীত হয়, কখনও বা অপরকে নিগৃহীত করে।

ফলে সেই আসক্তিটির পূর্ব পূর্ব ছাপগুলি মনের গভীর তলদেশে অর্থাৎ জ্ঞাত অজ্ঞাত, সুপ্ত স্তরে যেন চিরতরে তলিয়ে যায়। কিন্তু আসলে সেই ছাপগুলো কোন আসক্তিই নিঃশেষিত হয় না।

এগুলি জন্মকালে বা বিকাশের ফলে চারটি অবস্থা হয়। অর্থাৎ বিকাশ, স্থিতি, বিনষ্টমান ও নিষ্ক্রান্ত। চরক বলেছেন এই চারটি অবস্থাকে সত্ত্ব, রেজঃ, তমঃ ও কলি বলা হয়। অর্থাৎ ঠিক যেন যুগাবস্থার কাল। প্রতি যুগের তুলনায় আসক্তির বিকাশ, স্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা চলে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সেই দমিত আসক্তিটি যে কি ভাবে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে তা বিশ্লেষণ না করলে বলা পড়ে না। দমিত আসক্তিকে ফ্রয়েড বলেছেন repression।

সমাজজীবনে অপরের অর্থাৎ মাতা, পিতা, অভিভাবক প্রভৃতির শিক্ষা দীক্ষাই সহজাত আসক্তিকে দমিত করে। তাতে আসক্তিটি আন্দোলিত হয়—ঠিক যেন প্রহরীর অধীনে থাকা। প্রহরীর একটুকু বেচাল দেখলেই দমিত আসক্তি তার কাজ করে যায়। কখনও বা আঘাত সৃষ্টি করে। এর ফলে সহজাত আসক্তি নিজেই যেন চোর হয়ে যায়। ফলে শিক্ষা দীক্ষার আবরণ থেকে সেই সহজাত আসক্তিটি ক্রমে হৃদয়েরই চোরের স্থান দখল করে—একটু নির্জন,একটু প্রশ্রয়, একটু আস্কারা, একটু ক্ষমতার সুযোগ এলেই শিক্ষা দীক্ষার আবরণ ফেলে নিজের আসল মূর্তিটি অপরকে দেখায়, কখনও বা নিজে দেখে, কখনও বা মানে, কখনও মানে, কখনও সিদ্ধান্তে নিজেকে পরিপুষ্ট করে।

এ সম্বন্ধে চরক বলেছেন—"মনো বাক্-কায়-কর্মণাং আসঙ্গঃ পরিসঙ্খ্যায়ে। আসক্তিং দমিতা-সমাং ক্রিয়াং নাতিক্রমাং"। চরক—শারীর।

এই আসক্তি যদি শিক্ষা দীক্ষার বাধা না পায়, তবে তার অপ্রতিহত প্রকাশ থাকলে সে কি করতো তাতো পরবর্তী বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। চিকিৎসক মানসিক রোগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুঝতে পারেন সে বুঝি সুখীই হোতো। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির জন্য তার সত্য রূপ রেজঃ এবং তমঃ থেকে যে কলিয়ে

পরিণত হচ্ছে তা মানতে চায় না। কিন্তু আধির সহজাত আসক্তির ছাপ আজও মোছে নি, সে যেন শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে আবার নূতন করে আসক্তিটি বাসো বলে যেন মনে হাই পেয়েছে।

এই আসক্তিটি একজাতীয় রোগের কারণ হয়, সেই রোগটিকেও অনেক সময় সুখকর মনে হয়, তাকে পুষে রাখতে ইচ্ছা হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে যদি কোন নিবৃত্তি মার্গের সাধুর সাক্ষাৎ মেলে তবে তাঁর শিক্ষা দীক্ষায় ঐ সহজাত রক্তির আসক্তি ব্যাধির সুখের ওপর বিতৃষ্ণা মনে প্রায়শ্চিত্তের প্রবৃত্তি জাগে।

নিবৃত্তি মার্গের সাধুটি যেমন হলে তাঁর শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে সহজাত ও রক্তির আসক্তির ওপর পড়তে পারে সে নিদর্শন চরক বিশ্লেষণ আয়ীর স্থানের ১১ সূত্রের পর থেকে। সে সব কথা, সুযোগ এলে তার আলোচনা এখানে করা যাবে।

আপাতত এই পর্যন্ত বলা গেল, সহজাত আসক্তি যদি রক্তির হয়, তবে মোটামুটি তা কি কি রূপ ধারণ করতে পারে তার একটা ছক দিচ্ছি। চরকের নিকট নির্দেশের পথে গেলে আমরা পরবর্তী সংখ্যায় মন, আত্মা, কাম ও স্বর্গে রক্তির আসক্তির ব্যাধি ও তার রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ

চরক প্রশস্তি

Ayurveda Bijnan Parishad

52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

12th Annual Charaka Prasasti Day Celebration.

An Appeal

Kaviraj Bagala Kumar Majumder, Founder-President of the Perishad had issued, on May 31, 1062, the following appeal on the occasion of the 12th, Annual Charaka Prasasti Day celebration :

The 12th Annual Charaka Prasasti Day celebration will take place on Monday, June 4, 1962 at Students' Hall, Calcutta to remember the marvellous achievements of Maharshi Charaka in the field of Ayurveda as a pioneer Sage-Scientist. His charaka samhita is a landmark in the history of the development of the science of treatment. It is a reformed compilation of the Agnibesha Tantra with greater research and discovery—a testament of the principles of health and hygiene and fundamentals of science a masterpiece of trearment and a golden book of physical, mental and medicinal analysis and remedy for disorders, for all time to come. To speak the truth, it is a system of life indeed and not a system of treatment only.

The genius of Maharshi Charaka spread far into the domains of other shastras too, to bring out a complete treatise in all its bearings. He was not only a physician, a scientist and a philosopher but also a grammarian a iteratuer and a humanist parexcellence. To remember him is to understand and assimilate his matchless achievements for higher invention in the realm of thought and culture, science and art, above all progress of Ayurveda and humanity. Overwhelmed as we are with the modern advance of science and technology, it will be truly helpful and beneficial to mankind if we turn aside to focus our attention to the panorama of his world of thoughts and the technique of his conception of matter, mind and soul to achieve the perfection of man in all aspects. Let this celebration be an eye-opener to the thinking world and a lesson to our unwary countrymen in the choice of their life and light.

দ্বাদশ বার্ষিক চরক প্রশস্তি দিবস পালন

ইন্ডেক্স্ হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সোমবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ (৪ঠা জুন, ১৯৬২)

বিবরণী

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বিগত সোমবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ (৪ঠা জুন, ১৯৬২) কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত ইন্ডেক্স্ হলে দ্বাদশ বার্ষিক চরক প্রশস্তি দিবসের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখার্জি বৈদিক ও বেদোত্তর যুগে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ, বৌদ্ধ যুগে জীবক প্রভৃতি চিকিৎসকগণের বিস্ময়কর চিকিৎসা-নৈপুণ্য, মুঘল আমলের রাজকবিরাজ ধন্বন্তরি ও পাশ্চাত্য বেদমন্ত্রে আয়ুর্বেদ মেডিসিনের বিশদ প্রেরণা, তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের পঠন পাঠন, ছাত্রদের চরিত্রগঠন ও আয়ুর্বেদকে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রবর্তন, সর্বোপরি মহর্ষি চরকের অক্ষয় কীর্তি চরক সংহিতার শাশ্বত অবদান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সভার সম্ভাষণ জানাইয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্তগোকুমার মজুমদার মহর্ষি চরকের স্মরণোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, চরকের প্রশস্তি বিষয়ে তাঁহার মনীষা ও অনুসন্ধিৎসাশৈলীর অনুপ্রেরণা যেন ভাবী আয়ুর্বেদের বিজয়োৎসব আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। চরক শুধু আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানী ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন বৈয়াকরণিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও মানবহিতৈষী—তাই 'চরক সংহিতা' কেবলমাত্র একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ নহে, ইহা বেদ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ও সাধনার সংহি। এতৎসঙ্গে আমরা অস্ত্রিবেশতন্ত্রের প্রণেতা ঋষি অগ্নিবেশ ও মহাত্মা চুনারদত্তকেও স্মরণ করিতেছি। আশা করি, এই উৎসব সকলের চিত্তে চরকের নব জন্মের সূচনা করিবে অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীরণ করিবে, আংসাধনা ও গবেষণার পবিত্র ও নিস্বার্থ হোমানল প্রজ্বলিত করিয়া যোগক্ষেমী ও জনজীবী ধরিত্রীর বুকে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি, শান্তি ও স্বর্গের স্নিগ্ধ বিরোগ প্রবাহিত করিবে।

কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত বহুমূলার সভাপতির ভাষণে মহর্ষি চরকের বহুমুখী প্রতিভার বর্ণনা করেন। মহাকাব্যহিসাবে রামায়ণ ও মহাভারত যেমন সর্বকালের, চিকিৎসাগ্রন্থহিসাবে চরক-সংহিতাও সর্বকালের ও সর্বমানবের আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা যেন সকলের মধ্যে আপ্রাণ হয় তবেই এই উৎসব সফলতায় হইবে।

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী "বিশ্ব-সভ্যতায় চরকের অবদান" সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে চরকোক্তচিকিৎসানীতি, ঔষধ ও তদ্বোত্তরের সংগতি সাধন, ত্রিদোষের সমতা, দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় চরক ও বহুমূত্র সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, চরকের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এমন ছিল যে, ২০০০ বৎসর পূর্বে বহুমূত্রের অসাধ্য বলিয়া যে-সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা এখনও অভ্রান্ত। বর্তমান যুগের অধিক

সংযোগলব্ধির তুলনায় তাঁহার দৃষ্টি কালজয়ী। ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতির এই জন্মশতে আজ সকলে এই উৎসবকে সার্থক করুন, তিনি বলেন।

চরকের "ইন্দ্রিয়স্থানম্" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন কবিরাজ শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ।

কবিরাজ শ্রীঅমূল্যভূষণ রায়, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি ও মহর্ষি চরকের নামাঙ্কিত হইতে আলোচনা করেন। সভাপতি, উদ্বোধক ও উপস্থিত অন্যান্যদের মাল্যচন্দন প্রদানের পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

প্রারম্ভে বিগত শুক্রবার ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ সন্ধ্যায় কবিরাজ ও সাহিত্যিক রমেশ চন্দ্র সেনের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাংলা উপন্যাস ও গল্প লেখক এবং সাহিত্য সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতারূপে কবিরাজ সেনের কর্মবৈচিত্র্যের উল্লেখ করেন। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রীও কবিরাজ সেনের লিখিত কাঞ্চন, কুড়পাতা, নিজের বিষয় প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সাহিত্য প্রতিভারূপে তাঁহার অবদানের কথা বিবৃত করেন। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে এক মিনিটকাল সকলে দণ্ডায়মান থাকেন।

আধুনিক চরক সংহিতার অবদান

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী

আধুনিক চরক সংহিতা অভিনবসংস্কৃত, চরক প্রতিসংস্কৃত ও দৃঢ়বল পরপূরিত মহাগ্রন্থ। এইরূপ সুপ্রাচীন ও তথ্যবহুল গ্রন্থ আধুনিক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। চিকিৎসা গ্রন্থহিসাবে চরক সংহিতা অদ্যাপি সর্ববৃহৎ ও সর্বতথ্য সমন্বিত। ইহার স্থান সংখ্যা—৮, অধ্যায় সংখ্যা—১২০, শ্লোক সংখ্যা—দ্বাদশ সহস্র, পংক্তি সংখ্যা—২৪০১৪, ঋচি সংখ্যা—১৪ এবং পদ্য সংখ্যা ২১৬০৬৪, টীকাকার সংখ্যা—৪৫। ভারতের ১৪টি প্রধান ভাষা ছাড়া আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল প্রধান প্রধান ভাষায় মূল চরক সংহিতার অনুবাদ হইয়াছে। আরবী, ফার্সী, তিব্বতী, সেলভী, এবং চৈনিক ভাষায় অতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ পূর্বে আমেরিকাতে চরক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, চরক সংহিতার লিখিত পদ্ধতি অনুসারে জনসংখ্যার চিকিৎসা সুলভ হইলে পৃথিবীতে ঔষধব্যবহারকের সংখ্যা কম হইয়া যাইবে। ঐ ছাড়া বহুস্থানে বহুব্যক্তি চরক প্রশস্তি করিয়াছেন। স্থানাভাববশতঃ সেইগুলি লিখিত হইল না। পৃথিবীতে একমাত্র মহাকবি সেক্সপীয়ার ছাড়া অন্য কোন লেখকের সম্পর্কে এইরূপ প্রশস্তি করা হয় নাই বা কোন লেখকের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় টীকা টিপ্পনী, ভাষ্য, পঞ্জিকা, বার্তিক প্রভৃতি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক লিখিত হয় নাই। সংসারে মানুষকে মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইলে বিশেষতঃ নীরোগ, দীর্ঘায়ু অর্থাৎ সুস্থায়ু লাভ করিতে হইলে যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন, তৎসমুদয়

চরক সংহিতায় মানব সভ্যতার সেই সুদূর অতীত-কাল হইতে লিখিত হইয়াছে। শুধু চিকিৎসাগ্রন্থ হিসাবে নয়, মানুষের সর্বপ্রকার মানসিক উন্নতির জন্য যে কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা তৎসমুদয় চরক সংহিতায় লিখিত হইয়াছে। মানুষের ধর্ম, প্রাণ ও পরলোক চিন্তা বিষয়ে এরূপ সুলিখিত ও সুষ্ঠু উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে আর দ্বিতীয় নাই। এই সম্পর্কে চরক সংহিতার উপসংহারে মহামতি পুনর্বসুর লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি—

"যদত্র যাবদনাত্মজ্ঞো ন হি কিঞ্চিৎ সংহিতা।
সোঽধ্যেতুমশ্ন বিদ্বাংশ্চ ভিষগাতুরলক্ষণে সতি।
রোগাংশ্চেষ্টাঃ চিকিৎসাঞ্চ ন ভিন্দ্যাৎ ন বুধ্যতে।
চিকিৎসা বহ্নিবেশশ্চ সুখায়ুরহিতঃ প্রতি।
মতিরস্তি ভবেদ্ভক্তঃ—অন্যোক্তি ন হং কচিৎ।"

অর্থাৎ এই যাবদ নাত্মজ্ঞ (যে গ্রন্থে যাবদ সংজ্ঞক শ্লোক আছে) সংহিতা যাহার হৃদয়ে বর্তমান থাকে তিনি বিদ্বান ও চিকিৎসানুকূল হইয়া থাকেন। তিনি রোগ ও রোগের চিকিৎসা কেনই বা না বুঝিতে পারিবেন? সুস্থ ও রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চরক সংহিতাতে যাহা বলিয়াছেন অন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহা থাকিতে পারে; কিন্তু চরক সংহিতায় যাহা নাই তাহা অন্য তন্ত্রে নাই।

চরকের বৈদিক প্রকৃতি পূজার সার কথা অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত বিজ্ঞানের আদি কথা, অর্থাৎ ভারতের গঠন প্রণালীর পূর্ণ বিবরণ সাংখ্য ও তর্ক দর্শনের আদি কথা, ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগদর্শনের সার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইতে হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনানীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি সভ্যবদ্ধ মানুষের পক্ষে জ্ঞাতব্য সর্ববিষয়ের সকল উপদেশ চরক হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামত বা সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। পরন্তু ইহাতে বহু আপ্ত, ঋষি ও আয়ুর্বেদ গবেষকের সর্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং সর্বক্ষেত্রে চরক সিদ্ধান্ত অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে। চরক সিদ্ধান্ত অনুসারে মানব সভ্যতার আদিযুগে কথিত মনুষ্যের রোগের অসাধ্যত্ব বিষয়ে উক্তি অদ্যাপি অটল রহিয়াছে। চরক সংহিতার এই বিরাট স্বরূপের বিষয় উন্নতমান ভারতীয় জনগণ তথা বর্তমান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অবগত নহেন। অথবা অবগত হইলেও পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের প্রচারিত মতামতরূপ মিথ্যার দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বতে মাথা ঠুকিয়া মাথা কাটাইতে তাঁহারা রাজী নহেন। কারণ বর্তমানে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের দরবারে তাঁহারাই দলবদ্ধভাবে একচ্ছত্রাধিকারী। তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি সত্য কথা বলিবার শক্তি আধুনিক ভারতীয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ও অধ্যাপকগণের নাই। মিথ্যাকে মিথ্যারূপে জানিয়াও তাঁহারা স্বীয় নিজিত চর্বণ করিতেছেন ও ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছেন। জানি না, কবে কোন সময়ের নব অরুণালোকে পাশ্চাত্য প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদগণের প্রচারিত এই মিথ্যা মায়ার বিলোপ সাধন সম্ভব হইবে।

সর্ববিধ বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হিমালয়ের মত বিশাল ও মহাসমুদ্রের মত গভীর চরক সংহিতার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা এবং তদ্বিষয়ে অ্যাকাডেমী স্থাপন ব্রিটিশ স্থাপিত এবং পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সম্ভব না হইলেও আমাদের দুঃখের কোন কারণ ছিল না। কারণ, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচারে বদ্ধপরিকর বৃটিশ সরকারের পক্ষে আয়ুর্বেদের ন্যায় একটী সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বরোগসমষ্টির সম্পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাঙ্গীণ ব্যাপক প্রচারের পক্ষে বিরুদ্ধাচরণ করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের পক্ষে বিদেশী বৈজ্ঞানিক দরবারে

দেখাইবার মত একমাত্র বৈজ্ঞানিক আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানকে, বিশেষ করিয়া চরক সংহিতাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত মূলশিক্ষার পরিচয়ন, তাহাদের উদ্যোগে জন-সাধারণকে তাহার বিচার করিতে অনুরোধ করিয়া বিশ্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সার্বজনীন চরক সংহিতার উপলব্ধার করিয়েছি, এবং আশা করিয়েছি যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্য তালিকায় অন্যতম গ্রন্থ মহাসাগরের তুল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার চরক সংহিতার স্থান হইবে। বৃটিশস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাধুর্বেদের স্থান হইয়াছে, কিন্তু চরকসংহিতা হস্তে জ্ঞানপূর্ণ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের স্থান হয় নাই। ইহা চিন্তা করিলে দুঃখ ও লজ্জায় মন ভরিয়া উঠে। এবং বর্তমানে যাহারা শিক্ষার কর্ণধার তাহাদের দেশীয় কৃষ্টির প্রতি উদাসীনতার বিষয় চিন্তা করিলে মন অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়ে।

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর চরক প্রশস্তি দিবস পালিত হয়। এবার হরষে বৈশাখ, ১৩৬৯ বাংলা বার্ষিক চরক প্রশস্তি দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিষদে এখন ৫ টি চরক পাঠ চক্রও স্থাপিত হইয়াছে। —প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

চরক প্রশস্তি প্রবন্ধ

কবিরাজ শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী

বহু অতীতের ঘটনা, বোধ হয় ২০ হাজার বৎসর পূর্বেকার ঘটনা হইবে। দেশ নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণে বিপর্যস্ত হইতেছে, ঋষি মহর্ষিরাও আর জপ, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য, ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারাও পীড়িত হইয়া পড়িতেছেন—তখন জীবগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুণ্যভূমি ঋষিগণ হিমালয়ের পাদদেশে সমবেত উপত্যকার উপর একটি মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। তাহা ছাড়াও নিম্নলিখিত সুপণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণও উপস্থিত ছিলেন, যথা—অঙ্গিরা জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, সংখ্য, পুলস্ত, নারদ, অসিত, অসক্ত, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, আশ্বলায়ন, পরিক্ষি, ভিক্ষু, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কপিঞ্জল, বিশ্বামিত্র, আত্রেয়া ভার্গব, চ্যবন, অত্রিজিৎ, গর্গ, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, বাল্মি, দেবল, গালব, সাংকৃত্য, বৈজবাপি, ভূশিল, বাদরায়ন, ঘটিল, শরলোমা, কাপ্য, কাত্যায়ন কাত্যায়ন, কৌরুষেয়, মৌঞ্জ, বলি, কঙ্কণ অর্কব্যক্ত, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষ, পৌষ্কি, পৌনক, শাকুনেয়, বৈত্রেয়, বৈখরোমি এবং বৈখানস মুনিগণ, বালখিল্য মুনিগণ এবং অন্যান্য বহু মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সকল ঋষিগণই তখনকার ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহারাই বহু অতীতের এই ভারতবর্ষে বেতার দর্শন, বেতার শ্রবণ, নিরালম্ব যান গ্রহণ, নিরালম্ব গমন গ্রহণ এবং নিরালম্ব স্পর্শ গ্রহণের বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমার লিখিত "হিন্দুবর্ণ বা ভারতীয় বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থে ইহা আমি প্রচার করিয়াছি এবং ইহার বিজ্ঞানও সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তবে ভারতীয় বিজ্ঞান

ভারতবাসীর নিকট আজকাল অপাংক্তেয় হিসাবে সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না সুতরাং আর কি করা যাইবে!

আজকাল গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাওয়ার খুবই হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহা লইয়া খুবই ব্যস্ত। কিন্তু আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে ইহাও ভারতীয় বিজ্ঞান।

যাহা হউক, ঋষি মহর্ষিগণ সেই স্থানে সুযোগবিহীন হইয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের আরোগ্যই সাধনার মূল, আর রোগ সকল তাহার নাশকারক এবং ধর্ম জীবন ও পার্থিব জীবনের নাশকারক।

এই রোগের শান্তির উপায় কি হইবে এই বলিয়া তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। মাননীয় আয়ুর্বেদাচার্যগণ, আপনারা এই সমাধিক অট্টাস রোগের সর্বোচ্চ জ্ঞাতা বলিয়া অবগত হউন। পাতঞ্জল দর্শন ইহার লক্ষণ বলেন "তত্রেবার্থমাত্র-নির্ভাসস্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ অর্থাৎ সাধক যে বস্তু লইয়া সমাধিস্থ হইবেন তাঁহার ধ্যানজ্ঞানের সময়ে সেই বস্তুই উদ্ভাসিত হইবে, সাধকের তখন স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান ও থাকিবে না—ইহাই সমাধি।

আর আমরা চরক সংহিতার সূত্রস্থানের যেদোৎপত্তি অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে দেখিতে পাই যে এই সমস্ত সহস্রাধিক উগ্রতপা বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ ধ্যানজ্ঞানে ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং শুনিতে পাইলেন—"স ঋষি সংরোগাণাং ব্যবসেতারং প্রভুঃ" সেই ইন্দ্র আপনাদিগকে এই রোগ শান্তির উপায় বলিয়া দিবেন।

তবেই এখনে আপনারা দেখুন, সেই সমস্ত ঋষিগণ রোগ শান্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য সেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞানের সময়ে আলোক সম্পাত হইল এবং ঋষিগণ সেই আলোকে ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং শুনিতে পাইলেন ঐ ইন্দ্রই আপনাদিগকে রোগ শান্তির উপায় বলিয়া দিবেন। তবেই আপনারা দেখুন ঋষিগণের ধ্যানজ্ঞানের সময়ে দেবতার দর্শন এবং দেবতার শ্রবণ সংঘটিত হইল, ইহাই আর্ষ বিজ্ঞান।

এই আর্ষ বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে আমরা আর কোন উপায়েই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পূর্ব ঋষিদের ন্যায় জ্ঞানার্জন করিতে পারিব না। সুতরাং আমি "আয়ুর্বেদ সেবক সঙ্ঘ" নামক আমার সমিতি বিজ্ঞাপনে

১। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়,
২। আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়,
৩। ভারতীয় বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়

নামক তিনটি বিদ্যালয়ের জন্য চারশতাধিক লাভাংশ লোক সমাজে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এক্ষণে ভগবান ভরদ্বাজ—

বিধি সমস্ত নিরোগাং ধীন্দ্রিয়ায়ুঃ জিজ্ঞাসু।
যাবদ্গত সুখ শান্তিং সুখসিন্ধৌ নিমজ্জান্।
মন স্তিমিত মুদ্রসৌ ধীমনোঃ নিমাদৌ।
নিরুদ্ধমিব শান্তির্বঃ সমস্তোদ্ভূ ভূতঃ।

পরমেশ্বরের বিধানে এবং সময়ের বিবর্তনে আপনারা আর্ষ জাতির গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন এবং দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। প্রত্যুষকালে দৈব দিবাকর অন্ধকাররাশিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পূর্বাকাশে উদিত হইলে পূর্বদিকে লাভ করিয়া যেরূপ শান্তিলাভ করেন, আপনারাও তেমনি আর্ষ জাতির গৌরবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবেন।

ওঁ তৎ সৎ

* এই প্রবন্ধ বিগত সোমবার ২রা মে তারিখে, ১৯৬২ তারিখে যোগাযোগ টেলিভিশন হলে, (কলিকাতা) আমন্ত্রিত চরক প্রমুখ বিবিধ পদস্থ উপস্থিতে পঠিত।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

"ওঁতৎসৎ"

"মহর্ষি শ্রীশ্রীচরক-প্রশস্তি উপলক্ষে

"মহামতি চরক সম্বন্ধে প্রবন্ধ"

পণ্ডিত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শর্মা বৈদ্যশাস্ত্রী

স্থান—ইউনিভার্সিটি হল

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ (৪র্থা জুন, ১৯৬১)

ওঁনমঃ বিশ্বেষাং ঋষিভ্যঃ মূলেমূলে।
ত্রয়ীভূবে ত্রিনেত্রায় ত্রিলোকীগুরবে নমঃ।
সরস্বত্যৈঃ নমোনদ্যাঃ প্রণমামঃ পুণ্যকর্মভিঃ।
মুক্তিক্ষেত্রং নমস্যামঃ জলবত্যৈ চ বীক্ষতঃ।
ব্রহ্ম লক্ষ্মণি যেবেদ তত্ত্বজ্ঞে পূর্ণবপু।
ভরদ্বাজেন চরক প্রস্তুতিভ্যো নমোনমঃ।

সভাপতি মহোদয়, আয়ুর্বেদ সেবী সুধীবৃন্দ এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলী, মহামতি শ্রীশ্রীচরক-প্রশস্তির পুণ্য বাসরে এই অমল অনুষ্ঠান সম্ভার, তাঁহারই অমরীরী আত্মার আশীর্বাদ মস্তকে বরণ করিয়া এই পূত যজ্ঞ স্থলীতে দেহের অক্ষমতা হেতু উপস্থিত হইতে না পারিয়া মৎপরোনাস্তি ক্লেশ অনুভব করিতেছে। শুধু অধিকন্তু অবশ্য কর্তব্য বলিয়াই সাধারণভাবে "অজাতেলে গঙ্গা পূজার ন্যায়" সংক্ষেপে এই প্রবন্ধটি পাঠাইলাম। আশাকরি, এই অঙ্গের ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

আপনারা শ্রীমুখে এই পূত পুথিকে স্মরণ করেন, উহা আপনাদের উদারতা মাত্র। এই জন্য আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করি।

আয়ুর্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :—

আয়ুর্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে উহা স্বতঃই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, "মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্রভূমি এই ভারতবর্ষেই অনাদি সিদ্ধ অপৌরুষের বেদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, জীবের কল্যাণ হেতু, ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বিমল আয়ুর্বেদ বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা দেব ও ঋষির পরম্পরায় ক্রমে জগৎবাসীর কল্যাণের নিমিত্ত ভারতের মহামনা ঋষিবৃন্দ দেবলোক হইতে আহরণ করিয়া এই মর্ত্যলোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

এই আয়ুর্বেদের নির্মল জ্ঞান ধর্ম, অর্থ, কাম ও ও মোক্ষের সিদ্ধিস্বরূপ। গঙ্গা ও যমুনা ও সরস্বতী তিনটি ধারা যুক্ত হইয়া যেমন ত্রিবেণী সঙ্গম সৃষ্টি করিয়া জীবের মুক্তিক্ষেত্রের উদ্ভব করিয়াছিল, তদ্রূপ এই জগৎবাসী লোকহিতের আশি ব্যাধি নিরসন কামনায় ব্রহ্মাপ্রতিপাদ্য যোগসূত্রের সঙ্গে কায় ও শল্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ধারা অব্যাহতভাবে যুগপৎ যুক্ত রাখিয়া আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত করিয়া বৈদ্যাচার্য ঋষিবৃন্দ জীবের কল্যাণ কামনায় জগতে পরিবেশন করিয়াছিলেন।

সেই অনাদি সিদ্ধ অপৌরুষের আয়ুর্বেদ বিদ্যা, যাহা পরম্পরাক্রমে ঋষিদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং যে সংগৃহীত জ্ঞানরাশি কালবশে, যুগে যুগে বহু উত্থান পতনের মধ্যেও পূর্বাচার্য ঋষিগণ সঞ্চিত জ্ঞানরাশির ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বিশিষ্ট একজন মহামনা ঋষি - যিনি যুগ সন্ধিক্ষণে ধরণিয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত

থাকিয়া, আয়ুর্বেদকে গভীরভাবে ও বহুভাবে করিয়া এই জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিকাশ, প্রতিভা, জ্ঞানরশ্মি সূর্যরশ্মির মত চরকসংহিতা জগৎকে আলোকিত করিয়াছিল।

তাঁহার লেখনীপ্রসূত অমরবাণী সমস্ত জগতে আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অনন্ত মহাসাগরের মত সৌধমান রহিয়াছে। যে অমৃত ভাণ্ডার হইতে আজও বৈজ্ঞানিক সুধীবৃন্দ নিত্য নূতন বীজ-ধারা গ্রহণ করিয়া নব নব আবিষ্কার করিয়া "আয়ুর্বিজ্ঞান"কে সমৃদ্ধতর করিতেছেন, সেই ধীমান প্রাজ্ঞ, ঋষি প্রমাণ বিপ্রলিপ্সাবিহীন মহামতি ঋষি চরকাচার্যের পুণ্য স্মৃতিমন্দিরে, তাঁহারই অমরবাণী আত্মার প্রতি বিনম্র নিবেদন প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। আজ তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি বাসরে যথা সম্ভব তাঁহার বিষয় আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য মনে করি।

ঋষি চরক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পৌরাণিক উপাখ্যানটি "ভাব প্রকাশে" বর্ণিত আছে, যথা—

"যদা যজ্ঞাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদাশেষশ্চ তত্রৈব বেদঃ সাঙ্গোপবৃংহণঃ।
অথর্বাঙ্গিরসঃ সম্যগাথর্বৈরুক্ত লক্ষণম্।
একদা স মহীপৃষ্ঠং অটন্ চক্র ইবাগতঃ।
তত্র লোকান্ গদে গ্রস্তান্ ব্যাধয়া পরিপীড়িতান্।
ক্ষুদ্রেণ ক্ষয়বাতেন ক্ষিয়মানাংশ্চ পূরুষান্।
তান্ দৃষ্ট্বাভিদয়াযুক্ত ঋষিঃ।
অনন্তস্তিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্।
সঞ্চিন্ত্য স মহাঃ তত্র মুনেঃ পুত্রোঽজায়ত।
প্রসিদ্ধশ্চ বিতন্তশ্চ বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ।
যতস্তত্র ইবাত্মানো নজাতঃ কেন চিদ্যঃ।
তস্মাচ্চরক নামাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
লোকাতি চরকাচার্যো দেবাচার্যো যথা বিধি।
সমস্ত বচনস্যাসো বেদ ঋগো ভগবতঃ।
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্।
মুনয়োবরবৈদ্যেন কৃতং তং স্বং স্বতন্ত্রং
বেদাং তন্ত্রাণি সংকৃত্য সমাস্তরা বিপশ্চিতঃ।
তৎকেনাত্মোন্নাত্মা প্রদ্বেষেণ চরকাকৃতঃ।"

"যখন ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞাবতার হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব সাঙ্গবেদ অর্থাৎ বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ) এবং বেদোপবৃংহক সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে পৃথিবীর জনগণের অবস্থা দেখিবার জন্য ঋষি রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, ভূমণ্ডলের লোক সকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায় পীড়িত হইতেছে এবং নানাস্থানে মনুষ্যগণ অত্যন্ত ক্ষৈকষ্টিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। মানবমণ্ডলকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইলেন এবং কৃপাপরবশে ব্যাধি প্রশমনের উপায় চিন্তা করিয়া বেদবেদাঙ্গপারদর্শী সুপ্রসিদ্ধ এক মুনির পুত্ররূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন। ইনি যে "ঋষি" রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। অবতারে তাঁহার নাম "চরক" হইয়াছে।"

"আত্রেয় মুনির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণ নিজ নিজ নামে যে সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ধীমান, প্রাজ্ঞ ঋষি চরক মুনি সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এক তন্ত্রসন্ত্র সংস্কার সাধনপূর্বক জীবের কল্যাণোপযোগী করিয়া একখানি অপূর্ব বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অথর্ববেদের মধ্যে যাহা বীজাকারে রক্ষিত ছিল এবং প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা সযত্নে রোপিত করিয়া "আয়ুর্বেদরূপী সুবৃহৎ পাদপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে মহামনা "চরক" আবির্ভূত হইয়া সেই আয়ুর্বেদ বিটপীর মূলে ঘৃত

সঞ্জীবনী রস অমৃত সিঞ্চন করিয়া পত্র, পুষ্প, ফলে, সুশোভিত করিয়া এক মহান্, বিরাট আয়ুর্বেদ-বৃক্ষের উদ্ভব করিয়াছিলেন।" অদ্যাপি চিকিৎসা জগতে এই বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়াই ইহার সুস্বাদু অমৃত ফল যাবতীয়, আর্য্য, বৈজ্ঞানিক সুধীবৃন্দ ভক্ষণ করিয়া দেশ কালোপযোগী নূতন নূতন ঔষধাদির বাধির অনেক ঔষধ আবিষ্কার করিতেছেন।

চরক সংহিতা মহর্ষি অগ্নিবেশকৃত, চরক ঋষি ইহার প্রতি সংস্কর্তা। প্রতি সংস্কর্তার নামেই সংহিতার নাম প্রচলিত হইয়াছে। বেদার্থ অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিত হয়, তাহাকেই সংহিতা বলে। অথর্ববেদের উপাঙ্গে এই আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদকে অবলম্বন করিয়াই এই সংহিতা লিখিত, যথা

"তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমাগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা।
সংক্ষিপ্যাগ্নি বিস্তীর্ণং যেনেদানীং বিতন্যতে চ।
সংস্কর্ত্তা তুরকৃতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্।

"যিনি অগ্নি বিস্তৃত অংশ সংক্ষেপ ও লোপোক্ত অংশ বিস্তার করিয়া পুরাতন বিষয়সমূহ নূতন করেন, তাঁহাকে সংস্কর্তা বলে।"

"যেন যস্য নিবন্ধস্যাং সংহিতা সা প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ যেবাক্য দ্বারা নিবন্ধ বলিয়া সেই সমূদয় সংহিতা বলিয়া অভিহিত হয়।" বর্ত্তমানে প্রচলিত যে চরক সংহিতা আমরা পঠন পাঠন করি, তাহার সমগ্রাংশ মহামতি চরকের লিখিত সংহিতা নহে। প্রাচীন যুগের সেই বৃহৎ চরক সংহিতা দেশে নানা বিপর্যয়ের ফলে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ রচিত গ্রন্থের অতঃপর কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ মূল চরকের সূত্রস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া চিকিৎসিত স্থানের প্রথম অধ্যায় পর্যন্ত ইহা মহামতি চরক প্রতিসংস্কৃত অংশ।

তৎপরবর্ত্তীকালে, কপিলবলের পুত্র "দৃঢ়বলাচার্য" চিকিৎসিত স্থানের অবশিষ্টাংশ, কল্পস্থান এবং সিদ্ধিস্থানের পূরণাকাঙ্ক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরকগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। দৃঢ়বলাচার্যের সম্বন্ধে সিদ্ধিস্থানে তাঁহার নিজের লিখিত যে পরিচয়মাত্র আছে, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, "তিনি পঞ্চনদপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তপস্যাদ্বারা শঙ্কর মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বর প্রভাবে বর্ত্তিত চরকের অপ্রাপ্তাংশ নানাতন্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে পূরণ করিয়াছিলেন। তদ্যথা :—

"তন্ত্রস্যস্য কৃতপতিঃ সংপ্রদায় সমর্পিতম্। অথবার্থে দৃঢ়বলোজাতঃ পঞ্চনদপুরে কৃতা বহুতন্ত্রবেত্তা বিশেষাচ্ছ ঈশ্বরাৎ।" মহামতি দৃঢ়বলাচার্যের জন্ম যখন চরকের জ্ঞান আয়ত্তের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অসম্পূর্ণ চরক প্রাপ্তির পর অখণ্ড চরকের জ্ঞানোপলব্ধির জন্য উদ্বিগ্নচিত্তবান কৃতপতি শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রসাদে কৃতপতি শঙ্কর সুপ্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহারই আশীর্বাদে দৃঢ়বলের হৃদয়ে পরিপূরক শক্তির বিকাশ হইল এবং যথাযথভাবে মহামতি চরকের অনুকূল বিবাক্যানের মূলসূত্রেই চরকের অবশিষ্টাংশ একই ভাব ধারায় সংযোজিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ চরকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।"

চরকগ্রন্থ সম্বন্ধে কেবলমাত্র ইহা বলা চলে যে "ইহা আয়ুর্বেদ ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ, ইহা বৈদ্যক শাস্ত্র হইলেও বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের বহু তথ্য ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের জননীস্বরূপ এবং অন্যতম মূল কলেবর।

চরক সংহিতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে দৃঢ়বলাচার্য যাহা বলিয়াছেন তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

"চিকিৎসিতং বক্ষ্যিবেদ। যস্যায়ুর্ব হিতপ্রতি: যদি হ্যাতিবলকৃত যন্নোহাতি ন তৎ ভবিং।"

"অগ্নিবেশ। যদ্ ও আত্রেয়ের যে হিতকর চিকিৎসা উহাতে উক্ত হইল, তাহাই অক্ষত লক্ষিত হয়, ইহাতে যাহা নাই তাহা অক্ষত কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না।"

চরক সংহিতা পাঠ করিলে যে কীদৃশ ফল লাভ হয়, তাহাও ভূবলাচার্য লিখিয়াছেন। তদ্যথা– "একস্মিন্নপি অক্ষরে সাধুঃ লক্ষ্যতে মতিঃ। ন শাস্ত্র মক্ষরপ্রাপ্তং যুক্তিজ্ঞাং প্রযুঞ্জতে।"

"একমাত্র এই চরক শাস্ত্র অধ্যয়নে যাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাঁহার যুক্তি বিষয়ে এইরূপ অসাধারণ জ্ঞানলাভ হয় যে, অন্য শাস্ত্র দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য বোধ হয়।

"ঔষধমিদমরীঃ সমাগর্থান্ বিভূষতি যো বিমল প্রয়োগনিত্যঃ। সো মনুজঃ সুখ জীবিত প্রধানাদ্ ভবতি যুক্তি-স্মৃতি-সিদ্ধি-বুদ্ধি নিত্যঃ।

"যিনি এই চরক সংহিতা অধ্যয়নপূর্বক সম্যক রূপে পদার্থ সকল চিন্তা করেন, তিনি নির্দোষভাবে ঔষধাদির প্রয়োগে তৎপর হইয়া মানবকুলের সুখ ও জীবন প্রধানরূপে যুক্তি, স্মৃতি, বুদ্ধি এবং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।"

চরক সংহিতা—আটটী অধ্যায়ে বিভক্ত আছে.

যথা—সূত্র, নিদান, বিমান, শারীর, ইন্দ্রিয়, চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজনসাধক তাবদ্ বিধি ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সমূহ এই আটটী অধ্যায়ের মধ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত দার্শনিক ভিত্তির উপর চরকের চিকিৎসা বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার সাধ্যেয় ভিন্ন চরকের আলোচ্য বিষয় সমূহ সম্যক্ উপলব্ধি করা সুকঠিন। মহর্ষি চরকের প্রাদুর্ভাব সময় নিরূপণ

মহর্ষি চরক কোন্ সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সঠিক নির্ণয় করা অতি কঠিন। তবে তিনি যে অতি প্রাচীনকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার দুইটী সুদৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে।" "কণ্টেকাদুক" পাণিনিসূত্র এবং দ্বিতীয়ত মহাভাষ্যকার "পতঞ্জলি" যে চরকের একজন প্রতি সংস্কর্তা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

চক্রপাণি তাঁহার চরক টীকায় লিখিয়াছেন–

"পাতঞ্জল মহাভাষ্য চরক প্রতি সংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্ কায় দোষাণাং হন্ত্রে হরি পতয়ে নমঃ।"

পুনরায় নাগেশ ভট্টকৃত "লঘু শব্দেন্দুশেখর" পতঞ্জলি চরকের একজন প্রতি সংস্কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

"অহোস্বিদনয়ো রনুভবেন বক্তব্যত্ব কাংক্ষেন নিশ্চয়বান। রাত্রাবি বনয়পি নাস্তিবাবাদী যঃ স ইতি চরক—পতঞ্জলিঃ।"

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে বৈদ্যকে পারদর্শী ছিলেন তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে।" "শিবদাস" তাঁহার চক্রপাণি টীকায় পতঞ্জলিকে লোহ-শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভোজ তাঁহার রাজমার্তণ্ডে লিখিয়াছেন "যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।"

উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহা আধুনিক "চরক সংহিতা" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা অগ্নিবেশকৃত সংহিতা উহার প্রতি-সংস্কর্তা চরক ঋষি। চরকের প্রতিসংস্কর্তা "পতঞ্জলি" এবং পুরক ভূবলাচার্য।

যে অংশ চরক ও পতঞ্জলিদ্বারা প্রতিসংস্কৃত সে

অংশ খুব প্রাচীন এবং যে অংশ দৃঢ়বলকৃত সে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

চরকের প্রতিসংস্কর্তা যে পরিচয় এই মত বিশেষভাবে প্রচলিত না হইলেও ঐ বিষয়ে এত প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে উহা অস্বীকার করা যায় না।

চরক সংহিতা অনুশীলন করিলে ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে মহামতি চরক "প্রকৃতিসঙ্গত বনৌষধিসমূহ আহরণ করিয়া তাহার গুণাগুণ বিশ্লেষণপূর্বক অর্থাৎ রস, বিপাক, বীর্য নির্ণয়পূর্বক ব্যাধিভেদে অতি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

শুধু ভেষজতত্ত্বসম্বন্ধেই যে অভাবনীয় আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা নহে, বিভিন্ন ক্ষার, ধনিজাত ধাতব প্রভৃতিরও প্রয়োগবিধি আমরা চরকের ভিতর দেখিতে পাই। যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার এই দুই ক্ষার তখন আবিষ্কার হইয়াছিল। পক্ষ লবণ, ঘনঃশিলা, হরিতাল, কাসীস রসাঞ্জন প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ঔষধে ব্যবহার হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য, যজ্ঞ, সীসা প্রভৃতি গলাইয়া যে মূর্তি হইতে পারে তাহাও আবিষ্কার হইয়াছিল। অনেকের মত এই যে, চরকে ধাতুর আভ্যন্তর প্রয়োগ নাই। এমত সমীচীন নহে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায় লৌহ ও প্রবাল অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রয়োগ হইলে অম্লপ্তী ও শর্করা নষ্ট হয়।

"পুনর্নবায়োরজনী যবক্ষৌ কন্ত প্রবালস্তবর্ণপুষ্পাঃ।
ক্ষীরাদ্বয়েনাক্ষয়ুতৈঃ সুপিষ্টৈঃপেয়ঃ জবেলস্যরিমর্করায়ৈ।"

পুনর্নবা, দৌহভস্ম, হরিদ্রা, যোয়ান, যজ্ঞ ডুমুরের ফল, প্রবাল ও ঈশ্বর মূল, ইক্ষু ফল, যব ও ইক্ষু রসের সহিত উত্তম করিয়া পেষণপূর্বক পান করিলে অম্লপ্তী ও শর্করা নষ্ট হয়। চরক, চিঃ ২৯ অ ৪৬ শ্লোঃ) স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের ব্যবহার—বিষ চিকিৎসায় শুদ্ধ তাম্রের চূর্ণ ব্যবহার করিয়া পরে স্বর্ণ ব্যবহার করিবে।

"তাম্রবিত্তাবসমাত্ত প্রদদ্যাদ্বয়নঃ ভিষক্।
সুক্ষ্ম তাম্ররজ ক্ষৌদ্রৈঃ সর্পিষোপনয়ম্।
শুদ্ধে হৃদি ততঃ শালঃ রেমন্তুর্বস্তমাপয়েৎ।
রেফ সর্ববিষঘ্নাত্ত পরাদ্ধে বিনিবর্ত্ততি।
রেফপক্ত ন তত্রাস্তে ন হি পক্তে ভয়ুর্বিষম্।"

চরক—চিঃ—২৪ অঃ ১৮, ৬, ১৮৭ শ্লোঃ

"মুক্তা প্রবাল বৈদূর্য শঙ্খ স্ফটিক রজতম্।
ন সার মন্ডকা চার্দ্ধ সুক্তৈলা লবণত্রয়ম্।
তাম্রারোরজনী রূপ্যাঃ সলৌহক্ষিতিরেবচ।
ত্রিফলা শালক কাশক লৌহ্য ধাত্ত্ব নিবর্হন্তি॥"

চরক চিঃ ২১ অঃ

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখনকালে বিশেষভাবে ধাতুসমূহের ভারম্ব মারণ ক্রিয়ার আবিষ্কার না হইলেও ধাতুসমূহের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ সূচনাই পরবর্তী কালের রস বিজ্ঞানের বীজ মহামতি চরকই প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান মহামতি চরক ঋষি চিকিৎসা কার্যের সৌকর্যার্থ আয়ুর্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। চরকের সূত্রস্থানে দশ মহাশূলীয় ৩০ অঃ, ১৬ শ্লোকে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাই, যথা—"কায় চিকিৎসা শালাক্যঃ শল্যাহর্তৃকং বিষগর-বৈরোধিকপ্রশমনং ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যকঃ রসায়নানি বাজীকরণ মিতি।"

(১) কায় চিকিৎসা—ভেষজসাধ্য সর্বকায়িক চিকিৎসা (Practice of Medicine)

(২) শালাক্যতন্ত্র—চক্ষু, নাসা, কর্ণ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ অঙ্গসমূহের রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা।

৩) শল্যতন্ত্র—যন্ত্র, শস্ত্রসাধ্য রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা (Surgery & Midwifery)

(৪) অগদতন্ত্র—সর্পের প্রভৃতি সকল প্রকার বিষের পরিজ্ঞান ও চিকিৎসা।

(৫) ভূতবিদ্যা—মানস রোগ চিকিৎসা।

(৬) কৌমার ভৃত্য—শিশুপালন বিধি ও শিশু চিকিৎসা।

(৭) রসায়নতন্ত্র বা জরাব্যাধি পীড়িত জীর্ণ শীর্ণ লোকের পুনরায় বয়োস্থাপনের চিকিৎসা।

(৮) বাজীকরণ তন্ত্র—বিবাহিত জীবনে যৌন-অক্ষম প্রতিষেধক উপায় সমূহ এবং ক্লীবত্বক লোকের চিকিৎসা।

শেষোক্ত বাজীকরণ চিকিৎসা ব্যবস্থা অতি দিন হইল ইউরোপে আবিষ্কার হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে যেমন বিশেষজ্ঞ (Specialist) দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বকালে আয়ুর্বেদেও সেইরূপ "বিশেষজ্ঞ" চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা "কায়-চিকিৎসক" (Physician), শল্যবাহিক (Surgeon), শলাকী চিকিৎসক (Specialist in eye, Ear, Nase & Throat Disease), অগদতান্ত্রিক বা বিষবৈদ্য (Pokicologist) প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। আয়ুর্বেদের এই সকল পৃথক পৃথক অঙ্গের ক্রমোন্নতি সেকালে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল এবং প্রত্যেক অঙ্গের ৮।১০ খানি করিয়া সংহিতা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। এইরূপ ৫০।৬০ খানি গ্রন্থের নাম ও পাঠোদ্ধার ৭৮ বৎসর পূর্বে রচিত টীকাগ্রন্থ গুলিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, ঐ সকল মূল গ্রন্থের অধিকাংশ এখনও দাহ্যাগ্নিপ্রভৃতি নানা কারণে বিলুপ্ত। চরক, সুশ্রুত বাগ্‌ভটের যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ প্রাচীন সংহিতাগুলির প্রতিসংস্কার বা সংগ্রহমাত্র।

চরকের চিকিৎসা প্রণালী—

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, শারীর বিদ্যা না শিখিয়া চিকিৎসা করা চলিবে না। এই শারীর বিদ্যা যে শল্যবাহিককেই শিখিতে হইত তাহা নহে, কায় চিকিৎসককেও এই শারীরবিদ্যা সম্যক শিক্ষণীয় ছিল। সেই জন্য চরক বলিয়াছেন: "শারীর সর্বজ্ঞ সর্ব সর্বজ্ঞা যেন যো ভিষক্। আয়ুর্বেদ সংবৎসরেণ যেন লোকেন্দ্রপূজ্যতে।" অর্থাৎ "যিনি সম্যক শারীর বিদ্যা সকল প্রকারে জানিয়াছেন এবং শারীর বিদ্যার সকল কথা যাহার বুদ্ধিগোচর, তিনিই আয়ুর্বেদে সম্পূর্ণ জ্ঞান-সম্পন্ন।"

প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদের শারীর বিদ্যা কতদূর উন্নত হইয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া (circulation of Blood) সম্বন্ধে চরক স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে "ধমনীগুলির দ্বারা ক্রিয়া প্রবাহিত রক্ত সর্ব শরীরে সঞ্চালন করিয়া হৃদয়েই ফিরিয়া যায় এবং গর্ভস্থ শিশুর রক্ত প্রবাহ মাতার হৃদয়ে ফিরিয়া যায় এবং সেখান হইতে পুনরায় গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দুই হাজার বৎসর পূর্বে চরক যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই কথা Sir William Harvey কর্তৃক ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কার হইলে সে সময়ে চিকিৎসক মণ্ডলী তাঁহাকে নিতান্ত উপহাস ও "এক ঘরে" করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার মূলসূত্র—ত্রিদোষবাদ, অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সর্বদেহ-ব্যাপিয়া সম্বন্ধে আবিষ্কারও প্রাচীন আয়ুর্বেদকর্তৃর একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই মৌলিক সিদ্ধান্তের উপরই আয়ুর্বেদের তাবৎ চিকিৎসাবিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূলসূত্র ও বিশেষত্ব এই "আয়ুর্বেদো মমমতি যাজ্ঞ ব্যাধি অপোহতি চ। সাত্মিকা সমুদয় ব্যাধি প্রশমায় সুখীভবেৎ।" অর্থাৎ যাহা প্রকৃত ব্যাধির উপশম করে এবং নূতন ব্যাধির

সৃষ্টি করেনা, তাহাই উপযুক্ত চিকিৎসা। যাহা ব্যাধি উপশম করিতে যাইয়া নূতন ব্যাধি সৃষ্টি করে তাহা সুচিকিৎসা নহে। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য এলোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যাধি-বিপরীত চিকিৎসা হওয়ায় সাময়িকভাবে ব্যাধি বিদলনের জন্য তাঁহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রসূত নানাবিধ কেমিক্যাল ইনজেকশন্ দ্বারা তাঁহারা কত নূতন নূতন ব্যাধি সৃষ্টি করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

চরক সংহিতার বিমানস্থানে প্রত্যক্ষের মূল পরীক্ষার বিষয়েও বিশেষ পর্যালোচনা করিয়াছেন. যথা –

প্রত্যক্ষতস্তু খলু রোগহরং বুদ্ধ্যুপ্রঃ সর্বেন্দ্রিয়ৈরাপ্তোপদেশানুমানযুক্তৈঃ পরীক্ষেতাস্যেত রূপং জানীয়াৎ। তদ্যথা –অন্নকুজনং লঙ্ঘিতোষ্ঠদন্তজিহ্বং পর্যগ্নিমেহাক্ষি যে চাস্যেহপি কেচিদ্রূপবিরোপসর্গাঃ শব্দাংস্তানুস্মান রোগেণ পরীক্ষেত। স্পর্শনে প্রমাণদ্বারা শরীরপ্রকৃতি বিকারৌ চক্ষুর্বৈষয়িকানি চাস্যানি কার্যিচিত্তানি চক্ষুষা পরীক্ষেত। রসনে ঘ্রাণেন শরীরগত বিশ্লিষ্ট বৈষয়িক প্রমাণমুপলভেত রোগ অবসর্পেচ্চ। নখদন্ত প্রত্যক্ষেণ প্রকৃত মূত্রপুরীষত্বক্ষ্মাদীনাঞ্চ পরিপ্রশ্নেনোপযুক্তমুপলভেত। বিশ্বাসে মূত্রাপসর্জনেন তন্ত্র শরীর বৈগুণ্যং মানসিকোপদর্শনেন শরীর মানুষম্ ইত্যাদি---"

চরকের কল্পনায় চরকের মত, অতি উদার ও সুন্দর প্রণালী ছিল। মহামতি চরক বলেন - "তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।

"সঃ ভৈষ ভিষগ্যো হ্যেকং রোগমেতো যঃ প্রয়োচয়েৎ।" অর্থাৎ –তাহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ যাহা আরোগ্যপ্রদ এবং পরে অন্য কোন ব্যাধির উৎপন্ন করেনা এবং তিনিই উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, যিনি নিদানজ্ঞ হইয়া আতুরকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন।"

চরকোক্ত –মনোযথি সমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই এই উপলব্ধি হয় যে প্রায় সাধ্য রোগেরই চিকিৎসা প্রকৃতিসাধ্য মনোযথি সমূহ আহরণ করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে রস, বিপাক, বীর্য প্রভৃতি বিশ্লেষণান্তর প্রধানসমূহের গুণাগুণ ও রোগ-ভেদে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে বৈদ্যোত্তমগণ তাহাকেই ভেদ্য করিয়া বিস্তারিতভাবে গুণাগুণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

অতি আধুনিক কালেও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যে সমস্ত নূতন নূতন রোগ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নূতন নামে রোগসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেও আয়ুর্বেদের চরক, সুশ্রুত, ভেল সংহিতা, মাধবই প্রভৃতি আচার্যগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে (সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে) যে সব তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা যদি আমরা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা কালের কালের প্রকৃতি অনুসারে যে সব ব্যাধি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা তাহাদেরও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন

মহামতি চরক বলিয়াছেন যে "বিকার নামা কুষ্ঠলো ন কিঞ্চীদপি কদাচন ন চি সর্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুব স্থিতিঃ।"

অর্থাৎ "চিকিৎসক রোগের নামকরণে অসমর্থ হইলে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ সর্বরোগের নাম নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না।" উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক সময় দেশে কালাজ্বরের বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল, তখন বিশেষজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী এবং ইউরোপীয় ডাক্তার যুর সাহেব উহারই গবেষণা করিয়া কালাজ্বর সম্বন্ধে যে বাণি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং আমাদের দেশীয় ডাক্তার ব্রহ্মচারী গবেষণা ভেষজ হইতে ইনজেকশন্ তৈয়ার করেন এ

উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ প্রচুর ফল লাভ হয়। এই রোগের ব্যাপকতায় বৈদ্যক শাস্ত্র বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যেন যে চরকগ্রন্থের সূত্রস্থান সপ্তদশ অধ্যায়, ২১শ, ৪র্থ অধ্যায় ও ২৮শ অধ্যায়, চিকিৎসিত স্থান ৩য় অধ্যায় এবং বাতব্যাধি অধিকার ২৮ অধ্যায়ে অতি বিশদভাবে কালান্তরের যে সব উৎপত্তির কারণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিপীত আছে, তাহার সমস্তই উহাতে বর্ণনা ও চিকিৎসা পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে গ্রন্থের পণ্ডিত প্রবর ৺রামময় ন্যায়রত্ন পদনাথ সেন শর্মা সরস্বতী এম. এ মহোদয় তৎ প্রণীত 'সিদ্ধান্ত নিদানম্' গ্রন্থে পূর্বাচার্যগণের ভাবধারা এবং পাশ্চাত্য মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অতি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা – সপ্তদশ শতকের শেষে "ওলাউঠা" সংজ্ঞায়—অভিহিত করিয়াছেন - বাক্-বলাসক আর "বেরীবেরী রোগ, কেহুয়ার ওলাওঠা, ব্রেন রোগ-অথ-এণ্ড্রিক আর ইত্যাদি।

বর্তমানেও বিশেষ ২ নাম করা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগের নামকরণ করিতে না পারিয়া স্পষ্ট বলিয়া থাকেন যে রোগীর "এলার্জি" হইয়াছে। অথচ এলার্জি কথাটা প্রায় "অজ্ঞ ভিষেরই মত"।

"সকল শাস্ত্রের বিদ্যা" অপার রত্নাকরের তুল্য। যাহারা মুমুক্ষু মুমুক্ষু, তাঁহারাই এই মহোদধি হইতে "মনস্তরি" প্রায় অমৃত মুক্ত নিয়া উপরে উঠিতে সমর্থ হন। তাহের সুতীক্ষ্ণ বিচার, বেহার্য বর্ণন সমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যতই আমরা করি না কেন, যদি শাস্ত্র সমাহিত চিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবিদেহিত জ্ঞানকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস না করি তবে যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করা কঠিন, ইহা বাস্তব সত্য।

আমি অত্যন্ত অক্ষম, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের জন্য আপনারা আদেশ করিয়াছেন, তথাপি এই মহান শক্তির পুরুষের উপর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যাহাতে তাহা বাচালতা করিলাম। আমি বাতব্যাধিগ্রস্ত দৃষ্টিশক্তিহীন, বর্তমানে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় আছি। কিন্তু আয়ুর্বেদের বর্তমান দারুণ দুর্দিনের ব্যথিত আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে দারুণ দুর্বিপাকের মধ্যে আপনারা ইহাকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। শ্রীশ্রীজগদম্বার শুভ আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। আয়ুর্বেদের সাধনা যেন আপনাদের কর্ম প্রবাহের মধ্য দিয়া সিদ্ধি লাভ করে, শ্রীশ্রীজগদম্বা সমীপে এই প্রার্থনা।

ॐ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥"

ॐ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ফোন—২৬-৪০৩১

রাজ বৈদ্য ডক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

হজম শক্তি, কর্ম শক্তি, স্মৃতি ও রক্ত বর্ধক

মেষ্ট টনিক—৪৲ আনা।

রাজ বৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যকৃৎ প্লীহাক

বৈদ্যাচার্য কবিরাজ শ্রীঅমলা চরণ সেন বিদ্যাবাচস্পতি, কবিরত্ন

মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ সুধীমণ্ডলী,

আপনারা বোধ হয় জানেন যকৃৎ ও প্লীহা বিভাগের সভাপতি আমাকে করা হইয়াছে। এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের উপর অর্পণ করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম; যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারায় অবশেষে উহা গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু একজন আয়ুর্বেদের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি আজ ৫০ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সম্মেলন ও প্রদর্শনী পরিচালনা করিতেছেন এবং এযাবৎ বহু মনীষী এই সমস্ত সম্মেলনে যে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন এবং প্রদর্শনীতে মূল্যবান দ্রব্যসমূহ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি সেজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। তদুপরি সমীপে প্রার্থনা-বসন্ত বাবু দীর্ঘ জীবী হইয়া আয়ুর্বেদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করুন।

অবশেষে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই, যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি তাহাতে কোনো দোষ ত্রুটী যাহা থাকিবে আপনারা উহা সংশোধন করিয়া লইবেন এবং তজ্জন্য ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

'যকৃৎ ও প্লীহা'

বিষাক্ত ও অসাধ্য দ্রব্য ভোজনে রক্ত বাহিত যকৃৎ ও কফ দূষিত হইয়া প্লীহা উদরের বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি পায়, ইহাতে রোগী অল্প অল্পাগ্নি হস্তপদীনতা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যথা "বিদাহ্যন্নবিষ্টাম্ভঃ-করক্ত জন্যোঃ প্রহীমোরাশয়স্থ কফস্যপ্লীহাভিবৃদ্ধিঃ মূলকঃ প্রবৃদ্ধো প্লীহোপমেয়স্তস্যৈব বলিনি তথায় পার্শ্বে পরিবৃদ্ধি রেতি"—যেরূপ উদরের বাম পার্শ্বে প্লীহা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ উপরোক্ত বিদাহী দ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহারে উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্লীহা সম্বন্ধে আরও কিছু পরে বলিব।

পূর্বে যকৃৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়েছি—যকৃতের প্রধান ক্রিয়া পিত্তোৎসেক সৃষ্টি। যকৃৎ কোষের মধ্যে নিরন্তর যে পাক ক্রিয়া চলিতেছে তাহার ফলে পিত্তোৎসেকের (Bile) সৃষ্টি হয়। ইহা ঈষৎ রক্তাভ পীতবর্ণ এক প্রকার তরল পদার্থ, স্বাদে অতিশয় তিক্ত। এই পিত্ত অনবরত যকৃৎ হইতে গ্রহণী নাড়ীতে আসে, গ্রহণীতে যখন খাদ্য পরিপাক হয় এই পিত্তের মাত্রা তখন বৃদ্ধি পায়।

অপর সময়ে এই পিত্ত যকৃৎ সংলগ্ন পিত্তকোষে (Gall Bladders) সঞ্চিত হয়। ২৪ ঘণ্টায় প্রায় দেড় সের পিত্ত যকৃৎ হইতে ক্ষরিত হয়, যকৃতে রক্তের যে পাক হয় পিত্তোৎসেকই তাহারই ফল-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

আয়ুর্বেদ পিত্তকে রক্তের মল বলে, রক্তের লোহিত কণিকা হইতেই এই পিত্তের বর্ণের উৎপত্তি, উহাকে রঞ্জক পিত্ত বলা হয়। পিত্ত নলিকা দিয়া পিত্তোৎসেক গ্রহণীতে আসিয়া পড়ে, কিন্তু গ্রহণীতে পড়িবার পূর্বে উহা অগ্ন্যাশয় (Pancreas) হইতে ক্ষরিত অগ্ন্যুৎসেকের সহিত যুক্ত হয়, মিলিত অগ্ন্যুৎসেক

(Pancreatic Secretion) পিত্তোপসেচকের আমরা পাচকপিত্ত বলি।

যকৃৎ কোষের ক্রিয়া দ্বারা যেমন মূত্র বর্ণ উৎপন্ন হয় সেইরূপ মূত্রীয় (urea) নামক পদার্থ ও উৎপন্ন হয়। সুতরাং যকৃৎই মূত্রীয়োৎপত্তির প্রধান স্থান। সেখান হইতে উহা বৃক্ক (Kidney) দ্বারা এবং পরে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়। খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন থাকিলে মূত্রেও অধিক পরিমাণে মূত্রীয় নির্গত হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যায়াম করিলে উহার কিছু অংশ ঘর্ম্ম দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, বাকী অংশ রক্তে সঞ্চিত হয় এবং যাহাতে যে পরিশ্রম করিবার সময় পর্য্যন্ত পরিণত হইয়া কষ্ট দিতে থাকে। মাংসপেশীগুলি চালনার ফলে পর্য্যন্ত অঙ্গারায় বাষ্প ও জলে পরিণত হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যদি অতিরিক্ত আহার করা যায় অথচ কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকা যায় তবে শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত মধুর রস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া যকৃতে সঞ্চিত হইবে এবং যকৃত কোষগুলিকে জড় করিয়া ফেলিবে, ফলে নানারকম রোগের সৃষ্টি হইবে। যাহারা এরূপ অতিরিক্ত খাদ্য ও অহিত আহার নিয়মিত করে, তাহারাই যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া যকৃৎপ্লীহদোষ, রক্তহীনতা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থা প্রতিকারের জন্য প্রথমেই কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করাইয়া রোগীর সঞ্চিত কোষগুলিকে বহিষ্কৃত করিয়া যকৃৎকে হালকা করিতে হইবে, এবং পরে লঘু পথ্য ও পরিমিত ব্যায়াম ও নবায়স, লোহাসব ইত্যাদি, পঞ্চামৃত লৌহ, কলত্রিকাদি পাচন প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা স্থায়ী ব্যাধির আরোগ্য করিতে হইবে। অতএব দেখা যায় যে, যকৃতে শরীরোপযোগী অনেকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্য উৎপন্ন হয়—

(১) ইহা রক্তের উৎপত্তি স্থান, (২) ইহা হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয়, (৩) ইহাতে মধুরেস সঞ্চিত হয়, (৪) এখানে শ্বেত পদার্থ উৎপন্ন হয়, (৫) এই স্থানে মূত্রীয় উৎপন্ন হয়। সব সময়েই যকৃৎ বড় হয়, কিন্তু হাতে না ঠেকিয়ে পারে—১ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত যকৃৎ বড় হইতে দেখা গিয়াছে।

প্লীহার ক্রিয়া

প্লীহা বৃদ্ধির কারণ প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এন্থ্রিক্স কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বরে বেশী দিন ভুগিলে প্লীহা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কালাজ্বরের সব সময়েই প্লীহা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ হইতে একটু অনুভব হয়, দুই মাসের ভিতর এক ইঞ্চি বড় হয় ও ৩ মাসে প্রায় দুই ইঞ্চি বড় হয়। ক্রমশঃ ইহা নাভী বা তাহার নীচ পর্য্যন্ত যায়। পুরাতন ম্যালেরিয়ায় প্লীহা কাঠের মত শক্ত থেকে, কিন্তু কালাজ্বরের প্লীহা নরম হয় ও হাতে চাপ দিলে ডুবিয়া যায়। প্রায়ই এ রোগে প্লীহাবরণে যন্ত্রণা হয়—যাহাকে প্লীহা কামড়ান বলে, প্লীহার রক্তের সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নে প্লীহার কয়েকটী ক্রিয়া সম্বন্ধে বলিতেছি।

গর্ভাবস্থায় এবং গর্ভের পরেও যে প্লীহায় রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় এবং ইহা যে রক্তের অন্যতম প্রধান আধার তাহা সকলেই জানেন। শ্বেত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হইবার সর্বপ্রধান স্থান প্লীহা।

রক্ত কণিকা ক্ষয় ও লৌহ সঞ্চয়—প্লীহায় লোহিত রক্ত কণিকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, লোহিত কণিকায় শোণিত গুটিকা (Haemoglobin) বলিয়া এক প্রকার বর্ণক পদার্থ থাকে। আহারের সঙ্গে যতগুলির এই শোণিত গুটিকাতেই লৌহ থাকে, শরীরের অন্য কোন অংশে লৌহ ধাতু থাকে না। প্লীহার ম্যালপিঘিতে যে পাকক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহার দ্বারা সঞ্চার

লোহিত রক্তকণিকা বর্ধিত হয় এবং রক্তকণাস্থিত লৌহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্লীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ হইতে লৌহ শোষিত হয়। শরীরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহা রক্ত স্রোতে মিলিত হয়, বাকী অংশ মলমূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। গর্ভস্থ শিশু মাতার আহারকাল হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ গ্রহণ করে এবং লৌহ তাহার দেহে সঞ্চিত থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর যতদিন শিশু কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করে ততদিন ঐ সঞ্চিত লৌহ ব্যয়িত হয়, এবং তাহার দেহের লৌহভাগ অনেক কমিয়া যায়, কারণ দুগ্ধে লৌহ একেবারে নাই। পরে শিশু যখন অন্যান্য খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে তখন আবার তাহার দেহের মাত্রা বাড়ে।

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের দ্বিংশতম বার্ষিক অধিবেশনের (১৩৪৮) মূল-সভার সভাপতি কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেনের অভিভাষণ।

সংস্কৃতি বিভাগঃ

ভারতীয় সংস্কৃতিঃ*

অধ্যাপকস্য শ্রীবিজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যস্য শাস্ত্রিণঃ

মাননীয়াঃ সভাপতিমহোদয়াঃ, মাননীয়াঃ বৈদ্যবন্ধবঃসদাঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশারদাঃ, মাননীয়াঃ অধ্যাপকবর্যাঃ সামাজিকবর্যাশ্চ—

এবমহরহরেতো বিলোকুং ন্ত। অভিপ্রপদ্যহিতা পরিষদিয়ম্। নন্ত খলু আয়ুর্বেদবিজ্ঞান পরিষদঃ দ্বিশততমে বার্ষিকাধিবেশনে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে ভারতীয় সাংস্কৃতিমধিকৃত্য কাঞ্চিৎ কথাং বক্তুমারোঢ়ুমি। অধিকন্তু যে খলু বক্তব্যা তং সাবধানা অর্থে কৃপা কৃপাঃ শুশ্রূষু জন ভবন্তঃ ইতি প্রার্থয়ে।

সাম্প্রতং হি অস্মাকীয়ে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতিরধিকৃত্য অধিষ্ঠিতানাং সভানামধিক্যং পরিলক্ষ্যতে। এতেন ভারতীয়ানাং সংস্কৃতিং প্রতি অনুরাগঃ সমাক্ বৃদ্ধিং গত ইতি প্রমাণিতো ভবতি। পরন্তু বয়ং সুস্পষ্টং ন জানীমহে কাসৌ সংস্কৃতির্নাম? অস্মাকং বিদ্যালয়েষু মহাবিদ্যালয়েষু চ যদ্য প্রায়েণ এতৎ প্রত্যক্ষীকুর্মঃ যৎ অস্মদ্দেশিনঃ সংস্কৃতিরিত্যনয়া নূতনীয় বাক্যাভিনয়াত্মকং কর্ম প্রযুজ্যন্তি। সম্প্রতি বয়ং নিখিলভারতশিক্ষাপরিষদঃ অধিবেশনে (All India Educational Conference) সভ্যরূপেণ কেবলমাত্রেণ হাবভাবাঃ ত্রিবারম্ ইত্যাখ্যানন্তরে উপস্থিতাঃ আম। তত্রাপি দৃষ্টবন্তো যদ্ভারতীয় বাক্যাভিনয়া এব সংস্কৃতি (culture) নাম্না অভিহিতা আসন্।

পরন্তু মনুসংহিতায়াং তৌর্যত্রিকং কামজব্যসনরূপা উদ্ঘোষে। তথাহি—

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।"

অধুনা খলু এতস্যৈব বৃদ্ধত্বে। সম্প্রতি হি যে মানবা নৃত্যগীতাভিনয়েষু পটব স্তে এব বিদ্বঃ বরেণ্যাদিনাথা পার্থিব মনুস্মৃতিমিথবদারোহন্তি।

পুরা হি "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" ইতি মোহমুদ্গরকবিরুক্তা অপি নিত্যমেবোজ্জীবিতমনাভিঃ। পরন্তু অধুনা কিং প্রত্যক্ষীভিয়তে? শিক্ষকাঃ

অধ্যাপকাদপি শীঘ্রবোধনাধিকা বর্ণবিন্যুকাদ্যাঃ কর্মবিবরণাদিকাশ্রয়ান্ সমুদ্ধৃত্য উপযোগিনো ভবন্তি।

এতাদৃশৈর্বিধৈঃ প্রাচৈঃ বিদেশভাষাদীক্ষিতে বং ইদানীন্তনে কালে ভারতীয় সংস্কৃতে রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনং সাধনীয়মিতি। এতস্যাঃ সমস্যায়াঃ সমাধানমত্রত্যবিদ্বদ্ভিরেব অন্যৈঃ পরিষদি সম্ভাষণীয়মিতি বয়মাশাস্মহে।

অতুলা ভারতীয় সংস্কৃতিবিবর্ধিনী ঈদৃশী ভাষা-ভিলিখিতা সা সাকৃতাবয়া ভূয়সী সমুপলভ্যতে।

* ত্রিবান্দ্রম আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ: বার্ষিকা-বিবেশনোপলক্ষে গতবর্ষে চতুর্থ বার্ষিক সংস্কৃত সম্মেলনে অস্যাপক মহোদয়েন প্রেষিত ভাষণস্য প্রতিলিপিঃ।

—সম্পাদকের

আয়ুর্বেদের সূক্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রাণাচার্য

১৫। বায়ুপিত্ত কফশ্চেতি ত্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ।
বিকৃতাবিকৃতা দেহং ঘ্নন্তি তে বর্তয়ন্তি চ॥
অষ্টাঙ্গ—সূ-অঃ ১ম

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ সংক্ষেপে বিকৃত ও অবিকৃত হইয়া দেহকে অসুস্থ করে ও বাচাইয়া রাখে।

১৬। হৈর্তবৈষিষমক্ষীণো মলক্ষাস্থিং নয়েৎ মৃতং।
কোষ্ঠঃ ক্রূরো মৃদুর্মধ্যো বয়ঃ স্থাতৈঃ স্বৈরপি॥
অষ্টাঙ্গ—সূ-অঃ ১ম

বায়াদি দ্বারা মানুষের অগ্নি ক্রমান্বয়ে বিষম, তীক্ষ্ণ, মন্দ ও সম এবং কোষ্ঠ ক্রূর, মৃদু, মধ্য ও সম হয়।

১৭। বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্বেষাং বিপরীতৈর্বিপর্যয়ঃ।
অষ্টাঙ্গ—সূ-অঃ ১ম

সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা বায়ু ও কফাদির বৃদ্ধি এবং বিপরীত গুণযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা তাহাদের হ্রাস হয়।

১৮। কালার্থকর্মণাং যোগো হীনমিথ্যাতিমাত্রকাঃ।
সম্যগ্যোগশ্চ বিজ্ঞেয়ো রোগারোগ্যৈককারণম্॥
অষ্টাঙ্গ—সূ-অঃ ১ম

কাল (শীত গ্রীষ্ম বর্ষা), অর্থ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ) ও কর্ম (হাত, পা ও অন্যান্য চেষ্টা) হীন, মিথ্যা ও অতি যোগ হইলে রোগ এবং সম্যক যোগে আরোগ্য লাভ হয়।

১৯। ঘৃতাদৃতে নাস্তি রসো ন পাকঃ
পিত্তাদৃতে নাস্তি কফাচ্চ পূয়ঃ। সু-সূত্র (১৭ অঃ)

ঘৃত ব্যতিরেকে ভাজা হয় না, পিত্ত বিনা পাকে না ও কফ বিনা পূঁজ হয় না।

২০। রসজা পুরুষং বিদ্যাদ্রসঃ রক্তেং প্রবর্ত্তয়েৎ।
মাংসং পাবাস্ত মেদিমানাচারাজ্ঞাপ্যবস্থিতিঃ॥
সু-সূত্র-১৪ অঃ

রস (অন্নজ) হইতে জীবের দেহ গঠন হয়, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্ন পান ও আচার ব্যবহারের দ্বারা অন্নজাত ভাবে ও অন্নের সহিত রস রক্ষা করিবে।

২১। বস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্মসু অপরিনিষ্ঠিতঃ।
সোমুহ্যত্যাতুরে প্রাপ্য প্রাণা ভীরুরিবাহবম্॥
সু—সূ-৩৪ অঃ

যে চিকিৎসক শুধু শাস্ত্রজ্ঞ, হাতে কলমের কাজে অপরিপক্ক সে রোগী পাইলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভীরুর মত দিশাহারা হয়।

২২। যথা খরস্তদ্ভবহী ভারস্তবেত্তা নতু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি।
সু-সূত্র-৪র্থ অঃ

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় সত্তা *

কবি শ্রীজগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায়

ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' কবিতায় ধ্বনিত করেছেন "হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো ধীরে।" উপনিষদের সেই বাণীর পুনরাবৃত্তি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।" কিন্তু দিন তো আসছে ভারতের, তবু কৈ জাগ্রত পথারে আত্মসংস্কৃতির সচেতনতার উদ্ভব হয়েছে কি? মহাসাগরের সাগর-তীরে মুহূর্ত চিত্তকে জাগ্রত করা সম্ভব কিন্তু মরচিত্তার উন্মেষকল্পনে সমাজের চেতনা সুদীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকে জাগিয়ে তোলা যায় না। ভারতের বিগত শতাব্দীর দীর্ঘ পরাধীনতা জাতির শিরায় শিরায় মরচিত্তার কাজ করেছে, ঘুনিয়ে দিয়েছে তার আত্ম-সচেতনতা, নিজের সত্তা, মহান্ সংস্কৃতি। পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজাতীয় সংস্কৃতি চিত্তকে বিভ্রান্ত করে মোহমরীচিকায় প্রলুব্ধ করেছে জ্ঞানের পিপাসায় অজানতায় ছুটে যেতে। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' মনে চির চলে নিত্য ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রতীচ্যের অনিত্য আলোকে। সুদূর অতীতের যে-উপনিষদের অমৃতময় বাণী আধুনিকতার উদ্ভব বাক্যচাতুরীর উপাদানের উপলব্ধির বিষয় না হয়ে অর্থের মূল্যমেলকরূপে সৌখীন ব্যবহারে বস্তুতান্ত্রিকে পেতেই হয়ে উঠেছে, নয় তো প্রাচীন আবর্জনা বলে বর্জিত হয়েছে। অথচ সেই বেদ উপনিষদের পথ বেয়ে আজও বয়ে আসছে যুগযুগান্তরের ভারতের সংস্কৃতি। শত সংমিশ্রণেও এই সংস্কৃতি একটা নিজস্ব গতি, এর মৌলিকতা বজায় রেখেছে। আয়ুর্বেদ তার অন্যতম নিদর্শন। জাতির ঐতিহ্য সৃষ্টি আর সংস্কৃতি নিয়ে ভারতের জাতীয়তার সূত্র বৈদিক যুগের প্রারম্ভে সেইখান থেকেই চলে আসছে তার ইতিহাস। ভারতীয় মনের সংস্কৃতি যেখানে বৈদিক সাহিত্যে সেই ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব-বেদে। সেই ভারতের সংস্কৃতি—সংস্কৃতির ধারাই ভারতীয় ইতিহাসের ধারা। এই সংস্কৃতি ভারতীয়ের মজ্জাগত। আয়ুর্বেদ বেদেরই অন্তর্ভুক্ত, আয়ুর্বেদ ভারতের সংস্কৃতি, আয়ুর্বেদ ভারতের মজ্জাগত।

আধুনিক যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত, তাই চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান আধুনিক যুগের অবদান সন্দেহ, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণ পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগেরই সৃষ্টি, যে যুগে ভারতীয় অবদানের মূল্য বাইরের জগতে স্বীকৃতি লাভ করে নি। আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞান বিজ্ঞানরূপে ভারতীয় অবদান বলে তার স্বীকৃতি ভারতের বাইরে না থাকলেও প্রাচীনকাল থেকে ভারতে যথেষ্ট সমাদর তো ছিলই, এখনও আছে। তবে আয়ুর্বেদ প্রাচীনকালের মূলদর্শী, আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিশ্রেষ্ঠ মনীষীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছিল। চিকিৎসার ইতিহাসে নিহিত থাকলেও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান রীতির দিক দিয়ে এক নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান বাস্তব পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে কিন্তু আয়ুর্বেদ বাস্তব এবং তার ওপর আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষণের ধারাই পুষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শরীরতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় কিন্তু আয়ুর্বেদের লক্ষ্য আয়ু এবং জীবজগতের আধিক, দৈহিক এবং পারমার্থিক কল্যাণ।

* ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভিভাষণ রূপে বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে পঠিত। —সম্পাদক

শালাক্য বিভাগ

আয়ুর্বেদে নেত্ররোগ

বৈদ্যাচার্য শ্রীবসন্তগোপাল গোস্বামী,
এল্. এ. এম্. এস্.; এম্. এ. ও. এস্
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দিল্লী

আয়ুর্বেদশাস্ত্র অতি বিশাল ও জটিল উহা মূলত ৮টি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু বর্তমানে কার্যত একটী মাত্র অঙ্গ অর্থাৎ কায়চিকিৎসাকেই অবলম্বন করিয়া আয়ুর্বেদ বাঁচিয়া আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন হইলে মানুষ যেমন অপূর্ণ থাকিয়া যায় সেইরূপ বর্তমান আয়ুর্বেদও অঙ্গবিহীন হইয়া অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে।

সুতরাং আয়ুর্বেদকে জনসাধারণের সমক্ষে উপযুক্ত সম্মানের সহিত দাঁড় করাইতে হইলে উহার শল্য-শালাক্য প্রভৃতি ৮টি অঙ্গেরই যাহাতে ক্রত উন্নতি হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক আয়ুর্বেদসেবী ও আয়ুর্বেদহিতৈষীর আন্তরিকভাবে যত্নবান্ হইতে হইবে।

আজকাল অনেকেই বলিতে শুনা যায় যে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সার্জারী বা চক্ষুকর্ণাদির তেমন কিছু চিকিৎসা নাই। ইহা তাঁহাদের পক্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা হইতে পারে কিন্তু এজন্য কেবল তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া ঠিক হইবে না। আয়ুর্বেদের শল্য-শালাক্য (Surgery & Eye-Ear-surgery) চিকিৎসা উহার নিজস্ব ধারায় হইলেও উহাতে বহুক্ষেত্রেই ক্ষারযোগ ও শস্ত্র কর্মাদি প্রয়োগপূর্বক চিকিৎসা করার নির্দেশ আছে। যন্ত্রপাতির অভাব না থাকায় কবিরাজগণ যন্ত্রকর্মাদি প্রয়োগপূর্বক শল্য-শালাক্য প্রভৃতি ব্যবসায় ও অধিক আর্থিকভাবে ঐ সমস্ত বিষয়ের চিকিৎসা করিতে ক্রমে ক্রমে নারাজ হন এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কায়চিকিৎসার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন। এইরূপে চক্ষুকর্ণাদির চিকিৎসা ক্রমে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হওয়াতেই আজ প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোকেরই ধারণা যে আয়ুর্বেদ মতে চক্ষুকর্ণাদির ভাল চিকিৎসা সম্ভব নয়। যদিও এই সব চিকিৎসার সম্যক্ প্রচলন না থাকাতেই লোকের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে।

অন্বিষেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে এবং প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারা যায় যে, আয়ুর্বেদে অন্যান্য বিষয়ের চিকিৎসার ন্যায় চক্ষু-কর্ণাদি বিষয়েও উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

আজকাল নেত্ররোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির দিকেই দেখা যাইতেছে। নেত্ররোগের অনেক কারণ থাকিলেও বর্তমানে নানাপ্রকারে আত্মহীনতা এবং আলোকের শিক্ষের পরিশোধক ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই নেত্ররোগসমূহের এত ক্রত বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ বলা যায়। সিনেমা হলের এবং বহু দোকানে ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙের অত্যুজ্জ্বল আলোক সমূহও নেত্ররোগ বৃদ্ধির অন্যতম আশু কারণ।

চক্ষুরক্ষায়াং সর্বকালং মনুষ্যৈ
অত্যন্তকর্তব্যোঽস্তিহ বাগবিজ্ঞা।
যাবৎ লোকোক্ত মুল্যায়াত্রিশিষ্যায়াঃ
মূল্যোদ্ধারায়াং বিজয়ায়েঽপি হিতে।

চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি যাহাতে ভাল থাকে তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। অন্ধদিগের নিকট রাত্রি ও দিন উভয়ই সমান এবং প্রচুর অর্থ থাকিলেও তাঁহাদিগের নিকট ইহলোক বার্থ।

সকলের দৃষ্টিশক্তি যাহাতে ভাল থাকে তজ্জন্য সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ, স্বয়ং পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ নিয়মাদির মধ্যে কয়েকটী নিয়মাদির বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি। এই নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিলে চক্ষু সুস্থ ও সবল থাকিবে এবং সহসা কোন নেত্ররোগ হইতে পারিবে না—

(১) প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া পর্য্যাপ্ত মুখের ভিতর যতটা জল ধরে, ততটা জল ধারণ করিয়া অন্য জল দ্বারা চক্ষুদ্বয়ে ১৫।২০ বার ঝাপটা দিয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে।

(২) প্রত্যহ আহারান্তে আচমনের সময় অন্ততঃ ৮।১০ বার চক্ষুতে শীতল জলের ঝাপটা দিবে।

(৩) যতবার জলপান করিবে এবং যতবার মুখ ধুইবে ততবার চক্ষুও কপাল ধুইয়া ফেলিবে।

(৪) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চক্ষু ও কপাল ধুইবার পর সেই ভিজা হাত দিয়া দুইটী কান ও কানের উপর দিয়া গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত মুছিলে অধিকতর ফল লাভ হয়।

(৫) শয়ন গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে এবং যথাবশ্যক পাদুকা ব্যবহার করিলে সহসা নেত্ররোগ হইতে পারে না।

(৬) স্নানকালীন তৈল মর্দ্দনের সময় অগ্রে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ তৈলদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলে সহসা নেত্ররোগ হইতে পারে না।

(৭) প্রত্যহ রাত্রে শয়নকালে পরিষ্কৃত পায়ে তৈল ঘর্ষণ করিলে চক্ষু সুস্থ ও সবল থাকে এবং রাত্রে নিদ্রাও ভাল হয়।

(৮) সপ্তাহে ২।১ দিন বিশুদ্ধ মধু বা ঐ মধুর সহিত ঈষৎ ১/ অংশ কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে ইহাতে নেত্র হইতে দূষিত জল স্রাবিত হয় ও দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে।

সুদীর্ঘকাল বহু সহস্র রোগীর চিকিৎসা করিয়া প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে যেমন শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল থাকে সেইরূপ নেত্রকেও সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাখিবার এবং সহজে আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত নেত্রাদিরও কয়েকপ্রকার বিশেষ ধরণের ব্যায়াম করা আবশ্যক। স্থানাভাবে উহাদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সময়ান্তরে প্রকাশ করার চেষ্টা করিব।

বিশেষ প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক বোধে এখানে একটী কথা বলিতে হইতেছে। প্রায় ৪০ বৎসরাধিক কাল হইতে বিভিন্নস্থানে কতিপয় আয়ুর্বেদ কলেজ ও আরোগ্যশালা এবং ঔষধালয়ে বহু ভাল ও যোগ্যতী ছাত্র থাকাসত্ত্বেও উহাদের কর্ণধার ও পরিচালকগণ আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত সংখ্যায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা শল্য শালাক্যাদি বিষয়ে ডাক্তারদের পরামর্শের উপরই নির্ভর করিয়া থাকা শ্রেয় মনে করিয়াছেন এবং স্বয়ং আয়ুর্বেদের উচ্চাধিকারী হইয়াও নিজেরা স্বাবলম্বী হইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। ইহাও বর্ত্তমান আয়ুর্বেদ সেবিগণের পক্ষে একটী বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে তাঁহারা চেষ্টা করিলে যদি বিভিন্ন বিষয়ে অন্ততঃ সংখ্যায় শল্য-শালাক্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করিয়া লইতেন, তবে আয়ুর্বেদের বর্ত্তমান দুরবস্থা হইত না। ঐরূপ হইলে আজ

আয়ুর্বেদ পূর্বগৌরব ফিরিয়া পাইবে এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র হইয়া চিকিৎসাজগতে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্তমানে দেশের পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসক-গণ নানা ভাবের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া, তথা ছাই, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক এবং উহাতে সার্জারী আইসার্জারী প্রভৃতি নাই—এইরূপ আজগুবি দোষারোপ করিয়া আমাদিগকে আমাদের প্রাণের মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া নানাভাবে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের নামজাদা ও মেধাবী ছাত্রগণ বড়সহরের অধ্যাপক ও হাসপাতালে কর্মব্যস্ত থাকিয়া যদি সাহসিকতার সহিত অস্ত্রোপচারাদির চিকিৎসাকার্যে অগ্রসর হইয়া কার্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারেন এবং মৃতপ্রায় অস্ত্রকর্মাদিরও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন তবে তাহারা অচিরেই আয়ুর্বেদের হৃতগৌরব পুন-রুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন।

পরিশেষে আয়ুর্বেদসেবিগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, কেবলমাত্র আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইবে বা উহার প্রচার করিতে হইবে এমদ্বিধ যৌথিক প্রচারের দিন আর নাই। এখন যথার্থই কিছু কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। এবিষয়ে বোধ হয় সকলেই একমত হইবেন যে আয়ুর্বেদকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া জনগণের সমক্ষে উপযুক্ত সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কেবলমাত্র ক্লাসিকিলোকেই অবলম্বন করিয়া থাকিলেই চলিবে না, উহার দ্বারা অদ্যকার জন্য উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার মনে হয় কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে দুই অন্যেরই সমানভাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চিকিৎসা ও গবেষণা করিয়া তাহাদের উন্নতি ছাড়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তিকে দুইয়ে ভাগ করিয়া না দিয়া যদি তাহাদিগকে একমুখী করিয়া কোনও বিশেষ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চিকিৎসা ও গবেষণায় নিযুক্ত করান যায় তবে তাহারাই সেই বিষয়ে অচিরে সিদ্ধিলাভ হইবার সম্ভাবনা।

আমার সুদীর্ঘ সেবাদ্বারা যদি শালাক্যতন্ত্রের কিঞ্চিৎ সফলতাও লাভ হয় তবে তদ্দ্বারা আয়ুর্বেদের যথার্থই কিছু করা হইবে। সর্বপ্রথম সাহসিকতার সহিত এইরূপ পথ দেখানর আর একটী দিক এই হইবে যে পরবর্তী কর্মিগণ কর্মে প্রেরণা পাইবেন। সাহসী ও কর্মী আয়ুর্বেদসেবিগণের বিশেষতঃ মেধাবী ছাত্রগণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ তাঁহাদের যাঁহার যে বিষয়ে এক একজন বিশেষজ্ঞ (specialist) হইয়া তাঁহার সমুখী চিন্তাধারা ও কর্মশক্তিকে একমুখী করিয়া কেবল সেই সেই বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চিকিৎসা, গবেষণা এবং যথাবশ্যক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বর্তমান জগতে আয়ুর্বেদের যথার্থই যে কি স্থান হইতে পারে তাহা উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দিবেন।

(শেষের কয়েকটী কথা আয়ুর্বেদসেবিগণের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। এই ২২ বৎসর পূর্বে ১৩৪৭ সালে বসিরহাটে বিভিন্ন কবীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতিরূপেও ঐ কথা বলিয়াছিলাম।—লেখক

প্রাপ্তিস্থান : ৩১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযদুনাথ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও ৪১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে তদ্বারা প্রকাশিত।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

পৃষ্ঠপোষক—ভারতীয় সমাজের

শ্রীসরোজ নাথ বসু, এম, এস, সি, এম এস
সম্পাদিকা সভা কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন
কাব্যতীর্থ ও কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩৬৯ ও ১৩৭০ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতি :—

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুমল্লিক
সহ-সভাপতি কবিরাজ শ্রীসরল কুমার গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার

সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুধাংশু মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীসমরেন্দ্র সেন
সেন, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ মজুমদার, ডাঃ শ্রীসুধাংশু
চক্রবর্তী, সদানন্দ শ্রীবিপুলানন্দ ব্রহ্মচারী
সহ-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসরসিজ নাথ চট্টোপাধ্যায়
সহ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসাধনেন্দু কুমার সেনগুপ্ত,
কবিরাজ শ্রীকালিদাস মোহন শর্মা

অফিস - ৫১, হরিতকী বাগান রোড, কলিকাতা-৬

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে
লিকোরিণা

সাভার কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১/১ ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-১৪

আয়ুর্বেদ-ভারতীর নিয়মাবলী

১। "আয়ুর্বেদ-ভারতী" মূলতঃ ও প্রধানতঃ আয়ুর্বিজ্ঞানের তথা-সম্বলিত বৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের যথাসম্ভব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৭৫ নঃ পঃ।

৩। বাংলা বর্ষের অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে ও মাশুলে পাঠানো নেওয়া হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৫১, হরিতকী বাগান রোড, কলিকাতা-৬, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতীতে" প্রকাশের জন্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

THE 'AYURVEDA-BHARATI'

A multilingual Quarterly Journal is the right vehicle for the dissemination of cultural and scientific matters, especially of the knowledge of Ayurveda and its practice It seeks unstinted support and sympathy from the Profession and the Public.

Founder-Editor,
AYURVEDA-BHARATI.

Statement about ownership and other particulars about newspaper

"Ayurveda-Bharati"

FORM IV.

1. Place of Publication ....52, Mahatma Gandhi Road, Cal-9.
2. Periodicity of its Publication ....Quarterly.
3. Printer's Name .....Kaviraj Bagala K. Majumder, M.A.
   Nationality.....Indian (Bengalee).
   Address .....52, Mahatma Gandhi Road, Cal-9.
4. Publisher's Name.....Kaviraj Bagala K. Majumdar, M.A.
   Nationality.....Indian (Bengalee).
   Address.....52, Mahatma Gandhi Road, Cal-9.
5. Editor's Name ..... Kaviraj Bagala K. Majumder, M.A.
   Nationality ..... Indian (Bengalee).
   Address ..... 52. Mahatma Gandhi Road,-Cal-9.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per'cent of the total capital. Sri Bagala K. Majumder, Founder-President, Ayurved Bijnan Parishad, 52, Mahatma Gandhi Road, Cal-9.

I, Bagala Majumder, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Publisher—
Bagala Kumar Majumdar.

Date—12.7.62. Founder-Editor, Ayurved-Bharati.

Appeal

FOR

MAHARSHI CHARAKA JAYANTI CELEBRATION

"অতুমাত্রা শরীরস্য প্রয়োক্তা ত্রিদশেশ্বরঃ।
লোকানুগ্রহণার্থায় সর্বং প্রাতিষ্ঠতেতম্"॥
—চরকসংহিতা।

AYURVEDA BIJNAN PARISAD

52, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

The 10th April, 1956.

মহর্ষি চরক জয়ন্তী উৎসব

আবেদন

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের বিপুল কর্মযজ্ঞের পরিপথে তাহার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন করিবার আছে—বিশেষতঃ আয়ুর্বেদের, যাহা চিকিৎসা শাস্ত্রের ধাত্রী এবং প্রাচীনতম হইলেও শাশ্বত মূল্যায়নে নবীনতম। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ১৩৫৬-৫৭ সালে মহর্ষি চরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন একটি বিরাট ব্যাপার। অবশ্য, মহর্ষি চরকের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তাঁহার পরিচয় প্রথম খৃষ্টাব্দে মহারাজা কণিষ্কের আমল হইতে খৃঃ পূঃ নবম বর্ষ পর্যন্ত—খৃঃ ১ম শতকের আবির্ভাব খৃঃ পূঃ পাঁচ শতকও বলে। তাহাদের তাঁহার অমরকীর্তি "চরক সংহিতার" জন্য তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বিশ্ববাসীর নিকট চিরকাল অম্লান থাকিবে। ইহা চরকপূর্ব আয়ুর্বেদবেত্তাদের অবদান ও চরকোত্তর চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জানের ভাণ্ডার। তিনি ছিলেন তাঁহার যুগে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের অগ্রদূত ও সর্বতোমুখী প্রতিভা—একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বৈয়াকরণিক, সাহিত্যিক, নৈতিক, সংস্কর্তা ও মানবহিতৈষী। এই উৎসব নানাভাবে উদ্দেশ্যমূলক—বিশেষতঃ সেই ঋষি বৈজ্ঞানিকের পৃথিবীপূর্ণ এবং কঠোর তপস্যা, অধ্যবসায়শীলতা ও ব্যবহারিক গবেষণার সাহায্যে ভারতীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির পুনরধিকারের পথে আয়ুর্বেদের পুনরুত্থানকল্পে ভারতবাসী, আয়ুর্বেদসেবী ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ।

উৎসবের সফলতার জন্য আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ ভারতের জনসাধারণ ও বিশেষের আয়ুর্বেদানুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতা, সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করে। এই উপলক্ষে প্রদর্শনী, চরক স্মারক গ্রন্থপ্রকাশ ও আয়ুর্বেদসংস্কৃতিবিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হইবে। পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসবও এই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা, অর্থ ও পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্তগোপালকৃষ্ণ কবিরত্নের পত্নি ৫২, হারিসন রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় সাক্ষাৎ স্থাপন ও পত্রালাপ করিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি। ইতি—২৭শে চৈত্র, ১৩৬২ সাল।

নিবেদকগণ

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযোগেশপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রেভ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নলিনাক্ষ বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীবরেণ্য, ডাঃ কালিদাস নাগ, কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনতীর্থ, কবিরাজ শ্রীরাধালদাস সেন, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, বৈদ্যরাজ শ্রীপ্রতাপ সিং, ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ, অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীপটীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অধ্যক্ষ শ্রীমহেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ আশুতোষ পাত্রী, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ডাঃ ব্রহ্ম, ডাঃ রাখালদাস রায়চৌধুরী, অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ডাঃ গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসাদ রায়শর্মা, ডাঃ সুখময় চক্রবর্তী, শ্রীঅজয়প্রসাদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ ডাঃ এস, এস, রায়, শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, ডাঃ গৌরেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীহরিবল্লভ বোষী, শ্রীহরিপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রী কি. মল্লিনিত্র, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপীবল্লভ ধর, শ্রীসুকুমারীরঞ্জন সাহোদী, অধ্যক্ষ ডাঃ অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লনাথ রায়, কবিরাজ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীনাথচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ শ্রীমধুসূদনবিদ্যাবী বসু, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মাইতি, কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর সাহাল, কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কবিরাজ শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাঃ নিত্যানন্দ সেন, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, কবিরাজ শ্রীউমেশচন্দ্র সেন প্রমুখ।

মহর্ষি চরক জয়ন্তী উৎসব

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ, ৫২, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯

MAHARSHI CHARAKA JAYANTI CELEBRATION

APPEAL

In the march of tremendous achievements, following the advent of Independence, the science and culture of India specially Ayurveda, the mother of healing sciences—the oldest yet the newest for its eternal values,—have a prominent part to play. The celebration of Maharshi Charaka Jayanti in Calcutta in 1956-57 under the auspices of the Ayurveda Bijnan Parisad, is a magnificent event in point. There is, of course, enough difference of opinion as to the age of Maharshi Charaka, ranging from the reign of Emperor Kanishka in the first century A.D. to 900 B.C. with Vridha-Charaka flourishing in 500 B.C. Nevertheless his revered memory will ever remain green in the mind of the people for his immortal masterpiece 'Charaka Sanhita' for all time to come. It contains in itself the pre-Charaka knowledge of Ayurveda as well as that of the post-Charaka school. He is the harbinger of a great renaissance in Ayurveda in his time and an all round genius—a scientist, a philosopher, a logician, a grammarian, a reformer, a literatteur, and a humanist. This celebration is remarkable in many ways, specially in honouring the sacred memory of the great sage-scientist as also turning the mind of the people, the government and the Ayurvedists to re-discover the science and culture of India through painstaking theoretical studies and practical research to usher in a revival of the great science of India and her culture.

The Parisad seeks the unstinted support of the people of India and the admirers of Ayurveda abroad to make it a point to attend the function and help the organization for the success of the Jayanti. The Parisad has decided to hold an exhibition, to bring out a Charaka Commemoration volume and to hold sectional meetings on different subjects of Ayurveda. Along with this celebration the Silver Jubilee of the Ayurveda Bijnan Parisad will also be held.

We send our fervent appeal to all for co-operation and help with might and money for the success of the celebration. All correspondence and remittance are to be made to Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Mojumder, Founder President, Ayurveda Bijnan Parisad, at 52, Harrison Road, Calcutta.

Prof. Satyendra Nath Bose, Dr. Surendra Nath Sen, Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, Mayor Sri Satish Chandra Ghosh, Dr. Nalinakshya Dutta, Hon. Justice Ramaprasad Mukherjee, Mahamahopadhyaya Sri Haridas Sidhantabagis, Dr. Kalidas Nag, Dr. Hemendra Nath Das Gupta, Kaviraj Jogendra Nath Sadadarshantirtha, Kaviraj Rakhaldas Sen, Principal Dr. Anil Kumar Banerjee, Sri Vivekananda Mukherjee, Prof. Nirmal Kumar Bhattacharjee, Prof. Tripurari Chakraborty, Dr. Biresh Chandra Guha, Principal Kaviraj Sachindra Nath Vidyabhusan, Principal Kaviraj Maniendralal Das Gupta, Principal Kaviraj Bijoylali Bhattacharjee, Sri Santosh Kumar Bose, Dr. Makhanlal Roychoudhury, Sri Hemendra Prasad Ghosh, Dr. Asutosh Savti, Dr. Girijasankar Majumder, Kaviraj Pravash Chandra Sen, Principal Deva Prasad Ghosh, Dr. Dukhaharan Chakraborty, Principal Dr. S. N. Roy, Sri D. Bali Singha, Kaviraj Umacharan Sen, Kaviraj Bimalananda Tarkatirtha, Sri Annada Prasad Choudhury, Vaidyaratna Sri Pratap Singh, Kaviraj Hari Dos Joshi, Kaviraj Prabhakar Chattopadhyaya, Kaviraj Naresh Chandra Ghosh, Kaviraj Pramathanath Roy, Sri Hari Prasad Gupta, Kaviraj Murari Mohan Ghosh, Dr. Shroff, Kaviraj Ramchandra Mullick, Kaviraj Sailendra Nath Sen Gupta, Kaviraj Raghunath Maity, Kaviraj Atul Behari Dutta, Dr. Triguna Charan Sen, Dr. Nalini Ranjan Sen Gupta, Tulsiram Sarogi and others.

Maharshi Charaka Jayanti Celebration,

The 10th April, 1956 Ayurveda Bijnan Parisad, 52 Harrison Road, Calcutta-9

A COMMEMORATION BROCHURE

FOR

THE MAHARSHI CHARAK JAYANTI

&

THE RAJATA JAYANTI CELEBRATIONS

OF THE

PARISHAD

Celebration Week

FROM DECEMBER 29, 1956 TO JANUARY 6, 1957

Meetings :

DARBHANGA HALL, CALCUTTA UNIVERSITY
FROM DECEMBER 30, 1956 TO JANUARY 1, 1957

Exhibition :

MUNICIPAL MUSEUM, CALCUTTA CORPORATION
FROM DECEMBER 29, 1956 TO JANUARY 6, 1957

Organised by :

AYURVEDA VIJNANA PARISHAD

52, HARRISON ROAD, CALCUTTA

MAHARSHI CHARAKA, THE SAGE SCIENTIST

(600 B.C.—900 B.C.)

The present is receding into the past and the future, looming large before our eyes, shadows the past, however, eventful and pregnant with great possibilities. Nevertheless, through the eternal mist of time and oblivion, stand in bold relief like peaks above clouds, some great personages, permeating light and life into the dead bones of centuries beyond the boundaries of time and space. They are the measurement of the different stages of civilization shedding light through the present, past and future. Such was Maharshi Charaka, the great scientist of Ayurveda. He was the harbinger of a great renaissance in his time and an all-round genius—a litterateur, a grammarian, a philosopher, a reformer and above all, a humanist. He cared a fig for his life history because his immortal master-piece 'Charaka Samhita' is an infallible testimony to his matchless versatility and flaming intellect. It was translated into Arabic, so great was his fame, at the court of Al Mâmun in Baghdad in 927 A.D. and in Chinese on two occasions in the 7th century A.D.

The Kucha Mss. is a medical treatise in Sanskrit verse with a few Prakrit passages. It contains abstracts of ancient medical works and a number of direct quotations from Indian authors including twenty eight extracts from the Charaka Samhita and six from the Sushruta Samhita. It was Agnibesha who compiled the Agnibesharantra which was revised and improved by Charaka and renamed as the 'Charaka Samhita'. Charaka worked upto the 19th Chapter of the Chikitsa-Sthan from the Sutra-Sthan. The remaining part, the Kalpasthan and the Siddhisthan were revised and

completed by Dridabala, son of Kapilabala. Dridabala hailed from Panchanadpur. But a commentator speaks of Panchanadpur as Baranashi.

'Though the 'Charaka Samhita' is a book of the healing science, it is a mine of knowledge, the source of scientific precision, an imperishable receptacle of various subjects of knowledge, ocean of supreme principles, a vivid picture of good conduct, ever-giver of the four Bargas namely, religion, money, desire, and emancipation and a fountain of worldly welfare. Charaka has advanced with reason and logic at every step, to reach truth, which is not so marked in other books. He has shown his versatile genius in dealing with the subject. His revision is of a marvellous nature reproducing Agnibesha Tantra with the best of his knowledge, research and inquisitiveness which have made it possible to change into the 'Charaka Samhita'.

As we have it, Part I Sutrasthan deals with remedies, diseases, diets, duties of a physician and principles threading like a garland all topics dealt with, in other chapters. II. Nidanasthan is concerned with the eight chief diseases. III. Bimanasthan, with general pathology and medical studies, it contains a statement of the regulations laid down for the conduct of the newly-pledged student: he is to give his whole energies to his work even if his whole life is at stake, never to do harm to a patient, never to entertain evil thoughts to anybody, to be grave and restrained in behaviour, to devote himself in word, thought and deed to the treatment of his charge, not to report outside, affairs of the house and to be careful to say nothing to a patient likely to retard recovery. IV. Sarirasthan deals with anatomy and embriology, V. Indriyasthan, with diagnosis and prognosis; VI. Chikitsasthan, with special therapy and medicines and: (VII & VIII) Kalpa and Siddhisthanas, with general therapy. Charaka as we have him, is more than an author on medicine, he gives us informations of a considerable number of subjects mainly Philosophy etc and develops a form of Sāmkhya which has erroneously been regarded as old whereas there is nothing to show that it is not a comparatively late addition to the text. He is familiar with 'Nyāya' also and 'Vaicesika views' which

suggest an early date. The form of the work is prose interspersed with verses and it has no very ancient appearance perhaps, owing to the work of Dridabala. We know that it was rendered at a fairly early date into Persian and an Arabic translation was made in 800 A.D. or some say, in 927 A.D.

The Sushruta Samhita is equally famous with Charaka and is named with Atreya and Harita in the Bower Manuscripts. Samhitas are attributed to Atreya, Kasyapa, Harita, Agnibesha and Bhela but these Samhitas are not original works. It is probable, though not exactly proved, that earliest literary compositions on medicinal works were styled Tantras or Kalpas and took the form of monographs on special topics and not of Samhitas which are comprehensive treatises covering wide range of subjects. The name of Chakrapani Dutt's commentary is 'Ayurvedadipika', that of Gangadhar is 'Jalpakalpataru', that of Sivadasa, 'Charakatatwarthadipika' and that of Kaviraj Jogendra Nath Sen, 'Charakopaskar'. The commentaries of Chakrapani and Kaviraj Jogendra Nath Sen are the best. Bamacharan Barat began to bring out a Bengali note of the Samhita but it was left undone due to his untimely death. Pt. Jivananda Vidyasagar brought out an original text of the Samhita but it was full of mistakes. A Bengali translation of the Samhita was published by Kaviraj Abinash Chandra Kaviratna. Another original text was published by Kaviraj Harinath Visarad with the commentary of Chakrapani Dutt. Kaviraj Dharmadas Sengupta edited and translated it into Bengali. Shri Jasodananda Sarkar also translated it into Bengali with the text. Shri Satish Chandra Sarma, Upendranath and Debendranath Sen also translated it into Bengali with the text and commentary of Gangadhar —'Jalpakalpataru'.

Hari Dutta Sastri edited the Samhita with the commentaries of Chakrapani Dutta and Jojjata. Biswanath Shastri edited the Samhita with Telegu commentary. Kaviraj Atridevji Gupta translated the Chikitsasthan, Kalpasthan and Siddhisthan of the Samhita into Hindi. Shri Gulabkunverba Ayurvedic Society translated it into Hindi, Gujrati, and English. Shri Kshetranath Chattopadhyay brought out an abridged edition of the Samhita. Panchanan Bhattacharja

edited a book on 'Charaka—principles of conception and obstetrics' in Bengali.

The Asiatic Society of Bengal also has got some manuscripts and editions of the Samhita. There are other editions and manuscripts in different languages scattered all over India. Thanks are due to the National Library and The Asiatic Society for supplying the Parishada with the informations.

As regards the age of Charaka some historians say that Charaka flourished in the first century A.D. during the reign of Maharaja Kaniska with Bṛiddhacharaka flourishing in 500 B.C. On the other hand, in the Panini Sutras there is 'Katha Charakalhuk' ('कठ चरकाल्लुक'). In its Britti is written ('चारकेण प्रोक्त') 'Charakena Proktah'. Therefore, Charaka flourished before Panini, the famous grammarian. Taranath Vachaspati says that Charaka flourished before or after the reign of Chandragupta whereas western historians say that Charaka flourished in 315 or 271 B.C. Goldstuker says that the time of Panini is 600 B.C. Naturally, Charaka's time will be before that period. Swami Prajnananda in his 'History of the Vedanta' affirmed 2900 B.C. being the age of Charaka. Hence it is truly surmised that the great Scientist of Ayurveda flourished between 600 to 900 B.C.

It is a trifling matter to ascertain the date of Maharshi Charaka, compared with his immortal contribution and masterpiece 'Charaka Samhita' which is a testament to the knowledge of Ayurveda and testimony to his unlimited and fundamental wisdom. He is for all time to come unchangeable in the midst of changes and changeful phenomena of progressive knowledge. This celebration, after so many centuries, is remarkable in many ways, especially in honouring the sacred memory of the great man and scientist, as also turning the mind of the people, government and Ayurvedists, to delve deep into the science and culture of Ayurveda—the Indian Medical science, through painstaking theoretical and practical research in its special methods and principles, to usher in a revival of the great science of India and her culture.

AYURVEDA VIJNANA PARISHAD

1931—1956 A.D.

It is a matter of great delight that the Rajata Jayanti of the Ayurveda Bijnana Parishad is being celebrated in Calcutta. The establishment of the Parishad in the year 1931, as an institution for Ayurvedic studies and research, marks the advent of a great revival of the science and the indomitable zeal of its founder, president, guide, philosopher and lifelong worker Rajvaidya Kaviraj Bagala Kumar Majumder, for the progress and upliftment of Ayurveda. The aims and objects of the Parishad as envisaged by its founder and incorporated in details, into the constitution as a registered body, are the cultivation and promotion of the science of Ayurveda in all its aspects and kindred subjects connected with Ayurveda without in any way, infringing its speciality and basic principles. The following are some of the avenues through which the Parishad seeks to fulfil its purpose:

(1) *The Scientific Section*—To unite and introduce to one another those who are interested in the science of Ayurveda, whether as practitioner, manufacturer, teacher of Ayurveda, research scholar, investigator etc. and to set as a link between groups engaged in specialised Ayurvedic works.

(2) *The Caraka Patha Chakra*—A study circle not only to understand and investigate into the 'Caraka Samhita' but also to come in touch with the vast lore of other Ayurvedic works, their fundamental scientific truths, scattered all over India as also outside.

(3) *The Ayurvedic Hospital Society*—An organisation for co-operation amongst the Ayurvedic Hospital authorities and workers and scholars, for progress in treatment and research.

(4) *The Janashvasthya Bibhag*—to propagate amongst the public the rules of health and hygiene, properties of food, effect and nature of the cycle of seasons, epidemic diseases etc.

(5) *A Library*—to acquire and use the knowledge of great men and scientists both past and present for furtherance of the science and culture of Ayurveda.

The group of scholars who have devoted their time and energy for research and collection of different data from different Ayurvedic treatises to eke out a plan for future advancement, consists of the following, to mention a few out of the many research scholars: —

Kabiraj Jogendra Nath Sadadarshantirtha who has shown his versatility in the treatment of Ascites, retention of urine, liver and spleen diseases etc. and has written a book on the subject ; Kj. Girijashankar Sanyal who has found out a quite novel line of treatment by preparing medicines out of the extract of individual drugs, showing along with it a new approach and philosophy to the diagnosis of diseases which are embodied in his book 'রসায়িত বৈদ্য বিজ্ঞান' ; Kj. Murarimohan Ghosh who has devoted his time for the treatment of T.B. and brought out a book on dietetics namely, 'Pathya Bijnana' : Kj. Amalacharan Sen, a lifelong worker and research scholar carrying on researches in liver and heart diseases and the writer of 'Arogya Manjari' : KJ. Atul Behari Dutta, conducting the Bangiya Unmad Ashram, has contributed much to the treatment of mental diseases : Kj. Dinesh Chandra Sen has been carrying on researches in the bark, leaf, and fruits of the Neem Tree ; Kj. Prabhakar Chatterji, an expert in the treatment of T.B. and Cancer : Kj. Makhan Lal Brahmachari, a research scholar in the use of iron : Kj. Binay Shankar Roy and Kj. Sitikantha Majumder are working on Leprosy and the use of snake poison respectively.

Kj. Rakhaldas Sen, Kj. Sachindranath Vidyabhushan, Kj. Bijoykali Bhattacharja, Kj. Manindralal Dasgupta and Kj. Nagendra Nath Das Sarma and others have worked as teachers and exponents of the Ayurvedic works, the mineralogies and imports. Throughout these years, scholars have been working on metals, medicinal plants, diseases etc. both synthetically and analytically. The results of their investigations have been published in some of the dailies and monthlies and in the Parishad's Annual Journal. These are only a few remarks about the many and various works done by the Parishad during this quarter of a century.

To our delight Dr. S. Radhakrishnan, Vice-President of India, Prof. Satyendra Nath Bose, Vice-Chancellor, Viswa Bharati University, Dr. Suniti Kumar Chatterjee, Dr. Kalidas Nag, and Mayor Prof. Satish Chandra Ghosh are taking keen interest in the activities of the Parishad. Prof. Bose became once the president of the annual function and is helping us in other capacities. It will not be out of place to mention the names of M. M. Haridas Siddhantabagish, Akhil Chandra Datta, Deputy President, Legislative Assembly, Kj. Bimalananda Tarkatirtha, Advocate Birendra Nath De, Late Kj. Pramathanath Rai, Kj. Jogendranath Sadadarshantirtha and others who worked as presidents of the Parishad. In course of these years of strain and stress, many have joined, worked or cut off connections with the Parishad. The Parishad gratefully remembers them and remembers also with reverence and gratitude the Founder-President who has all along been steering the ship of the Parishad in the tussle and turmoil of its works. Let those who will shoulder the responsibility in future, caring nothing for the consequences, bend their whole energies to the task of regenerating the science of Ayurveda without fear of failure or success.

MESSAGES

New Delhi,
25th April, 1956.

Dear Sir,

Thank you for your letter of the 23rd last. I am glad to know that you will celebrate the Maharshi Charaka Jayanti and the Silver Jubilee of the Ayurveda Bijnan Parisad in Calcutta. I send my best wishes for the success of the celebrations.

Raj Vaidya Kaviraj
Bagalakumar Majumder,
52, Harrison Road,
Calcutta.

Yours faithfully,
(Sd.) S. Radhakrishnan
(Vice-President of India)

SHRI R. R. DIVAKAR, *Governor of Bihar* writes

". . . I am glad to learn that Charaka Jayanti is going to be celebrated. India has fortunately a long and glorious tradition of the science of health and of healthy long life. In free India we should be able to carry on research on scientific lines in connection with Ayurveda. Charaka was undoubtedly one of the architects of Ayurveda and as such we must pay our tribute to that master-mind. May this revive our interest in the great art of healing and health."

Dated, Patna, May, 1956.

PANDIT KSHITIMOHAN SEN, *Santiniketan*, writes

". . . The Ayurveda Vijnana Parishad, to our delight, has set its hand to the great task of reviving the science of

Ayurveda. The celebration of the Maharshi Charaka Jayanti reminds the people of the rich heritage of India in the domain of the healing science. To mark its footprint in the path of its journey to the fulfilment of the ideal the Rajata Jayanti celebration is a stepping stone. I send my good wishes for the success of both the functions.

Dated, 10-12-56.

THE GOVERNOR OF BOMBAY writes

"I am glad to learn that the Ayurveda Vijnana Parishad of Calcutta is soon celebrating its Silver Jubilee and along with it, the Jayanti of Maharshi Charaka. I wish both the functions all success."

Dated, May 16, 1956.

SHRI P. S. KUMARASWAMI RAJA, *Governor of Orissa*, writes

"I am glad to learn that the Ayurveda Vijnana Parishad is arranging to celebrate Maharshi Charaka Jayanti this year in a fitting manner with exhibition, discussions on Ayurveda, publication of commemoration volume etc. and I send my best wishes for the occasion to the Parishad. Charaka, the physician and humanist of ancient time, has been honoured through all these many centuries as one of our medical trinity or Vriddhatrayi, consisting of himself and of Susruta of notable name in the field of surgery and another reputed savant of olden times . . . I wish the celebrations all success and also pray that the celebrations will rouse the public to an awareness of the richness of our heritage in the field of Ayurveda.

Dated, 16th May, 1956.

Shri K. M. Munshi, *Governor of Uttar Pradesh* writes

". . . Dear Shri Majumder, your letter of the 15th May, 1956. I wish this Maharshi Charaka Jayanti success."

Yours sincerely,
(Sd.) K. M. Munshi.

Dated May 21, 1956.

Shri Mohanlal Sukhodia, *Chief Minister, Rajasthan*, writes

". . . I am glad to learn that on the occasion of the Silver Jubilee celebrations of the Ayurveda Vijnana Parishad you have decided to celebrate the Maharshi Charaka Jayanti and bring out a volume to commemorate the occasion . . . I wish the Ayurveda Vijnana Parishad an ever increasing life of service to the community and the organisers of the Maharshi Charaka Jayanti all success."

Dated, Sept. 12, 1956.

Shri Harekrishna Mahatab, *Ex-Governor of Bombay, now Chief Minister of Orissa,*

"Wishes the function all success."

Dated, 19-11-56.

MEMBERS OF THE RECEPTION COMMITTEE

Prof. Satyendra Nath Bose, Vice-Chancellor, Visva Bharati University (Chairman).

Dr. Surendranath Sen, Sheriff of Calcutta, Mayor Prof. Satish Chandra Ghosh, Hon'ble Justice Rama prasad Mukherjee, Dr. S. K. Chatterjee, Kj. Jogendranath Sahidarshantirtha, M. M. Haridas Siddhantabagish, Kj. Rakhaldas Sen, Dr. Kalidas Nag, Kj. Bimalananda Tarkatirtha, Dr. Anil Kumar Banerjee, Dr. Biresh Chandra Guha, Kj. Manindralal Dasgupta, Kj. Bijoykali Bhattacharjee, Dr. M. L. Roychoudhury, Dr. Dukhaharan Chakraborty, Kj. Girijashankar Sanyal, Prof. Devaprasad Ghosh, Kj. Prabhakar Chatterji, Shri D. Valisinha, Shri D. K. Sanyal, Kj. Naresh Chandra Ghosh, Kj. Atul Behari Dutt, Dr. Triguna Charan Sen, Dr. Naliniranjan Sengupta, Sri Pulin Behari Bose, Kj. Sachindranath Vidyabhusan, Sri Surendranath Banerji, Shri S. C. Nandi, Kj. Hriday Bhusan Gupta, Shri Ajit Chandra De, Shri Satyendranath Roy Choudhuri, Dr. Nihar Ranjan Roy, Kj. Ramchandra Mullick, Dr. M. R. Sofi, Dr. P. C. Rakshit, Shri Priyanath Sen, Shri Amiya Ranjan Sen, Prof. Girijaprasanna Majumder, Shri Amiya Kumar Mukherjee, Kj. Dhrubajyoti Chakraborty, Shri Suresh Chandra Das, Kj. Pyarilal Sarma, Shri Tridivesh Bose, Shri Sailendra Guha Roy, Kj. Jagadbandhu Das, Shri P. C. Barman, Kj. Bagala Kumar Majumder, Founder-President of Ayurveda Vijnan Parishad (Working Chairman), Shri Hariprasad Gupta (Treasurer), Kj. Sailendra Nath Sengupta and Prof. Paresh Ch. Chakraborty (Secretaries), Kj. Phani Bhusan Roy (Exhibition Secretary), Kj. Murari Mohan Ghosh (Organising Secretary), Kj. Amalacharan Sen (Pandal Secretary), Shri Jyotirindra Nath Majumder (Asst. Secretary).

The 28th December, 1956.

AYURVEDA VIJNANA PARISHAD,
52, Harrison Road,
Calcutta.

Printed by P. C. Ray at Sri Gouranga Press Private Ltd., 5, Chintamani Das Lane, Calcutta 9 and Published by Bagala Kumar Majumder, 52, Harrison Road, Calcutta.

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

রজত জয়ন্তী

১৩৩৮—১৩৬৩

স্থান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
দ্বারভাঙ্গা হল

তারিখ—১৬ই পৌষ, ১৩৬৩

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ,
৫২, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা—৯

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

রজত জয়ন্তী

১৩৩৮—১৩৬০

———•———

আজ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব। এ তার বয়সেরই পরিমাপ নহে, পরন্তু উদ্দেশ্য সাধনের দুর্গম পথে হতোদ্যম না হয়ে অবারিত কর্মস্রোতে চলবার একটা ধাপ মাত্র—সিদ্ধি নয়, সত্যের অনুসন্ধানে যাত্রা, অভিযাত্রীর দল চলেছে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধানে, নাহি দুঃখ, নাহি আত্মতৃপ্তির লেশ। সে বেশীদিনের কথা নয় যখন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র আক্রোশ, সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতার প্রতি অনাবিল নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা। সে-নিষ্ঠা নানা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল, কি সাহিত্যে, কি চিত্রকলায় কি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে, এমন কি, আয়ুর্বেদেও, তাই তাকে সম্পূর্ণতর করবার জন্য পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হলো। পরকে নিন্দা করলেই যেমন নিজে ভাল হওয়া যায় না, যার করা জ্ঞানকে আত্মীকরণ কর্তে যে সৃজনী শক্তির প্রয়োজন, তা না থাকলে পরগাছাই নিজের-মাটির-রসে-পুষ্ট বৃক্ষকে নিষীর্ণ করে ফেলে। একদিকে অর্থবানের সীমায়িত প্রবেশ লাভ ও অর্থহীনের অর্থসংস্থানে অসংগতা, অন্যদিকে, আয়ুর্বেদে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের উৎসাহ মন্দীভূত, অধিকার ও সুবিধাদানে সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ও অজ্ঞতা। এই সন্ধিক্ষণে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের আবির্ভাব, উদ্দেশ্য হ'লো কবিরাজ, ছাত্র ও বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে মিলন, আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে করে আয়ুর্বেদের ক্রমবর্দ্ধমান উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। গবেষণাগার, যাদুঘর, ভেষজোদ্যান, বিদ্যালয়, আরোগ্যশালা প্রভৃতি স্থাপন করে ঔষধ, ওষধি, রোগ, ধাতুর জারণ মারণ ও পরীক্ষণাদির দ্বারা উত্তরোত্তর বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব করে তোলা, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সমিতিগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা স্থাপন করে

সেগুলি সকলের জানবার ও পর্যালোচনা করবার সুযোগ সৃষ্টি করা, সর্বোপরি পূর্বাচার্যগণের প্রস্থাদি বিজ্ঞান সম্মতভাবে পঠনপাঠনের দ্বারা আয়ুর্বেদের মৌলিক ভিত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা ও তদ্দৃষ্টে নব নব আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্যগুলি সাধন করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই পরিষদ। সুতরাং আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও প্রগতিশীল গবেষণাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা. আয়ুর্বেদের নব জাগরণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, পথপ্রদর্শক, সংগঠক, দার্শনিক, অনুসন্ধিৎসু, আজীবন নিরলস কর্মী কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদারের আয়ুর্বেদের অগ্রগতি ও উৎকর্ষের জন্যে অনমনীয় উৎসাহ, নিষ্ঠা ও প্রতিভা, সূচিত করে। টোলের শিক্ষা ও কবিরাজদের কাছে পঠনপাঠন যখন বন্ধ হয়ে এল এবং কলেজী শিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষার অপহ্নব ঘটল তখন অনুশীলনের আন্দোলন একটু বিলম্বিত হলেও উহা যে যুক্তি ও বিজ্ঞানের দিগ্‌দর্শন, কেহই তা অস্বীকার কর্তে পারেন না। এই অনুশীলনের কথায় অনেকে কষ্ট হয়েছেন, উপহাসও করেছেন, তা বলে থামলে চলবে না। আয়ুর্বেদের অবরোধ কবে প্রতিষ্ঠান ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার দুর্দমনীয় আঘাতে উন্মুক্ত হবে কে জানে।

পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে যে-সকল কর্মপন্থা অনুসৃত হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস এস্থলে প্রদত্ত হ'লো :

(১) **বিজ্ঞান বিভাগ**- ইহার সাহায্যে ব্যবসায়ী, ঔষধ প্রস্তুত-কারী, শিক্ষক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু—সকলের মধ্যে পরস্পর জ্ঞানের আদান প্রদান এবং বিশেষ বিশেষ গবেষক গোষ্ঠীর মধ্যে মিলনসূত্র স্থাপন করা ;

(২) **চরক পাঠ চক্র**—ইহার সাহায্যে কেবল যে চরকসংহিতার পঠন পাঠন, মৌলিক তথ্যানুসন্ধান ও ব্যবহারিক জ্ঞানই লাভ করা যাবে তা নহে, এমন কি, অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ, ভারতের অন্যান্য স্থানে ও ভারতেতর দেশে যে সব আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ও সংস্কৃতি ছড়ান রয়েছে তার সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও অনুশীলনের সুযোগ গ্রহণ করা ;

৩) **আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সমিতি**—ইহা দ্বারা

আরোগ্যশালায় সংশ্লিষ্ট কবিরাজ, ছাত্র ও গবেষকদের সাহায্যে বিচিত্র রোগের চিকিৎসার পরিপ্রেক্ষিতে রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্বাচন, এমন কি, আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আয়ুর্বেদের ক্রমোন্নতি সম্ভব করে তোলা ;

(৪) **জনস্বাস্থ্য বিভাগ**—ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান—আয়ুর্বেদের জনস্বাস্থ্য নীতির, আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও পরীক্ষা দ্বারা, ক্রমোন্নতি সাধন ;

(৫) **গ্রন্থাগার**—উহা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার, অতীত ও বর্তমানের মনীষিগণের অমূল্য অবদান, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের খনি, অনুশীলনের সাহায্যে আয়ুর্বেদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও গবেষক সম্প্রদায় গঠনের সহায়ক ;

(৬) **পত্রিকা**—বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশ করবার জন্য একটি পত্রিকা থাকা দরকার : এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে একখানি বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে—ইহাই পরে ত্রৈমাসিক, কি মাসিকে পরিণত হবে।

যে সকল মহামহোপাধ্যায়গণ ও অনুসন্ধিৎসু আয়ুর্বেদের অনুশীলন ও ব্যবহারিক জ্ঞানের কষ্টিপাথরে আয়ুর্বেদের উন্নতি সাধনে ব্রতী আছেন তাদের তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ষড়্দর্শনতীর্থ আজীবন আয়ুর্বেদের সেবাব্রতী ; প্রমেহ, মদ, উদরী, প্লীহা ও যকৃত রোগে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন। তার প্রণীত 'আয়ুর্বেদ রত্নাকর' গ্রন্থে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিরাজ শ্রীগিরিজা শঙ্কর সান্যাল অভিনব চিকিৎসা-প্রণালী ও চিকিৎসাতত্ত্বের নূতন দর্শন আবিষ্কার করেছেন। তার ঔষধগুলি এক একটি ধাতু ও ওষধির দ্বারা প্রস্তুত। তিনি 'প্রকাশিকা ভেষজ বিজ্ঞান' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন আরোগ্যশালায় নানা রোগের অভিজ্ঞতা সম্বলিত 'আরোগ্যমঞ্জরী' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কবিরাজ শ্রীনিত্যকণ্ঠ গুপ্ত মহাশয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সর্পবিষ প্রয়োগে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করেছেন। কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গবেষণা-

মূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন ও টোটকা সম্বন্ধে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তৎসম্বন্ধে পুস্তকও লিখেছেন। কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটুজ্জী কর্কট ও যক্ষ্মারোগের তথ্যানুসন্ধানে রত আছেন। এ সম্বন্ধে তিনি পুস্তক ও লিখেছেন। কবিরাজ শ্রীমতুল বিহারী দত্ত মানসিক বিকারের চিকিৎসায় লিপ্ত আছেন। কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ 'পদ্ম বিজ্ঞান' নামে একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কবিরাজ শ্রীবিনয় শঙ্কর রায় কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী—এ বিষয়ে তিনি অনুশীলন করে থাকেন। প্রবীণ কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন, কবিরাজ প্রমথনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, কবিরাজ শ্যামাপদ লাল দাশগুপ্ত, কবিরাজ শ্রীকুসুমবন্ধু ভট্টাচার্য প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ সমূহের পাঠোদ্ধার ও তথ্যানুসন্ধান করে অনুশীলনের সাহায্য করে থাকেন। ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী উপদেষ্টা হিসাবে পরিষদের সহিত যুক্ত আছেন। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সর্ববিষয়ে পরিচালনা করে থাকেন। সারগুণগণ ওষধি, ধাতু-উপধাতু, রোগ প্রভৃতি বিষয়েও অনুশীলন করে থাকেন। তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রবন্ধাকারে দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

যারা পরিষদের সুদিনে ও দুর্দিনে, অনুষ্ঠানে ও প্রতি কাজে সহযোগিতা করে থাকেন, পরামর্শ দানে দুর্গম পথ সুগম করে তুলেছেন, সভাপতিত্বও করেছেন তাদের নাম স্মরণ করলে, আশাকরি, অত্যুক্তি হবে না। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস, রাধাকৃষ্ণান পরিষদের কর্মাবলি বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করে থাকেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু তার স্নেহ ও অধ্যাত্মিকতার শীতল ছায়ায় পরিষদকে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন ও চরক প্রশস্তি দিবসের উদ্বোধনও করেছেন। তিনি আধুনিক হলেও আয়ুর্বেদের পূজারী, কেন না, সেখানেও সত্য নিহিত আছে। ভূতপূর্ব বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভাপতি সত্যেন্দ্র নাথ মিত্র, আশুতোষ অধ্যাপক প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় আইন সভার ডেপুটী সভাপতি অখিল

চন্দ্র দত্ত, কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ষড়দর্শনতীর্থ, কবিরাজ প্রমথ নাথ রায়, শ্রীঅজিৎ চন্দ্র দে, কবিরাজ শিবনাথ সেন, নলিনীরঞ্জন সেন, কবিরাজ সুশীল চন্দ্র সেন, কবিরাজ শরচ্চন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, ডাঃ শ্রীসুনীতি কুমার চাটার্জি, মেয়র শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ শ্রীপ্রতাপ সিং, কবিরাজ শ্রীহরিবল্লভ যোশী, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীঅমৃতোষ দাশ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীবীরেন চন্দ্র গুহ, ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মৈত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরি দাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ডাঃ শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কেহ সভাপতি, কেহ শুভানুধ্যায়ী, আবার কেহ পরামর্শদাতা রূপে পরিষদের সহিত সংযোগ রক্ষা করেছেন।

পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন তিন দিবসব্যাপী চলে, বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বক্তা আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ তথ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকেন। এই ছয় বৎসর যাবৎ 'চরক প্রশস্তি দিবস' পালিত হয়ে থাকে—উদ্দেশ্য, চরকের ন্যায় সত্যদ্রষ্টা ঋষি-বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়কর আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবী গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে বিজ্ঞান চর্চায় সাবলীল গতি প্রবর্তন করা।

এবারের মহর্ষি চরক জয়ন্তী উদ্‌যাপন একটা ছুরূহ কাজ হলেও চরকের তর্পণ, মনন ও ধ্যানে সর্বতোভাবে যাতে আয়ুর্বেদের সত্য ও তথ্য উত্তরোত্তর উদ্ধার করা যেতে পারে তার জন্য চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ ও ভারতের জলবায়ুতে পরিপুষ্ট ও ভারতীয়দের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সারবত্তা উপলব্ধি করা।

আয়ুর্বেদের সত্য প্রচার যাতে গৃহে গৃহে বিস্তৃতি লাভ কর্তে পারে ও খাটি আয়ুর্বেদ সেবী ও খাটি ঔষধ ও চিকিৎসার ক্রমোন্নতি কার্যকরী হয়, তার জন্য পরিষদ সর্বমুখী প্রচেষ্টা অনুসরণ করে থাকে।

আয়ুর্বেদের সমস্যার সমাধান শুধু কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের কর্তব্য নহে, ইহা সর্বসাধারণের, কেননা, ইহার সহিত দেশের ও দশের সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্য জড়িত। সুতরাং এই মহর্ষি

চরক জয়ন্তী ও পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব যেন বার্ষিক জাঁকজমকের বার্থতায় পর্যবসিত না হয়। বড়ের পর পলিমাটি যেমন ধরিত্রী শস্য-শ্যামল ও শ্রীসম্পন্ন করে, তেমন এই উৎসব-আনন্দের উৎসারিত পবিত্র প্রেরণা জনচিত্তে, বিশেষত চিকিৎসকের শুভবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা উদ্ভাসিত করুক। সমস্ত গ্লানি, স্বার্থপরতা, ও সঙ্কীর্ণতা যেন রবির কিরণে কুয়াশার মত বিদূরীত হয়। এই জয়ন্তীর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সাধনার জয়যাত্রা সার্থক হোক, নবজীবনের অরুণ আলো সকলের হৃদয়ে নবজাগরণের প্রেরণা প্রদান করুক। বন্দেমাতরম্।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ১৩৬৩ সনের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য,

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীহরি প্রসাদ গুপ্ত,

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ষড়দর্শনতীর্থ,

কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, এ, এম, ডি,

ডাঃ শ্রীহরখরণ চক্রবর্তী, রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

শ্রীপুলিন বিহারী বসু,

শ্রীঅমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীগিরিজাশঙ্কর সান্যাল,

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ মজুমদার

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

১৬ই পৌষ, ১৩৬৩

ক্লাসিক প্রেস
২১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিকী

১৩৬৭

উনত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন

২৭শে পৌষ হইতে ১লা মাঘ

সূচীপত্র

১।	প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির অভিভাষণ	কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায়
২।	ভারতীয় সংস্কৃতিতে আয়ুর্ব্বেদ	অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন
৩।	আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা	কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
৪।	আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা কাকে বলে ?	কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ
৫।	আয়ুর্ব্বেদে উদর-রোগ	কবিরাজ শ্রীসুধীনাথ রায়
৬।	কায়চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীমনসা চরণ সেন

কার্য্যালয়—আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

Dabur
Aspires
Nation's
Health

DABUR (DR S.K. BURMAN)
PRIVATE LIMITED.
CALCUTTA-29

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

ঊনত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা

উদ্বোধন উৎসব

রবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৮৭ (৮ই জানুয়ারী, ১৯৮১)

স্থান—আশুতোষ হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

কালস্রোতে অনেক কিছু ভেসে যায়, আবার নব নব উদ্যম ও প্রকাশের তরঙ্গ লীলায়িত হয়ে দেশ ও সমাজকে এমনকি, বিশ্বকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। পত্তনের মহামারী যেমন আসে, উদ্ধারের আনন্দও তেমন স্বতঃবেগে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জাতির জীবনে আসে, চিন্তাস্রোতে অবরুদ্ধ হয় পুঞ্জীভূত আবর্জনায়—জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারায় তখন চরা পড়ে যায়। কিন্তু সেবার থাকে না—সেবারে দাস-সুলভ অনেতোষ সুযোগে আত্মচেতনা অবলুপ্ত করে। ভারতীয় সভ্যতা একদা বিশ্বের মানসক্ষেত্র উর্বর করে তুলেছিল দর্শনে সাহিত্যে শিল্পকলায় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রকলায় সামাজিক ও বৈষয়িক ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বোপরি, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার বহুমুখী ধারায়। যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব হয়ে থাকে সমাজ দেহ হতে পচনশীল বিষাক্ত করবার জন্য—জীবনের পরাজয় অস্বীকার করবার জন্য নবীনের আহ্বানে। এক একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে প্রয়োজনের তাগিদে কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করে—মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রেরণা ও অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করবার জন্য। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের আবির্ভাব ও ব্যতিক্রম নয়—কালের অলক্ষ্য আয়োজনে উহা একটি নিমিত্ত। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে উহার বয়স ঊনত্রিংশ হলেও নবীন দীপ্তিতে উহা দীপ্তিমান। জীর্ণ জগৎ, ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠান চির যুগের বিজ্ঞানকেন্দ্র গড়ে তুলে। নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের চেতনায় চঞ্চল। জ্ঞানপথিক নিরবচ্ছিন্ন গতিপথে যুগের পর যুগ এক এক করে অনুদ্ঘাটিত জ্ঞানভাণ্ডার অক্ষয় করে তোলে। যেখানে জ্ঞানানুশীলনের ধারা জড়তা ও অজ্ঞতার আবর্জনায় আবদ্ধ হয় নবাগতের স্রোতের মত সেখানে সৃষ্টির সিংহদ্বার খুলে দেয় না চিরতরে—অন্যের প্রতিষ্ঠা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনা দিকে দিকে।

যুগের দীক্ষাই শিক্ষা ও সৃষ্টির দীক্ষা। আধারে ও অনুভবের সংগত পথে কিছুই ধরা বাঁধে না। ধরতে পড়ে যায় অন্তরে ও বাহিরে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিচিত্র আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকের নিরলস সাধনার ফল। তপোবনের শিক্ষা ও তপস্যা অন্তরে ও সৃষ্টির অন্তর্লোক উন্মুক্ত করত। তা' শুধু আত্মা ও মনের নয়,দেহ ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনেও নিয়োজিত হত। অন্তর্যামী চাকচিক্য জন্ম দিতে পারে—

শান্তি ও মানবের অনবৈদ্য প্রভা বিকিরণ করতে পারে না। তারও একটা প্রয়োজন আছে বিশাল নাট্যশালার অগণিত অভিনয়ের প্রয়োজনে। কিন্তু আয়ুর্বেদের শাশ্বত নীতি ও নানা আবিষ্কার তাকে একটা পৃথক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে পরিণত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ধাঁচে তাকে রূপান্তরিত করতে গেলে তার বৈশিষ্ট্য হারাতে হবে। অনাদৃত হয়েও যে বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ রোগীজনের রোগ নিরাময় করতে পেরেছে হাজার হাজার বৎসর ধরে, তার নিশ্চিতই নিজের পথে চলবার একটা অধিকার আছে। এই গতিশীল একনিষ্ঠতা থেকে তাকে কেহ বঞ্চিত করতে পারে না। ঘোল নৈঃ বলল করে তাকে রাতারাতি ইংরিজি ঢঙে শিক্ষিত ইংরাজদল করলে ঔষধ আয়ুর স্বাস্থ্যরোধে তার আত্মহত্যাই করা হবে কোন অজ্ঞান তার ক্ষীণ সত্তা পুষ্ট করতে পারবে না। আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষিলতায় টেনা অবলম্বন না হয়। তা হ'লে দেশের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি, এমনকি মনীষার প্রতি—অবমাননা করা হবে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের আকাশে যে আয়ুর্বেদ জ্যোতিষ্কবৃন্দ উদ্ভাসিত হয়েছিলেন, পরবর্তী কালে পরানুকরণতা ও বিদেশী অপপ্রচারের ফলে তার অপহ্নব ঘটল। তাকে আমাদেরই খোঁজবাতে হবে তপস্যা ও অনুশীলনের সাহায্যে। পরিষদ তার ২৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রণালীর মাধ্যমে ভারতের আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানকে যথাপরিকল্প। বয়স অনুযায়ে তার শরীর পরিণত কম, দৃষ্টি অনন্ত ও অবস্থা অনুকূল হ'লেও আয়ুর্বেদসেবী ও জনসাধারণের মধ্যে আয়ুর্বেদের গবেষণার আগ্রহ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য তার সকল অভিব্যক্তি ও চিকিৎসা নৈপুণ্যে সাফল্যের গতি প্রবাহিত করে তার প্রচুর প্রয়াস প্রণিধানযোগ্য—যতই কেন দুর্যোগের মধ্যে তাকে চলতে হোক।

পরিষদের সারস্বত সত্তা বিজ্ঞানানুশীলনের প্রাণকেন্দ্র। বিভিন্ন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাও চিকিৎসা-শৈলীর আদান প্রদান এবং আয়ুর্বেদগ্রন্থ ও পুঁথির তথ্যানুসন্ধানের সাহায্যে বিজ্ঞানচর্চার গতিশীলতা প্রবর্তন করাই উহার উদ্দেশ্য; উহাতে নানা বিষয়ে উপ-সমিতি গঠন করে পারদর্শী কবিরাজদের অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানরাশির আলোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের পথ মুক্ত করে দেওয়া হয়। এযাবৎ অর্শ, ভগ্ন চিকিৎসা, কৌমারভৃত্য, সংক্রামক ব্যাধি, মনোবিজ্ঞান (মানস), ওষধি, বস্ত্র, রসশাস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ও সংস্কৃতি এই এগারটী বিষয়ে উপ-সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটী বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণফল উপস্থাপিত করেন এবং বিভিন্ন চিকিৎসকের মধ্যে পরস্পর আলোচনা সুরু হয়। এমনি করে সারাবৎসর অনুসন্ধিৎসার লোহার কাঠির সংস্পর্শে বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

বেদোত্তর আয়ুর্বেদ মনীষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরক সংহিতার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সমগ্র আয়ুর্বেদ সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্মকুশলতা উজ্জীবিত হয়। যে মৌলিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ুর্বেদে নিহিত আছে তার উপলব্ধি ও হাতেকলমে প্রয়োগ তথা আয়ুর্বেদের অগ্রসরতা প্রতিপাদন করবে। চরকের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করে চিকিৎসার পারদর্শিতা লাভ করবার জন্য চরকে অনুপ্রবেশ করা প্রয়োজন। অর্থোপার্জনের জন্য জ্ঞানলাভ করলেও জ্ঞানানুশীলনের পরম কর্তব্য সম্পাদনে উৎসাহী না হ'লে কোন বিজ্ঞানই বাঁচতে পারে না। আয়ুর্বেদ শুধু একটা চিকিৎসার মতবাদ প্রচার করে না, নিছক প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক, ছাত্র ও চিকিৎসক—সকলের কেবল চরকে নয়, সুশ্রুত, বাগভট, রসশাস্ত্র ও প্রথাবিজ্ঞানের

জ্ঞানানুশীলনের আধারে আধার আয়ুর্বেদের পুনর্জীবন সম্ভব হবে। অতীত ও বর্তমানই ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

যদিও সকল বিভাগেই বিজ্ঞানের অনুশীলন অনুসৃত হয়ে থাকে তবু বিজ্ঞান বিভাগের বৈশিষ্ট্য হলো তুলনামূলক ভাবে বাহিরের জ্ঞান নীতিগত করে গ্রহণ করবার অবকাশ এখানে আছে। তাতে বাংলার কি বাংলার বাহিরের যে কোন দেশের লোক বা চিকিৎসকের সকল বিভাগে বিচিত্র নীতি, তথ্য, দ্রব্য, ঔষধনির্মাণ, শারীরবিদ্যা ও শারীরক্রিয়া বিদ্যা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষত জ্ঞান আহরণের সুযোগ উপস্থিত হবে।

অনুশীলনের জন্য ও অনুশীলনে উৎসাহ জাগ্রত করবার জন্য যেখানে যা' কিছু আছে লাগাবার আছে পরিষদ তার সুযোগ গ্রহণ করেছে। আরোগ্যশালা তার মধ্যে অন্যতম। চিকিৎসকের প্রতিকর্মে ও চিন্তায়, ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবসায়, চলতে ফিরতে রোগ ও রোগী, ঔষধ ও পথ্য, যন্ত্র ও প্রবিধি সর্ববিষয়ে বিশেষভাবে আরোগ্যশালার চিকিৎসার বিচিত্র রোগ বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক অনুভূতির আদান প্রদানের সহযোগিতায় যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত হয় তা-ই আরোগ্যশালার চিকিৎসার উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে। ব্যক্তিগত চিকিৎসায় যে অসুবিধা থাকে আরোগ্যশালায় চিকিৎসার তার চেয়ে ঢের বেশি সুযোগ মেলে ঔষধ প্রয়োগ ও ফলাফল নির্ণয়ে। অবশ্য অভ্যাগত চিকিৎসকই এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। চিকিৎসার সৌকর্যার্থে ও উন্নতি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে আরোগ্যশালায় কর্তৃপক্ষগণ দৃষ্টি দিলে রোগী চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পথ্যাদি ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিণতি আশা করা যায়। পরানুকরণপ্রিয়তার অন্ধ অনুকরণে সৃষ্টি হয় নিস্প্রভ—তেজ হয় সীমায়িত —তা বলে পরানুকরণের বিজাতীয় মনোভাব যেন সংক্রামিত না হয়।

যাতে চরকপূর্ব ও চরকোত্তর আয়ুর্বেদ মনীষার প্রাণকেন্দ্র চরকসংহিতার মহত্ত্ব সম্পদের সহিত চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় তার জন্য চরক প্রসঙ্গ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এতে করে জনসাধারণের মনেও আয়ুর্বেদ সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্বের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করবার সুযোগ উপস্থিত হবে। বিদেশী আক্রমণের বিধ্বংসতায় আয়ুর্বেদের অনেক হস্তলিখি লুপ্তপ্রায় হয়েছে। বর্তমানে আয়ুর্বেদীয় ঐতিহ্য ও বৈজ্ঞানিক অবদান যা আছে তার উপর নির্ভর করে সুস্থতর আয়ুর্বেদ সংস্করণে পরিষদ ব্রতী আছে। নিখিল ভারতব্যাপী চরক জয়ন্তি উদ্‌যাপন তারই নিদর্শন।

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির মিলনেই বিশ্বসংস্কৃতি রচিত হতে পারে। বিচিত্র সাংস্কৃতিক কৌতিকলাপ তা তবু দর্শনে, সাহিত্যে, চিত্রে শিল্পে, সামাজিক ও বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে নয় চিকিৎসা শাস্ত্রের দুরূহ ও জটিল আবিষ্কারেও আন্তর্জাতিক বিশ্বসংস্কৃতি সৃজনে সহায়তা করবে। আয়ুর্বেদ অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মত নয়, উহা একটা সামগ্রিক মানব-মানস-রচনার দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়—কেবল রোগ ব্যাধিকেই করে নাই—গোটা মানুষের সমষ্টিগত উৎকর্ষসাধনের বিধিব্যবস্থা উহাতে সন্নিবেশিত। গোলাপের পাপড়ির ব্যবচ্ছেদে ফুলের ফুলত্ব থাকে না-তার বিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। অক্ষত ফুলের মাধুর্য ও সুরভির ন্যায় মানুষের সামগ্রিক মাধুর্য ও গৌরব কেবল এ জীবনে নয়, পর

জীবনেও প্রসারিত। তার স্বরূপটুকু সংস্কৃতি ব্যবধানের জন্য নয়—সকলের মধ্যে তার জীবন্ত অস্তিত্ব উপলব্ধি করা। আজ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সমাবেশের মধ্যে বিশ্রান্ত চিত্ত কোথাও শান্তি খুঁজে পায় না। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ নেই—একটা আর একটার পরিপূরক—একটি খণ্ডিত দেহ, আর একটি সম্পূর্ণ দেহ যেন ছিন্ন পাপড়ি আর ফুল।

বর্তমানের জাঁকজমকের আড়ালে যারা নিভৃতে জানে কি বিজ্ঞানের সাধনা করেন তারা চরম লোক-লোচনের অন্তরালে চিরবিদায় করবেন কিন্তু তাদের অতি ক্ষুদ্র প্রয়াসও ব্যর্থ হবে না বৃহত্তর বিজ্ঞানের সৃষ্টি কার্যে সহায়তা করবে। এখনো যে লক্ষ লক্ষ ব্যাধিক্লিষ্ট রোগীজনের শান্তি ও নিরাময়তা সম্পাদিত হচ্ছে—তা এই অবজ্ঞাত বিজ্ঞানীচিকিৎসকসম্প্রদায়ের অক্লান্ত সাধনায়। দারুণ সঙ্কটে যারা যোগদান করে বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাদের নাম ও গবেষণার বিষয় নিম্নে লিপিবদ্ধ করি

স্বর্গীয় ডাঃ সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য—বিরক্তক্ত ওপিয়োরোগ কবিরাজ শ্রীসুরারি মোহন ঘোষ—আয়ুর্বেদে গবেষণা, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্লেষণরীতি, কবিরাজ শ্রীসত্য চন্দ্র ভট্টাচার্য—সংক্রামক ব্যাধি, কবিরাজ শ্রীঅমলা চরণ সেন—ওষধিবিজ্ঞান, অধ্যাপক শ্রীচিন্তা-হরণ চক্রবর্তী—আয়ুর্বেদে রাজযক্ষ্মার স্থান, কবিরাজ শ্রীসুধী নাথ রায়—বক্ষঃ রোগ ও তাহার চিকিৎসা, কবিরাজ শ্রীবিমলা কুমার মজুমদার—চক্ষুর 'বাত্মলাকলীয়' ও পিত্ত রোগ, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরানন্দর সেন শাস্ত্রী—চক্ষুর সম্বন্ধ, কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র নাগ—চক্ষুরোগ। এ ছাড়া যারা পরিষদের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠিতে আন্তরিকভাবে যোগদান করে আয়ুর্বেদের তথ্য ও বিজ্ঞানালোচনায় নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সম্ভার পরিবেশন করেন তাঁরা হলেন কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার-তীর্থ, কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ শ্রীনিবিড়া শঙ্কর সান্যাল, কবিরাজ শ্রীঅতুল বিহারী দত্ত, কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মা, কবিরাজ শ্রীব্রজনাথ শর্মা, কবিরাজ শ্রীহেরম্ব নাথ শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, কবিরাজ শ্রীহরিপদ কুমার দত্ত, কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ গুপ্ত মজুমদার, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি, কবিরাজ শ্রীসুভূষণ সেন, কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন, কবিরাজ শ্রীপ্রেমানন্দ দাশগুপ্ত, কবিরাজ শ্রীমহীন্দ্র-লাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

আমাদের সাধনে বহু সময়। সুদীর্ঘীভূত হয়ে থাকে, বহু সমস্যা সমাধানাপেক্ষ। রসশাস্ত্রে ধাতুর মোধন, জারণ, মারণ সম্বন্ধে যুক্ত বৈয়াসগণ বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। সর্ববাদী সম্মত একটি পন্থা ধাতুর মাপ ও গুণাবলি বজায় রেখে করা যেতে পারে—আবার বিভিন্ন পন্থার সাহায্য থাকলে তাদের পরিত্যাগ করাও জ্ঞানের পক্ষে অন্তরায়। সুতরাং এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান একান্ত প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত 'অর্ক প্রকাশে' যে সকল অর্ক সমূহের বর্ণনা ও প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে এবং আসব, অরিষ্ট, সুরা প্রভৃতি বিষয়ে যে গুণাগুণ ও প্রস্তুতপ্রথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে—এই সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দরকার। আধুনিক প্রথার সহিত তুলনা করে দেখা দরকার কোনটী বিশেষ ফলপ্রদ ও সময়োপযোগী।

বিজ্ঞানানুশীলনের কথা বলতে সাধারণত আজ কাল আধুনিক প্রণালীর কথাই মনে পড়ে, বিশেষত দরকারের, কেননা আয়ুর্বেদ গবেষণার নামে অনেক

ও সন্দেহ যে গবেষণা হচ্ছে তা আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদের মৌলিক চিকিৎসা রীতির পরিপন্থী। ইহা স্মরণে রাখতেন যে একই জিনিস বিচিত্র চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মে প্রস্তুত করণের জন্য বিচিত্র ফল প্রদান করে। তাই সমষ্টিগত প্রথা যার চিত্তে বৈজ্ঞানিক রীতি আয়ুর্বেদের সমষ্টিগত প্রয়োগের বিরোধী—স্বাভাবিক ভাবেই ইহা আয়ুর্বেদের আশানুরূপ ফল প্রদান করবে না। আধুনিক নিয়মে রোগিক অবস্থা রক্ষিত হয় না। বীজাণুবাদ স্বীকার করে বীজাণুধ্বংসী যে ঔষধগুলি নির্মাণ হচ্ছে তা বীজাণু ধ্বংস কর্তে পারে—রোগিক বিকৃত ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভাবে সংশোধন কর্তে পারে না, তাই অন্য রোগ সৃষ্টি করে—তা ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

ওষধি পরিচিতি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে। ইহার সমাক্ জ্ঞানাভাবে অনেক সময় পরিপূর্ণ ফল লাভ হয় না। ইহার সঠিক ব্যবস্থা কর্তে হলে একটি নিজস্ব কেমতোজান থাকা দরকার। তা বলে ওষধির পরিচয় বন্ধ থাকতে পারে না—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন যা স্থানীয় অধিবাসীর নিকট হ'তে গাছগাছড়ার উৎপত্তি কাল ও স্থান, পরিপূর্ণতা লাভে ও সংগ্রহের কাল ও সংগ্রহণ রীতি সকলই অনুধাবন করা দরকার। ইহার প্রয়োগবিধি, বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিশেষ বিশেষ গুণবিচার, কোন স্থানে বা কোন রোগে প্রযুজ্য, কি মাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রচেষ্টা করণীয়।

প্রকৃতি যে অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছে দিবারাত্রি তাকে কাজে লাগাবার বিজ্ঞান-বুদ্ধিই মানবকে উন্নত করেছে। গাছগাছড়া, পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, জীব ও জন্তুর যে ক্ষুদ্র রহস্য যুক্তির মত নিস্তব্ধ হয়ে আছে তার বিশ্লেষণের দ্বারা বিশ্বে কত বিরাট বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এর বৈজ্ঞানিক সমাবেশ সম্বন্ধে ইহা অনন্ত জ্ঞানের কতটুকু। আর্য ঋষিদের অনুসন্ধিৎসার গভীরতা এত ছিল যে তাদের উদ্ভাবিত তথ্যগুলি এখনো সত্য বলে গৃহীত হয়ে থাকে। দেশ কাল পাত্র ভেদে রোগ ও ঔষধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলে কত নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয় যা চিকিৎসা, রোগ, ঔষধ, পরিবেশের ফলাফল নিরূপণে অনেক সাহায্য করে। গত বৎসরের মত এবারও পরিষদ কলিকাতার পরঃ-অঞ্চলে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে। তাতে দেখা গেছে যে তারা শতকরা ১০ জন নীরোগ, ৪০ জন অগ্নিমান্দ্য রোগে ভোগে, আর ৪০ জন ক্লিমি ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত। সাধারণস্বাস্থ্যই প্রায় সকলের খারাপ। এতে অঞ্চলের পরিবেশ উৎসাহ-জনক নয়, তারপর আর্থিক অভাব সর্বত্রই বিদ্যমান। মানোন্নয়নের নামে অর্থের যোগাযোগে যে অর্থনৈতিক অবিচার চলেছে তাকে বন্ধ না কর্তে পারলে এই ঐশ্বর্যশালী কলিকাতা শহরের অপবাদ ঘুচবে না। এমনি করে সর্ববিষয়ে অনুসন্ধান করবার ব্যবস্থা পরিষদকে কর্তে হবে। তবেই চিকিৎসা বিষয়ে অভিনব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়ে আয়ুর্বেদের গতিশীল ঐশ্বর্য প্রতিভাত হবে।

বাংলার মুখরুচি আজ নিস্প্রভ। অন্যান্য প্রদেশে আয়ুর্বেদ বিল করে পাশ হয়েছে। পশ্চিম বাংলা সরকার এখন তাতে হাত দিলেন। তা হলেও সরকারকে প্রশংসাই কর্তে হবে এই জন্য। কিন্তু বিলের দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করা সরকারের উচিত। বিলের রিমিটেশন কি প্রয়োজন তা প্রয়োজন। আর কবিরাজদের অধিকার ডাক্তারদের

সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া সমীচীন এবং কবিরাজদের অধিকার বিস্তৃত হবে সরকারী বিভিন্ন স্তরযানায়। আয়ুর্বেদের শিক্ষা যদি পরিচালিত হবে বাহিরের লোকের এখানে কর্তৃত্ব বিস্তার করার অবকাশ থাকবে না। যতই বিল আসুক না কেন কবিরাজদের কর্মনিষ্ঠতা ও কুশলতা, আয়ুর্বেদে জ্ঞান এই সমস্তই আয়ুর্বেদের উন্নতি বিধান কর্তে সহায়তা করবে। সুতরাং চিকিৎসকগণ এবিষয়ে জ্ঞানানুশীলন যেমন করবেন, তেমন অধিকারও আদায় কর্তে তাদের বদ্ধপরিকর হতে হবে।

ভিন্ন আয়ুর্বেদের ভয়াবহ পরিণতি, না আয়ুর্বেদের উন্নতি করবে, না উহার মৌলিকতা ও শ্রীবৃদ্ধি করবে বরং পরমাত্মার চাপে উহাকে প্রাণহীন করে তুলবে। ভিটামিন জাতীয় চাকচিক্য বেশি দিন টিকে না। আয়ুর্বেদ যদি নিজের দাবীর সমর্থন না হতে পারে তবে পরের আলোয় কিছু দিন আলোকিত থাকতে পারে—বেশি দিন নয়। প্রকৃত পক্ষে যার মৌলিকতা ও সারবত্তা অবদান তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু সরকারী অনুমোদন ও সাহায্য থাকলেও আয়ুর্বেদসেবীদিগের পক্ষ হতে আয়ুর্বেদের সারস্বত জ্ঞান আহরণ ও আহৃত জ্ঞানের বিশ্লেষণী প্রচেষ্টা উহাকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করাবার পাথেয়।

এটা ধ্রুবসত্য কর্তে হবে যে মৌলিক চিন্তাধারা প্রত্যক্ষজ্ঞান আহরণে অধিকের অধ্যবসায়, মনন ও প্রত্যক্ষ ফলের বিস্তৃত পরিচয় লাভ করা থেকে তার অনুসন্ধিৎসা ও অনুসরণের দ্বার দিয়ে সূত্রনের আবির্ভাব সম্ভব হবে—সংমিশ্রণের পন্থায় নহে। আর একটি কথা, ভূবিপ্রধান সভ্যতার স্তর হ'তে শিল্প-প্রধান স্তরে সামাজিক, বৈষয়িক ও আর্থিক পরিবর্তনের সহিত বেশ বৈচিত্র্য, কৃষি ও গৃহিণী আচার ব্যবহার নব পর্যায়ে প্রবর্তিত হবে। পরিবর্তিত অবস্থায় চলবার বিজ্ঞানবুদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমন আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতিসমূহ বজায় রেখে দ্রুত ফলপ্রদ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য ঔষধ, স্বস্থবৃত্তের নব প্রয়োগ, পঞ্চায়েতের পুনরুদ্ধার, প্রাথমিক সাহায্যদান শিক্ষা, সমস্ত দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা প্রভৃতির ফলাফল অবশ্য করণীয়।

ঘোর অন্ধকার রজনীর অবসানে উষার আলো যেমন দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তোলে, তেমনি পরাধীনতার পঙ্কজাল হতে মুক্ত হবার পর আপনাদের জ্ঞান, বিজ্ঞানের নব জাগরণে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হোক—অমুলোকের প্রতিভাদীপ্ত মনীষা জ্ঞান ও চেতনের ঘনত্ব ভেদ করে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান ধারায় অজানাকার অন্তর্ধ ক্ষেত্র অতিবিক্ত করুন। অনুকরণের বিষবাষ্পে যদি মোহগ্রস্ত হন তবে শুধু আয়ুর্বেদ নয়, অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতির অবদান ও ঐতিহ্য ও দাসসুলভ মনোভাবে অবলুপ্ত হবে। সুতরাং পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কেবল একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নহে। ইহার মাধ্যমে গবেষকদের মধ্যে ভাবের ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান প্রদান ও জনসাধারণের সহিত আত্মিক মিলনের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হবে। আসুন সকলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হ'য়ে এই উপনিষদের বাণী স্মরণ করি জগতের কল্যাণের জন্য—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
ওঁ শান্তি: শান্তি: শান্তি:॥

ভারতীয় সংস্কৃতিতে আয়ুর্বেদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

আমরা বনস্পতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক বলিয়া মনে করি। বনস্পতির শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে প্রসারিত, কিন্তু ইহার মূল ভূগর্ভে নিহিত। আবার স্বর্গে ও মর্ত্যে যেন সেতু রচনা করে এই বনস্পতি। ভারতীয় সংস্কৃতিরও শাখা-প্রশাখা বহু কিন্তু ইহার মূল রহিয়াছে লোকলোচনের অন্তরালে, ভূতলের তিমির গর্ভে, মানুষের স্থূল দৃষ্টি সেখানে পৌঁছায় না, অথচ সাধকের দিব্যদৃষ্টি সেখানে প্রতিহত হয় না। আবার ভারতীয় সংস্কৃতি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে মিলন ঘটায়। ভারত পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করে না কিন্তু তাহার দৃষ্টি স্বর্গাভিসারী। জীবনকে অস্বীকার করে নাই বলিয়াই ভারত অর্থ-শাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছে, চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যার চর্চা করিয়াছে, চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। পরা বিদ্যার সমান মর্য্যাদা না দিলেও ভারত অপরা বিদ্যার চর্চায় কোনদিন কুণ্ঠিত হয় নাই। ভারতের কোন কোন মহাপুরুষ অবশ্য বৈরাগ্যের জয়গান করিয়াছেন এবং কর্মত্যাগকে মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু যাঁহা ভারতীয় আদর্শ পরিপূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বেরই আদর্শ। মহামতি চরক এই আদর্শের কথাই বলিয়াছেন 'ত্রিসৈষণীয়' অধ্যায়ে। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অবশ্য কর্ত্তব্য আছে। প্রথমত মানুষকে প্রাণরক্ষা বা আত্মরক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে, দ্বিতীয়ত, প্রত্যেককে সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন ও পরিবার-প্রতিপালন করিতে হইবে (ব্ল্যাক মার্কেটিং বা চৌর্য্যের দ্বারা নয়), তৃতীয়ত, প্রত্যেককেই ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী হইতে হইবে, আর পরলোকে যাহাতে কল্যাণ হয় সেই পথে চলিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, সেই চতুরতাই যথার্থ চতুরতা যাহাতে ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল হয়, এদিক ওদিক দুদিকই রক্ষা পায়, 'যা লোকযাত্রানেত্রী তদ্ভবতাদ্ যা চাতুরী চাতুরী'।

আয়ুর্বেদ ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান গৌরবের স্থল, তাই এই আয়ুর্বেদকে ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে চলিবে না। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই দৃষ্টিকোণ হইতেই ভারতের অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির বিচার করিতে হইবে। আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য, মানুষকে দেহে ও মনে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী করা, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের অন্তরায়সমূহ দূর করা। ভারতের অধিনায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন -

'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্তারো শ্রেয়সো জীবিতস্য চ'।

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য চতুর্বর্গ লাভ করা। এই চতুর্বর্গ হইতেছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। আরোগ্যই এই চতুর্বর্গের মূল। রোগ আমাদের আয়ু ও জীবন নাশ করে, তাই এই মূলকেও নাশ করে। অতএব তপস্যা ও উপবাস, অধ্যয়ন ও ব্রহ্ম-

চর্য্যা, ব্রত ও মানুষ বিগ্রহবরূপ (তপোপবাসাধারন-ব্রহ্মচর্য্যব্রতাত্মকম্) এই রোগসমূহকে দূর করিতে হইবে। শরীরে কালা লাগিলে মানুষ সেস্থান ধৌত করে, কিন্তু শরীরে যাহাতে কালা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই তো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মানুষের রোগ হয়, আর এই রোগ প্রধানত দেহকে বা মনকে আশ্রয় করিতে পারে। রুগ্ন ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করার চেষ্টা করিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষ যাহাতে নীরোগ দেহে ও সুস্থ মনে থাকে, সে উপদেশও মানুষকে দিতে হইবে। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা এই সব নির্দ্দেশ পালন করিবেন। এই ভাবে তাঁহারা সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের (sound mind in a sound body) অধিকারী হইবেন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য যে সমস্ত নির্দ্দেশ প্রাচীনেরা দিয়াছেন, উহাকে বলা হয় স্বস্থবৃত্ত। গ্রন্থকার চরক এই স্বস্থবৃত্ত সম্পর্কে অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেহের রোগের মত মনের রোগেরও কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। চরক-সংহিতা পাঠ করিলে দেখা যায়, এযুগের মনো-বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই তিনি জানিতেন। অবশ্য, মূল অগ্নিবেশ-সংহিতায় মহর্ষি চরকের দান কতখানি, তাহা আজ জানিবার উপায় নাই। সুশ্রুত-সংহিতার প্রতিসংস্কর্তা নাগার্জ্জুন, কিন্তু উহা সুশ্রুতের নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এদিকে চরক-সংহিতার প্রতিসংস্কর্তা অগ্নিবেশ কিন্তু প্রতিসংস্কর্তা চরকের নামানুসারেই সংহিতাখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অগ্নিবেশ-সংহিতায় চরকের দান ছিল বিপুল। এই মহামনীষীর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোন উপায়ই নাই।

একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হইয়াছে—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥

এই শ্লোকে যদি কোন ঐতিহাসিক সত্য থাকে, তবে বলিতে হয়, যোগদর্শনের প্রবর্ত্তক পতঞ্জলি, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও মহর্ষি চরক একই ব্যক্তি। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি ও মহামতি চরক একই ব্যক্তি। কিন্তু এই শ্লোকটিকে ঐতিহাসের নজীর হিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। তবে শ্লোকটির মধ্যে একটি গভীর তাৎপর্য্য আছে। সে সত্যটি এই—যিনি বাক্, কায় ও চিত্তের মলকে দূরীভূত করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি, তিনিই পরিপূর্ণ মানুষ।

আয়ুর্ব্বেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার স্বস্থবৃত্ত। দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিবার জন্য যে সমস্ত উপায়ের নির্দ্দেশ দিয়াছেন মহামতি চরক, তাহা ভাবিতে আজও আমাদের বিস্ময় লাগে। এই সকল আবিষ্কারের মূলে ছিল যুক্তিবাদ, পরীক্ষা (চক্রপাণি এই পরীক্ষা বা Experiment এর কথা বলিয়াছেন) ও প্রজ্ঞাদৃষ্টি। এই প্রজ্ঞাদৃষ্টিই ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

আয়ুর্ব্বেদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য উহার ত্রিদোষবাদ। এই ত্রিদোষবাদ গভীর দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এই তত্ত্বের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে গিয়া অনেকে নিরাশ হইয়াছেন। ত্রিগুণতত্ত্বের মতই এই তত্ত্বের মূলে আছে ঋষির প্রজ্ঞাদৃষ্টি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—চিকিৎসককে সর্ব্বদাই রোগীর বাতুলাদি রক্ষা করিতে হইবে। তিনি যেন একটি ব্যাধির চিকিৎসা করিতে

বিদ্যা অন্য কোন ব্যাধির সৃষ্টি না করেন। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে ঔষধ বর্দ্ধয়িতব্যা বৃদ্ধা হ্রাসয়িতব্যা সমাঃ পালয়িতব্যাঃ।

আয়ুর্ব্বেদের আর একটী বৈশিষ্ট্য—ঔষধ দিয়া শুধু পথ্যের দ্বারা রোগের চিকিৎসা। অবশ্য সকল সময় উহা ফলপ্রদ হয়ে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের নির্দ্দেশ এই আমাদের সকলকেই পথ্যাশী হইতে হইবে। যিনি পথ্যাশী নহেন, তাহার পক্ষে ঔষধেও কোন ফল হইবে না। আবার সুস্থ ব্যক্তি যদি পরিমিতভোজী ও পথ্যসেবী হন, তবে তাহার দেহ সহজে রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবে না। অবশ্য সকল চিকিৎসা-পদ্ধতিতেই পথ্যের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু কোন পদ্ধতিতেই পথ্যের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য উহার লৌজাত্য-বিদ্যা বা ইউজিনিক্স্। সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থানে পাঠ করিলে জানা যায়, প্রাচীন ভারতে এই বিদ্যার যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদের শেষ দুইটি অঙ্গের উদ্দেশ্য তিনটি—(১) জরারূপ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া (২) দীর্ঘজীবন লাভ করা (৩) সুসন্তান লাভ করা। প্রাচীন ভারতে কেমিষ্ট্রি, অর্থে রসায়নী বিদ্যা কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে আবার যে ঔষধ জরাব্যাধির (জরা ও ব্যাধি, অথবা জরারূপ ব্যাধির) নাশক, তাহাকেও রসায়ন বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক যুগে চিকিৎসকগণ ষষ্ঠীতন্ত্রে রসায়নী বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন। তাহারা রোগ-চিকিৎসার জন্য বিবিধ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ধাতুশোধন ও জারণপ্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়াও ভারতীয় চিকিৎসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেহের ন্যায় মনেরও যে চিকিৎসা আছে, তাহা মহর্ষি চরক সুস্পষ্ট ভাষেই বলিয়াছেন। অন্য কোন দেশ বা যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ হয় এ বিষয়ের আলোচনা নাই। আয়ুর্ব্বেদ যে মানুষের দেহকেই শুধু রোগমুক্ত করিতে চাহে নাই, তাহার প্রমাণ মহামতি চরকের নিম্নোক্ত সূত্র হইতে --

'বিদ্যা কৃৎস্নানাম্'।

সৃষ্টির জ্ঞানসমূহের মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। এখানে বিদ্যা অর্থে যথার্থ জ্ঞান, আমরা স্কুল কলেজে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, উহা অবিদ্যারই নামান্তর। (স্কুল = বিদ্যালয় অর্থাৎ বিদ্যার লয় হয় যেখানে, কলেজ = মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ মহতী অবিদ্যার আলয়, মহা + অবিদ্যা + আলয়)

'ইন্দ্রিয়জয়ো নন্দনানাম্'

আনন্দজনক জ্ঞানসমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়জয় শ্রেষ্ঠ।

'ভাবৈরোগো হর্ষণানাম্'

হর্ষজনক জ্ঞানসমূহের মধ্যে ভবজ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

'ব্রহ্মচর্য্যাবরমানাম্'

পথসমূহের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ পথ।

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা

কবিরাজ ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবগণ আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, যে ভারতীয় আর্য্যগণ বাহির হইতে আসিয়া পঞ্চনদতীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবগণের গবেষণার ফলে কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ভারতীয় আর্য্যগণ বহিরাগত নহেন, পরন্তু পঞ্চনদপ্রদেশের আদিম অধিবাসী। অনুসন্ধিৎসু চরক সংহিতার মতে প্রাচীন আর্য্যগণ ত্রিদোষ-বিজ্ঞান-সম্বলিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জানিতেন না। চরকসংহিতায়ের দেবরাত ধন্বন্তরি সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাতা ছিলেন। চতুর্ব্বেদে আয়ুর্ব্বেদের গবেষণা বিষয়ক তথ্যাবলী প্রকীর্ণ উপদেশরূপে প্রাপ্তব্য হইলেও ঐগুলিতে আয়ুর্ব্বেদীয় ত্রিসূত্রের আনুপূর্ব্বিক ও ধারাবাহিক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদিক যুগের শেষভাগে এবং উপনিষদের যুগের প্রারম্ভে কোন কোন পণ্ডিতের মতে ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন-করতঃ ভারতীয় আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে আর্য্যাবর্ত্তে উহা প্রচার করেন। তদবধি সমগ্র হইতে হিন্দুরাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত একমাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

তাহার পর সুদীর্ঘ মুসলমান রাজত্বকালে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নাই। মুসলমান বাদশাহগণ আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ভূত ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, তবে তাহাদের সম্পর্কে একথা বলা সঙ্গত যে তাহারা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের নিমিত্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন নাই। তথাপি সাত শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বকে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ বলা হইয়া থাকে। কারণ মুসলমানগণ হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলিকে যথা, তক্ষশীলা, নালন্দা, বল্লভী, বিক্রমপুরী ধ্বংস করেন এবং ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের বহু মূল্যবান গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। সমগ্র সাতশত বৎসরের ইতিহাসে ভাবমিশ্র, শিবদাস সেন, গোপাল ভট্ট ও কৃষ্ণদাস বিদ্যারত্ন ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয় নাই। তথাপি মুসলমান বাদশাহগণ এবং আমির ও ওমরাহগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে রাজবৈদ্যরূপে নিযুক্ত করিতেন।

ইংরাজ রাজত্বকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি শোচনীয়রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার কারণ, ইংরাজ রাজত্বের কূটনৈতিক অন্তরায়স্বরূপ ভারতকে ইংরাজী ঔষধবিক্রয়ের একটা উৎকৃষ্ট বাজারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের পরিবর্ত্তে ইংরাজী ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। এবং ইহার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভাব ও প্রচার বন্ধ করিবার

নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে ইহারা আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের গুণগান করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নকল্পে ইহার প্রোৎসাহন দেওয়া প্রয়োজনীয় - এইরূপ বক্তব্যও তাহারা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিগত দুইশত বৎসরের রাজত্বকালে ইংরাজগণ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে দুই কপর্দ্দক ব্যয়করাও সমীচীন মনে করেন নাই। ইহার কারণ ছিল—ইংরাজ শাসকবর্গ ভারতীয় কৃষ্টির অন্তরঙ্গ বিষয়গুলিকে বিনষ্ট করিয়া তৎস্থলে ইংলণ্ডীয় কৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য তাহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় চিকিৎসার মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যকে বিনষ্ট করিবার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চার ক্রমবিলুপ্তির সহিত আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া আইন করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের শস্ত্রচিকিৎসা বন্ধ করা হয়। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য তালিকা হইতে আয়ুর্ব্বেদকে উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে সংস্কৃত এসোসিয়েশনের পাঠ্য তালিকা হইতেও আয়ুর্ব্বেদের পাঠ্যসূচী অন্তর্হিত হয়। ফলে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন টোল হইতে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু প্রচারের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে সরকারী খরচে এ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথায় দেশের বুদ্ধিমান ছাত্রগণ যাহাতে অধিক পরিমাণে অধ্যয়নার্থ সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহার জন্য বহু প্রকার পারিতোষিক, উপঢৌকন, বৃত্তি ইত্যাদি অকাতরে প্রদত্ত হইতে থাকে। প্রথমে ঐ সকল কলেজে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের পুত্রগণ অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্ট হন নাই। কিন্তু রাজা কালস্য কারণম্। রাজশক্তি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কালক্রমে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের পুত্রগণও এ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-একজনের নাম কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায়, অপরজনের নাম কবিরাজ গণনাথ সেন। ইঁহারা উভয়েই এ্যালোপ্যাথি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রনিষ্ণাত হইয়াছিলেন। কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় সর্ব্বপ্রথমে এ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের ধাঁচে আয়ুর্ব্বেদীয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রাজশক্তির সাহায্যাভাবে অবহেলিত অথচ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার। এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়বস্তুগুলি মিশ্রিত করিয়া একটা মিশ্র পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করেন। তাঁহার জীবিতকালে অটাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়বস্তুগুলির সাধারণভাবে অধ্যাপনা হইত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ঘনাত্তিবিক ব্যক্তিগণ তৎপ্রণীত পাঠ্যতালিকা হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় বিষয়গুলিকে উৎখাত করিয়া তৎস্থলে অধিকাংশে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার বিষয়বস্তুগুলি সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে অটাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পাঠ্যতালিকা হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পঠন-পাঠন প্রায় অন্তর্হিত হইল এবং সর্ব্ববিষয়ে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রাধান্য লাভ করিল, ছাত্রগণ ক্রমশই মূল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপাঠবিমুখ হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলে তাহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিগত তিন বৎসর ধরিয়া ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজগুলির পাসকরা ছাত্রগণ মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই। সুতরাং বিগত তিন

বৎসর ধরিয়া সমস্ত ভারতে আয়ুর্বেদের শিক্ষা বিষয়ে নিখিল শিক্ষক প্রস্তুতির পথ বন্ধ হইয়াছে। ভারতের সর্বত্রই আয়ুর্বেদের এই একই অবস্থা। কারণ সমস্ত ভারত শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গলার অনুকরণ করিয়াছেন। এবং সেই হিসাবে পাঠ্যতালিকা নিরূপণ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সর্বত্রই ফল একরূপ হইয়াছে। কোন স্থানেই আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্রগণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়িতে চাহেন না বা তদনুযায়ী চিকিৎসা করিতেও চাহেন না। এবং সর্বক্ষেত্রেই তাহারা আয়ুর্বেদীয় কলেজগুলিকে ভাঙ্গিয়া এলোপ্যাথিক কলেজ করিবার পক্ষপাতী। ইহাঁরা মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভ্যগণও ইহাই চাহিয়াছিলেন। তাহাদের সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। মিশ্র আয়ুর্বেদীয় পাঠ্যতালিকায় মিশ্র আয়ুর্বেদের প্রবর্তন আয়ুর্বেদ নির্মূলকল্পে যেরূপ কার্যকরী হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক কার্যকরী হইয়াছে অপর একটী প্রথার প্রবর্তন, যাহার নাম—ষ্টেট ব্যাকালটি অফ আয়ুর্বেদ। এই ষ্টেট ব্যাকালটির প্রবর্তনের ফলে বিগত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কলিকাতা মহানগরীতে একই দিনে কেবলমাত্র দশ মুদ্রা প্রদান করিয়া দশ হাজার বিদ্যাপুত্র ভট্টাচার্য্যবংশধর জীবাত্মার পরম নিবাসস্থল এই মানবদেহের উপর অস্ত্রোপচার করিবার সনদ লাভ করিয়াছেন। এই ব্যাকালটি প্রবর্তনের পূর্ববর্ষের পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদীয় কলেজগুলিতে শতাধিক ছাত্র অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হইতেছেন। কিন্তু ব্যাকালটি প্রবর্তনের পর বৎসর হইতে দেখা গেল যে প্রতিষ্ঠ ছাত্রগণের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। অদ্যাবধি সেই অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই।, বর্তমানে আয়ুর্বেদের কলেজ আছে, অধ্যাপক আছেন, কিন্তু ছাত্র নাই। বাঙ্গলার অনুকরণে প্রবিষ্টিত ও পরিচালিত ভারতের সর্বত্রই আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়গুলির এই একই অবস্থা। ইহার প্রধান কারণ, পাশকরা আয়ুর্বেদীয় ছাত্রগণের কোন ক্যারিয়ার বা ভবিষ্যৎ নাই। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বৃটীশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সত্যাগ্রহ এবং প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবগণ যেরূপভাবে বিষ উদ্গার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহার ফলে ভারতীয় ইংরাজীয়ান জনতার মনে আয়ুর্বেদের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত হয় নাই। এলোপ্যাথি শাস্ত্রানুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপুষ্ট ঔষধ নির্মাতা কোম্পানীগুলির বৈজ্ঞানিক বহুল প্রচারের ফলে বর্তমানে ভারতীয় ইংরাজীয়ান জনতা এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের ঔষধগুলির সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। আয়ুর্বেদের বিষয়ে কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতে গ্রামের চৌকিদার পর্য্যন্ত সকলেরই এক অভিপ্রায়। সকলেরই ধারণা যে আয়ুর্বেদের কোন রিসার্চ বা নূতন গবেষণা নাই। আয়ুর্বেদের নূতন গবেষণা শব্দের অর্থে তাঁহারা কি বুঝেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। আয়ুর্বেদের নূতন গবেষণা শব্দের অর্থে যদি তাঁহারা মনে করেন যে বড় বড় বিল্ডিং স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে বড় বড় কাচের কল সংযুক্ত মধ্যযুগি স্থাপনকরতঃ তাহাদের অভ্যন্তর হইতে আয়ুর্বেদীয় ভেষজদ্রব্যগুলির এলোপ্যাথিক শাস্ত্রানুযায়ী নির্য্যাস বাহির করা, তাহা হইলে আমরা বলিব যে তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। আয়ুর্বেদীয় ভেষজদ্রব্যগুলিকে আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলিয়া তাহা হইতে শুদ্ধ সত্ত্ব নিষ্কাশিত করিয়া তাহারা ভেষজ নির্দিষ্ট হইলে সেইগুলি আয়ুর্বেদকথিত ফল প্রসব করিবে না। আয়ুর্বেদাচার্য্যকথিত ফলশ্রুতি অনুযায়ী ফল পাওয়াইতে হইলে আয়ুর্বেদীয় রাসায়নিক তত্ত্বানুযায়ী কল্পপদ্ধতি অবলম্বন

করিতে হইবে। ইহার জন্য তাই আয়ুর্বেদীয় রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারার সহিত পরিচয়। বৈদিক যুগে আয়ুর্বেদের ঋষি রোগ নিবারণকল্পে একটী মন্ত্র উচ্চারণের সহিত একটী ভেষজদ্রব্যকে দীর্ঘ শরীরের কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে ধারণ করিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, ঋষি সেই দ্রব্যকে পিষ্ট করিয়া তাহার রস নিষ্কাশিত করিয়া সেবন করিতেছেন। কালক্রমে তিনি সেই দ্রব্যকে ঈষদুষ্ণজলে ভিজাইয়া তাহার রস পান করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে তাঁহার কতিপয় শারীরিক বিকৃতি দূরীভূত হইল। তাহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, তিনি সেই দ্রব্যকে গরমজলে ভিজাইয়া রস পান করিতে লাগিলেন। তাহার ফলেও তাঁহার কতিপয় শারীরিক বিকৃতি বা রোগ নিরাকৃত হইল। ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, সেই ঋষি সেই দ্রব্যের চূর্ণ জলের সহিত পান করিতেছেন এবং তাহাতে তাঁহার অপর কতকগুলি ব্যাধি দূরীভূত হইতেছে। ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল - তিনি সেই দ্রব্যের ক্বাথ বা পাচন সেবন করিতেছেন, অর্থাৎ ঐ দ্রব্যের দুই তোলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পিষ্ট করিয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিতেছেন। ইহার ফলে তাঁহার আরও কতকগুলি দুরারোগ্য শারীরিক বিকৃতি বা ব্যাধির উপশম হইতেছে। ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল—তিনি সেই দ্রব্যের ব্যবহারকাল অধিকতর স্থায়ী করিবার নিমিত্ত তাহাকে আসব এবং অরিষ্ট রূপে ব্যবহার করিতেছেন, অর্থাৎ সেই দ্রব্যকে অপর কতিপয় দ্রব্য সহযোগে মাসাধিককাল মৃত্তিকার তলে ভিজাইয়া রাখিয়া অন্তরস্থদের ক্রিয়ার দ্বারা উহার গুণবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া সেবনপূর্বক শরীরাভ্যন্তরস্থিত বহুকালস্থায়ী ব্যাধিসমূহ নিরাকৃত করিতেছেন। আরও কিছুদিন পর দেখা গেল—তিনি সেই দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে গুড় বা কোন কোন ক্ষেত্রে চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে বড়ি এবং মোদক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা বলীপলিতাদি বহু ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতেছেন। কিছুদিন পর দেখা গেল তিনি সেই দ্রব্যকে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ ছাঁকিয়া ফেলিতেছেন এবং তাহাকে পুনরায় সিদ্ধ করিয়া ঘনীভূত করিয়া সেবন করিতেছেন। এই ঘনীভূত দ্রব্যের নাম অবলেহ এবং এই অবলেহ সেবনে বহু শারীরিক ব্যাধি উপশম হইতেছে। ইহারও কিছুদিন পরে দেখা গেল সেই ঋষি সেই দ্রব্যকে তৈলের এবং দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া তৈল এবং ঘৃত প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেই তৈল ও ঘি ভক্ষণ এবং মর্দন করিয়া আশাতীত ফললাভ করিতেছেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনি সেই দ্রব্যকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্মকে সূক্ষ্ম ঔষধরূপে ব্যবহার করিতেছেন। পুনরায় সেই ভস্মগুলিকে জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জলকে অগ্নি সংযোগে নিঃশেষ করিয়া তলস্থ দ্রব্যকে ক্ষাররূপে ব্যবহার করিতেছেন। ইহাই ধন্বন্তরির আদি শিষ্য মহর্ষি সুশ্রুতের আদি আবিষ্কার। পৃথিবীর অন্যান্য তথাকথিত সভ্যজাতি যখন পৃথিবীতলে আবির্ভূত হন নাই, যখন শ্বেত দ্বীপ অতলান্তিক মহাসাগরের অন্তস্থলে নিমজ্জিত ছিল তখন ভারতীয় ঋষিগণ রাসায়নিক গবেষণার মূল উপকরণগুলির আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, ঋষি উদ্ভিদিত দ্রব্যগুলিকে স্থায়ী করিবার জন্য এবং বিভিন্ন রোগ নিবারণকল্পে সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবার জন্য ঐ দ্রব্যগুলিকে বটিকারূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহার পর

দেখিতে পাইতেছি যে ঋষি ভেষজ দ্রব্যের অধিকতর সত্যস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা হইতে অর্ক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অর্কেরই বিভিন্ন বিকাশ সুরা এবং আসব।

পাঠক, আপনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ঋষির রসায়ন গবেষণা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনি কি দেখিতেছেন? আমরা উপরে হিন্দু রসায়ন গবেষণার ক্রমবিকাশ বিবৃত করিয়াছি। আয়ুর্বেদীয় ভেষজ দ্রব্যের কেবল দ্রব্যরূপে ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া উহার সূক্ষ্ম অর্কে পরিণতি পর্য্যন্ত যে অষ্টাদশ প্রকার সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে—ইহাই আয়ুর্বেদের রসায়ন গবেষণার যথার্থ স্বরূপ। আয়ুর্বেদ বিষয়ে কোন নূতন গবেষণা করিতে হইলে গবেষককে এই পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। পথ পরিষ্কারভাবে দিনি নূতনত্বের বা আধুনিকতার পরিচয়স্বরূপ যানবাহনের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ভেষজ দ্রব্যগুলি হইতে প্রকৃষ্ট ফল পাইতে হইলে দ্রব্যগুলিকে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু রসায়নের অষ্টাদশ প্রক্রিয়ার যে কোন একটাতে ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে সেইগুলি হইতে আয়ুর্বেদোক্ত ফল পাওয়া যাইবে। আয়ুর্বেদের ভেষজ দ্রব্য লইয়া যদি আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন করিতে যাও তাহা হইলে তাহারা আয়ুর্বেদ গবেষণার অগ্রগতি জগতে সাধিত হইবে না। যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধিগুলিকে লইয়া পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে তাহা যতদিন পর্য্যন্ত আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা করা হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত উহা প্রকৃতরূপে ফল প্রদান করিতে পারে নাই। যখন হইতে উহা আয়ুর্বেদীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা করা হইতেছে, তখন হইতে উহা প্রকৃষ্ট ফল প্রদানে সমর্থ হইয়াছে। অর্জ্জুন এবং অন্যান্য আয়ুর্বেদের দুইটী অতি বিখ্যাত ঔষধ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের গবেষকগণ মানুষের বিশেষ উপকারে লাগে এমন কোন উপাদান উহাদের মধ্যে দেখিতে পান নাই। তাহার কারণ, তাঁহারা ঐ দ্রব্যগুলিকে এ্যালোপ্যাথিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ধাঁচে ফেলিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি যাচাই করিয়াছেন। অন্যান্য দ্রব্যের গবেষণারও অনুরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী।

প্রসঙ্গ ক্রমশই বড় হইতেছে। আমাদের হাতে স্থান নাই। এখানেই উপসংহার করিলাম।

আয়ুর্বেদ এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। আমাদের মাননীয় কর্ণধারগণ আয়ুর্বেদের নূতন গবেষণার স্বরূপ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন নাই। হইলে তাঁহারা বর্ত্তমানে যেভাবে আয়ুর্বেদের বিল পাশ করিতেছেন, তাহা করিতেন না। আয়ুর্বেদের শীর্ষস্থান এই বঙ্গদেশে যাঁহারা আয়ুর্বেদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল আছেন, তাঁহাদিগের মত লওয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। পূর্ব্বকথিত মিশ্র আয়ুর্বেদের প্রবর্ত্তন এবং ক্যাকাণ্ডি ধরণের দ্বারা বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য আচার্য্যনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি সমগ্র ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকজন বৃদ্ধ বৈদ্যের মহাপ্রয়াণের পর সমগ্র ভারতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য আর বৈদ্য পাওয়া যাইবে না। তখন, এখন যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ পড়াইবার জন্য বঙ্গদেশ তথা ভারতে অধ্যাপক পাইতেছেন না, সেরূপ চরক, সুশ্রুত, মাধবকর পড়াইবার জন্যও ভারতে আর অধ্যাপক মিলিবে না। তখন সুশ্রুতসংহিতার ভাষায় বলিতে হবে—বেদ এবং

আয়ুর্বেদ পড়াইবার জন্য ভার্ণাকী হইতে অধ্যাপক আমদানী করিতে হইবে।

আশা করি বর্ত্তমান ভারতের আয়ুর্বেদসেবিগণ আমাদের উক্তির যাথার্থ্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, কিন্তু কটু হইল। আশা করি আপনারা আপনাদের স্নেহমুখ দ্বারা মার্জ্জন করিয়া লইবেন। আমার এই কটুভাষণের দ্বারা আয়ুর্বেদ জগতের জড়তারূপ অঙ্গের কিঞ্চিন্মাত্র অপনোদন হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। অলমিতিবিস্তরেণ।

আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা কা'কে বলে ?

অধ্যাপক ডক্টর কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী, আয়ুর্বেদাচার্য

গবেষণা বা রিসার্চ বলতে আমরা কি বুঝি ? বিষয় বা বস্তুর বিশেষ অনুশীলন, পুনঃ পুনঃ নানাভাবে অনুসন্ধান করে' প্রচলিত জ্ঞান অপেক্ষা নতুন আরো কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা তা'র চেষ্টা ও পরীক্ষা ইত্যাদি। সেটা বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা—যা প্রাচীন নবীন, যে বিষয় নিয়েই হ'ক। কেবল ইংরেজীতাষায় কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্সের লেবরেটরী পরীক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অথবা কেবল টেষ্টটিউব ও এসিডের মধ্যে সীমাবদ্ধ পদ্ধতিই রিসার্চ পদবাচ্য নয়। যে ইংরাজী অক্ষরটি থেকে রিসার্চ (Research) কথাটির উদ্ভব, যা থেকে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়—বিষয়বস্তুকে বার বার অনুসন্ধান করে' দেখাটাই হচ্ছে রিসার্চ বা গবেষণার উদ্দেশ্য। উপযোগী বস্তুর উপযোগিতা বজায় রাখা, উহাকে আরো উন্নততর করা এবং পদার্থের উপযোগিতার নতুন আবিষ্কার। এমন কি, নিত্য-খাদ্যের চিরন্তন বস্তুকে মিষ্টা রূপে জানার সাধনাও রিসার্চ। কিন্তু অনাবশ্যক প্রোপাগাণ্ডার ফলে বিলাত ও আমেরিকাই সকল দেশের দেরা মনে করে' হীনমন্যতার নিয়ে কথায় কথায় সেদেশে গিয়ে তাদের অন্ধ অনুকরণ করার ফলে আজকাল আমাদের দেশে সাধারণ স্তরের অনেক লোক 'রিসার্চ' বলতে বুঝতে আরম্ভ করেছে—একটী গগনস্পর্শী রিসার্চ ষ্ট্রাক্চার অবশ্য থাকা চাই, যার অধিকাংশ স্থলে থাকবে বড় টেবিল এবং নানা আসবাবপত্র শোভিত বিবিধ প্রকারের কাচের নল, ছোট-বড় হাজারো রকমের যন্ত্রপাতি, টেষ্ট-টিউব, ফ্লাস্ক, কার্বোয়, আর ফুলের বাগান, মালী, দারোয়ান, চাপরাশি—আরো কত কি। যা'র আড়ম্বর চোখে ধাঁধা লাগাবে এবং ফল প্রসব করবে পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মতো। এর ফলে আর কিছু না হ'ক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কতকগুলো লোকের উপর তথাকথিত কতক শিক্ষিত লোকের মাতব্বরি করে' বিজ্ঞতা প্রকাশ করবার বেশ একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তাই, জানা অজানা অনেককেই রিসার্চ ও বিজ্ঞানের নামে আজকাল বহু স্থানে বিজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা যায়। অথচ আয়ুর্বেদসম্বন্ধে যে গবেষণা বহুকাল থেকে চলে' আসছে, সে বিষয়ে কোন জ্ঞানই এদের নেই এবং সে জ্ঞানলাভের চেষ্টাও নেই।

আয়ুর্বেদ গবেষণার ঐতিহাসিক পটভূমিকে প্রধানতঃ দেবতাযুগ, ঋষিযুগ ও মনুষ্যযুগ-এ তিনটী

ভবে তাদ করলে আয়ুর্বেদ গবেষণার নিজস্ব ধারা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়। আয়ুর্বেদ প্রবর্তক ব্রহ্মার কাছ থেকে যথাক্রমে প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় ও দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাকুলে আয়ুর্বেদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইতঃপূর্বে চিকিৎসাশাস্ত্র বলে কিছু ছিল না। কেউ কেউ বলেন, বেদ ও আয়ুর্বেদ সমকালীন তাদের অথর্ববেদ আয়ুর্বেদকে উপবেদ বলায় কেউ মনে করেন ইহা কিঞ্চিৎ পরবর্তী-কালের। কিন্তু বৃহত্ত্রয়ী—ঋক্, সাম, যজুর্বেদে আয়ু ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে সুতরাং ইহাকে বেদের সমসাময়িক বলা অযৌক্তিক নয়।

দক্ষ প্রজাপতি, অশ্বি-ভ্রাতৃদ্বয় ও দেবরাজ ইন্দ্র এঁরা জীবের আয়ু সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন তা'র ফলেই আয়ুর্বেদের সৃষ্টি। শুধু মানুষের নয়, পশু-পক্ষী, প্রাণী মাত্রেরই ব্যাধি-প্রতিষেধ ও রোগচিকিৎসা বিষয়ে এঁরা গবেষণা করেছেন। তখনকার গবেষণা পদ্ধতি ঠিক আজকের মতো না হলেও সেটা যে অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আত্মা, মন, কাল, দিক ও পঞ্চমহাভূত এই সমষ্টি শরীররূপ দেহের ছিল তখনকার 'লেবরেটরী' বা গবেষণাগার এবং সাধনার 'ডিসিপ্লিন' ছিল সূক্ষ্ম, তাত্ত্বিক, বর্তমান ত্রিকালজ্ঞানমূলক যার। আধুনিক অনুবীক্ষণ অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ছিল।

ব্রহ্মার মুখনিসৃত বাণী বেদরূপে আবির্ভূত হয়ে সূত্ররূপে প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় ও দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আয়ুর্বেদের প্রথম গবেষণা সুরু হয়। এঁদের মধ্যে অশ্বিনী ভ্রাতৃদ্বয় কেবল আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান নিয়ে অনুশীলনে রত থাকেন এবং ঔষধ প্রয়োগে, চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসায় অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেন, যাহা বিনা গবেষণায় একে-বারেই অসম্ভব।

রসায়ন ও চ্যবন ঋষিকে ঔষধ বাইরে পুনর্যুবা পুরুষে পরিণত করা, ধীমতমস্ মুনির মস্তক ও বক্ষে অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা (যা'কে আধুনিক আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে) ঘরের দারাদ্যে রোগ আরোগ্য করে একশত বিশ বছর বাঁচিয়ে রাখা, কুষ্ঠ ও জরাগ্রস্তা ঘোষাকে নীরোগ এবং জরা-মুক্ত করে পতিদান করা ইত্যাদি গবেষণার বহু প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসে। নিম্নে একটি সূক্ত উল্লেখ করে তা'র সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হ'ল মাত্র।

"যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্টিয়ায়
বিমাদায় বন্দনশ্রুবিষকায়
ঘোষায়ৈ চিদ্ পিতৃষদে দুরোণে
পতিংজুর্ন্তী অশ্বিনাবদত্তম্।" ঋ ১।১১৭।৭

দেবতা যুগের প্রথম আয়ুর্বেদ গবেষণা কিভাবে সুরু হয় তাহাদের এই সূক্তটি পাঠ করলে তা'র কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। আয়ুর্বেদ শব্দের নিরুক্তি সম্বন্ধে সেখানে এক যায়গায় বলা হয়েছে—"আয়ুরস্মিংবিদ্যতেঽনেন বিদ্ আয়ু বিন্দত্যনেন, আয়ুষ্যমস্মিন্ আয়ুধে, বিন্দতে, লভ্যতে বা বিদ্যতে-ত্যায়ুর্বেদঃ" (৪২ পৃঃ)

আত্মাকে অবলম্বন করে আয়ুর্বেদের প্রথম গবেষণা সুরু হয়; তাই বলা হয়েছে আয়ু হচ্ছে জীবন, তার সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন অথবা আয়ু সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য শাশ্বত জ্ঞানগর্ভ নিত্যস্থায়ী যে বিজ্ঞান যা'র মূলনীতি অপরিবর্তনীয়, সর্বকালের উপযোগী সত্য তাহাই আয়ুর্বেদ।

"জীবঃ ব্রহ্মৈবনাপরঃ" বেদান্ত সূত্রের এই বাণী জীবে ব্রহ্মজ্ঞান সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কার্যতঃ প্রমাণ

করেন এবং সে আদর্শ সামনে রেখে আয়ুর্বেদ অধিগত আয়ুর্বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার ক্রমোন্নতির গবেষণা চালিয়ে গেছেন। নিত্য-বস্তু নিয়ে আলোচনা, গবেষণা চলবে না, এমন কথা কোন শাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে লেখা নেই।

অধিকাংশের দেবচিকিৎসক হ'লেও দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমিয়ুগের বিশেষ কয়েক বিষয়ে ও চর্মরোগ সম্বন্ধে গবেষণা করে সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তা না হ'লে অশ্বিদ্বয় থাকতে অশ্বপালের চর্মরোগ তিনি সারোগা করতে যাবেন কেন? অথবা গবেষণার ফল পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এটা তাঁর নিজের চিকিৎসাও হতে পারে। যাহোক তিনি চর্মরোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন, বেদে এ কথা আছে।

এতে মনে হয়, দেবতা যুগেও আয়ুর্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ অনুশীলনের বেওয়াজ ছিল। তা'ছাড়া জল ও সূর্য্য কিরণ দ্বারা রোগারোগ্যের ব্যবস্থা এবং কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, গুহ্যরোগ প্রভৃতি বহু রোগের নাম ও চিকিৎসার কথা অবেদে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা সে যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণার অমর অবদান, একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

তারপর, অশ্বদ্বয় ঋষি প্রাচীন পণ্ডিত ঋষি-মণ্ডলীর প্রতিনিধি স্বরূপে ইন্দ্রের নিকট গিয়ে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করেন, অশ্বিদ্বয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি ভারতীয় পণ্ডিত ও ঋষিমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন একথা পূর্বে বলা হয়েছে। হিমালয়ের পার্শ্বে কোন সমতলভূমির বিস্তৃত পাদদেশে সভা করে' ঋষিগণ তাঁদের নির্বাচিত করেছিলেন। এতে করে সে যুগের ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি চিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ভরদ্বাজের পর থেকেই দিবা আত্রেয় ও ধন্বন্তরি যথাক্রমে রোগবিজ্ঞানে কায়চিকিৎসা এবং রোগ-বিজ্ঞানে শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে অপূর্ব গবেষণা করেছেন। সে গবেষণার সুফল আজো অধিকাংশ ভারতবাসী ভোগ করছে। বিগত যুদ্ধের সময় যখন মুইবাইন্ প্রভৃতি অন্যান্য আরো বিদেশী এলো-প্যাথিক ঔষধ দুষ্প্রাপ্য হ'ল তখন ঋষিদের গবেষণা-লব্ধ উত্তরাধিকারী-সূত্রে পাওয়া এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাই এদেশবাসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে: শুধু তাই নয়, আজো ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও সহরের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা পঁচাশী জন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ভোগযুক্ত হচ্ছে। ভোপাল কমিটির রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। যথাকথিত বৈজ্ঞানিক-দের ঐন্দ্রজালিক প্রোপাগাণ্ডার ভামাডোলের মধ্যে এটা আয়ুর্বেদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। অবশ্য, সত্য একদিন প্রতিভাত হবেই এবং মিথ্যা আলেয়ার মতই অন্তর্ধানী।

একথা জেনেও একদল অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার কথা উঠলেই ব'লে থাকেন—"হাঁ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ভালো, তবে ইহা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া চাই" ইত্যাদি। যেন আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানসম্মত নয়, এইরূপ ভাবটি। তাঁদের জানা উচিত—আয়ুর্বেদ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বিজ্ঞানসম্মত এবং অতীতে ইহা যেমন ঋষিদের গবেষণার ফলস্বরূপ যুগে যুগে বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞান ভাণ্ডারকে নব নব অবদানে সমৃদ্ধ করে এসেছে, বর্তমানেও এর নিজস্বরোগ গবেষণার বিরাম নেই এবং ভবিষ্যতেও এধারা লুপ্ত হবে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু, জ্ঞান ও গবেষণার মাকড়শরূপ সনাতন আয়ুর্বেদকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ফ্রেঞ্চমাসেক-

মোটা রেজাবে দিয়ে মারার চেষ্টা করছে, তাতে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ ঘটছে।

বেবভানুসের পর ঋষিযুগের শেষ ভাগে অর্থাৎ মনুষ্যমুমারেয়ের সময় মানুষের বিভিন্ন প্রধান বৈজ্ঞানিক ঋষিসংঘের মণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয়ে বিভিন্নদিকে ধারায় ধরে ওঠে। প্রথমতঃ ভরদ্বাজের শিষ্যমণ্ডলী পুনর্বসু, অত্রিবেশ প্রভৃতি আত্রেয় অনেকে কায়চিকিৎসাপ্রধান আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এদের প্রত্যেকের নাম চরকে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রসূতিতন্ত্র বা কৌমারভৃত্য বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন কাশ্যপ, অত্রি, ভৃগু, বুধ জীবক প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ।

তৃতীয়তঃ শল্যশালাক্য অর্থাৎ ধারণীয় শস্ত্রসাধ্য চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালান ঋষি ধন্বন্তরি ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলী, সুশ্রুত ঔপধেনব প্রভৃতি।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বামূল রোগ-এর কথায় ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগ এবং সমগ্র শরীরের বাহ্য-আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার 'সার্জারী' বা শস্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানসহ সমগ্র মানুষ আয়ুর্বেদের গবেষণা সে সময় চরম উন্নতি লাভ করে। চরক, সুশ্রুত, ভেল, অত্রিবেশ বাগ্‌ভট প্রভৃতি অনেকেই তাদের নিজ নিজ নামে নিজেদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিবেশন করে বিরাট 'থিসিস্' লিখে যান। কিন্তু চরক, সুশ্রুত বাগভট ছাড়া কালক্রমে প্রায় সকলের 'থিসিস্'ই লুপ্ত হয়ে কিংবদন্তীর পর্যায়ে এসে পড়ে। সুতরাং চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের গবেষণাই পরবর্তীকালের গবেষকগোষ্ঠীর একমাত্র উপজীব্য হয়। আয়ুর্বেদ বৃহত্ত্রয়ী (চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট) গবেষণার ধারা বৈদিক বৃহত্ত্রয়ীর ধারা অনুসরণ করে' প্রথমতঃ দুটী বৌদ্ধিকস্তরের কঠিন ভিত্তি করে' অগ্রসর হয়। একটি আত্মাসম্বন্ধিত শারীরবর্ণন, অপরটি হচ্ছে পার্থিব জড়পদার্থ বিশ্লেষণ।

একদিকে পুরুষ কি, আত্মা কি, প্রকৃতি কি, এই বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা; অন্য দিকে জড়পদার্থ বিজ্ঞানের অণু-পরমাণবিক দ্রব্যবিশ্লেষণ এ নিয়ে চলতে থাকে গবেষণা। অগ্নি বেশ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন—

"কতিধা পুরুষো বীমন্ ব্যাকুরুষেন জিজ্ঞতে
পুরুষঃ কারণং কস্মাৎ প্রভবঃ পুরুষস্য কঃ
কিমাত্মকো হ্যয়ং নিত্যঃ কিং বিদন্নিত্যো বিপশ্চিতঃ
প্রকৃতি কা বিকারাঃ কে কিং লিঙ্গং পুরুষস্যাহ।"

(চরক,—শা: প্র:)

আর, প্রত্যুত্তরে আত্রেয় পুনর্বসু প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন—

"খাদয়শ্চেতনাধাত্রী ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ
চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ
পুরুষ্যাণুরুভেদেন চতুর্বিংশতিকঃ স্মৃতঃ
মনো দশেন্দ্রিয়াণ্যর্থাঃ প্রকৃতিস্তাইবাকৃতী।"

(চ:, শা:, প্র:)

এই যে চৈতন্য ও জড়ের সম্বন্ধে জীব ও জগতের প্রাণ বিজ্ঞানের গবেষণা, পদার্থের গবেষণা, এটা একমাত্র প্রাচীন ভারতীয়চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদেই সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব দর্শনের গবেষণায় যে ফললাভ হয়েছিল তারই অবদানস্বরূপে আমরা পাই দোষ, ধাতু, মলতত্ত্ব, দ্রব্যবিজ্ঞান, ঔষধপ্রস্তুতবিজ্ঞান, ব্যাধি প্রতিষেধ, ব্যাধিচিকিৎসা ইত্যাদি।

উত্তরোত্তর গবেষণার ক্রমপর্যায়ে সে যুগের আর একটী আবিষ্কার হল পঞ্চকর্মবিধি। দেহ সংশোধনার্থ —বমন, বিরেচন, কষায়বস্তি, স্নেহবস্তি ও নস্য

প্রকৃতি। কায়কল্প কিংবা চ্যবনের কৃচ্ছ্রপ্রাবেশিক রসায়ন যার সাক্ষ্যে। শুধু চ্যবনমুনি যৌবনলাভ করেছিলেন তা' নয়; আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বৃদ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী পর্যন্ত যৌবনোচিত সাবর্ণ্য ফিরে পেয়েছিলেন। ঋষি আত্রেয় দুধের গবেষণালব্ধ 'আরোগ্যকী রসায়ন' চরক কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হ'য়ে এখনো লোকের অশেষ উপকার করছে।

আয়ুর্বেদ-অনুধ্যানের প্রারম্ভ সময়ে ভেষজদ্রব্যের রস গ্রহণ—প্রকাশভেদের গবেষণার অন্যতম অবদান পঞ্চবিধ ঘৃত। স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, শীত ও ফাণ্ট, আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়ার এদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। ঘৃতৌষধি দ্রব্যের দ্বারা পঞ্চবিধ কষায় চিকিৎসার কঠিন অন্ত্রদাহ্য চিকিৎসারও বিনা অস্ত্রে সেকালে আরোগ্য হ'ত এবং এখনো হয়। এরকম বহু নজীর আছে। এমন কি, ঔষধের ধারাই রোগ সেরে যেত ব'লে তখনকার শল্যবিদ্যাবিশারদগণের বেকার হবার উপক্রম হয়েছিল। ঘৃতৌষধি আবিষ্কারের পর বৌদ্ধযুগে ইহা খুবই প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। অস্ত্র চিকিৎসা সে যুগে নিষ্প্রভ হ'বার এও একটি কারণ বলে অনেকে অনুমান করেন।

আজকাল যেমন নতুন নতুন 'এন্টি বায়োটিক' ঔষধের দ্বারা ম্যাজিক দেখাবার মতো কাজ হচ্ছে; পরিণাম তার যাই হোক; তখনকার যুগেও তেমনি ঔষধের তীব্রতা ও চমৎকারিতা আবিষ্কারের চেষ্টা হ'ত কিন্তু সেটা পরিণামকে উপেক্ষা করে আর এক রোগের সৃষ্টিরূপে দেখা দিত না। ভেষজকে অধিকতর তীক্ষ্ণ গুণসম্পন্ন করবার আভাস চরকের নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে পাওয়া যায়—

> "লঘ্বগ্নি বা তৈরস্পৃষ্টঃ দেশকালগুণাবিতম্
> ঔষধমাশ্বিকৈর্যুক্তং তূলাবীর্য্যৈঃ সুভাবিতম্
> স্নেহস্বেদোপপন্নশ্চ তীক্ষ্ণতা যাতিভেষজম্।"

এরকমের বহু শ্লোক আছে যা' নিয়ে গবেষণা করলে আরো নূতন নূতন তীব্র ওষধের, তাড়াতাড়ি কাজ দেখাবার মতো ঔষধ বার করা যায়।

দেবতা যুগ থেকে ঋষিযুগের শেষভাগে আয়ুর্বেদ গবেষণার সময় নির্ণয়কাল বিশেষজ্ঞগণ তিন চার হাজার বৎসর বলে অনুমান করেন। অবশ্য, এ নিয়ে মতভেদও রয়েছে, তবু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেকার আয়ুর্বেদ গবেষণার যে নজীর এখনো পাওয়া যায়, তার থেকে বহু নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। এখানে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। বিগত আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর ধরে' কি ভাবে আয়ুর্বেদ গবেষণা চলে আসতে আসতে বর্তমানকালে সে এসে পৌঁছেছে এবং সে গবেষণার কিছুটা ভারতীয় তথা বিশ্ববাসী উপলব্ধির কাছে, তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

ঋষিযুগের শেষে এবং মনুষ্য যুগের প্রথমে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করে' যে গবেষণা চলে তাতে অংশ গ্রহণ করেন প্রধানতঃ ধান্বন্তর, কুমার, কেল, মাধবকর, চক্ষুলাদি, বিজয় রক্ষিত, সাত্বত, ভরদ্বাজ, জেজ্জট, গয়াদাস, ডাল্হণ প্রভৃতি; এঁরা প্রাচীন আয়ুর্বেদের মূলসূত্র হেতু লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞান এই ত্রিসূত্রকে ভিন্ন ভাবে চরকসংস্কৃত আয়ুর্বেদের টীকা রচনা দ্বারা অপূর্ব মৌলিক গবেষণার পরিচয় প্রদান করেন। দোষবাদ-মতভেদ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁদের আয়ুর্বেদের বিপুল ব্যাখ্যা ও বহু বিশ্লেষণ তৎকালীন গবেষণার একটি আশ্চর্য নিদর্শন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, দেবতা ও ঋষিযুগ বলে আবার মনুষ্যযুগ বলার অর্থ কি? দেবতা এবং ঋষিরা কি মানুষ ছিলেন না? এই উত্তরে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, দেবতা ও ঋষিগণ

অবশ্যই মানুষ ছিলেন কিন্তু গুণগত বিচারে সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন।

আয়ুর্বেদপ্রবর্ত্তক আত্মদ্রষ্টা ঋষিদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে' মহামতি মানবকও তেমনি ছিলেন। তাঁরাও ত আর তাঁদের মতো ঋষিদের নয়, সুতরাং মহন্মেধাসম্পন্ন সাধারণ স্তরের মানুষের জন্য আয়ুর্বেদবিজ্ঞান শিক্ষার অবশ্য সুযোগ থাকা চাই। তাই তিনি বলেছেন নানা মুনীনাং বচনৈর্বিরোধী সমাসতঃ সংক্ষিপ্যতে সোপপত্তিকায়ুর্বিজ্ঞানমিহোপদেক্ষ্যতে।

নানাতন্ত্র বিহীনানাং ভিষক্তামল্পমেধসাম্
সুখং বিজ্ঞানমায়ুষ্যমনেন ভবিষ্যতি।"

মানবক রোগবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, আর বিজয় রক্ষিত গবেষণা করেন মানবের রোগ নিদানের উপর। হরকৃত মুকোষ টীকায় তিনি বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় মৌলিক গবেষণার অনবদ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

সম্রাট বুদ্ধসেনের রাজত্বকালে, ভেষজবিজ্ঞানে পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, রস, উপরস, ধাতু-উপধাতু ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা সুরু হয় এবং এই গবেষণার প্রবর্ত্তন করেন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুদ্ধদেবের চিকিৎসক জীবক।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ নিয়ে গবেষণা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে নাগার্জুনের অভ্যুদয়ের সময় পর্য্যন্ত উৎকর্ষের চরমে লাভ করেএবং সে যুগেই স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ, বঙ্গেশ্বরবলি-আদির মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ, প্রভৃতি আরো অনেক ধাতুঘটিত আশ্চর্য্য ফলদায়ক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, যার অপূর্ব অবদান আজও পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বীকৃত।

জীবক ও নাগার্জুন পারদের বহু প্রকারের সংস্কার সাধন করে অণু পরমাণু বিশ্লেষণ দ্বারা প্রধানতঃ আট প্রকার ও সূক্ষ্ম অষ্টাদশ প্রকার পারদের সংস্কার আবিষ্কার করেন এবং শরীরতত্ত্বের পারদের দ্রুত রোগ আরোগ্য করা ও দীর্ঘজীবন লাভে শোধিত পারদের অসাধারণ উপযোগিতা প্রমাণ করেন। পরবর্ত্তীকালে ভাবমিশ্র, চক্রপাণি, শার্ঙ্গধর, মল্লন ভট্ট, শ্রীকণ্ঠ ভট্ট, বঙ্গসেন প্রমুখ মনীষী গবেষক গণ রসৌষধির সঙ্গে রসৌষধির মিশ্রণে অপূর্ব ঔষধ সমূহ আবিষ্কার করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন চাং ইটালীর পরিব্রাজক মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীতে একথা স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে।

তাঁরা বলেছেন—"শোধিত পারদ ও গন্ধকচূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ অল্প মাত্রায় প্রচুর দুগ্ধসহ ও অল্প সময়যোগে সেবন করিয়া বহিল ভারতের কোন ব্রাহ্মণ যোগী সম্প্রদায় যেরূপভাবে সুস্থ জীবন যাপন করিতেন।" (আয়ুর্বেদ ইতিহাস, বি, কে, ভট্টাচার্য্য)

চার পাঁচ হাজার বছর ধরে' আয়ুর্বেদের গবেষণা তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারেই চলে' আসছে। এখনো অনেক বিষয়ক গ্রন্থগুলো তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছে। আধুনিক যুগের আয়ুর্বেদ গবেষণাও একদিকে চিকিৎসা ও রোগ প্রতিষেধে, অপর দিকে ঔষধ সংরক্ষণ ও ঔষধপ্রস্তুত প্রণালীপূর্ব্বে উল্লিখিত আয়ুর্বেদ পন্থা অনুসরণ করেই অগ্রসর হচ্ছে।

বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধ আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় রত প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, *M. A.*; *D. Sc.* (*Ayurved I. U.*) মহাশয় আজ থেকে কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে যারা আয়ুর্বেদের গবেষণা করে' আসছেন তাঁদের একটী নামের তালিকা প্রকাশ ক'রে আধুনিক কালের আয়ুর্বেদ গবেষকদের বিশেষ সহায়তা করেছেন।

এ ছাড়া তিনি আলোক ও বন্যারোগের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণাও সযত্নে চালিয়ে যাচ্ছেন।

আধুনিক কালের আয়ুর্বেদ গবেষণা এবং গবেষকদের কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ৺গঙ্গাপ্রসাদের কথা থেকে সুরু করতে হয়। তিনি চরকের "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা লিখে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন এবং আধুনিক যুগের আয়ুর্বেদ গবেষণার প্রথম দিগ্‌দর্শন করেন। তারপর ৺কবিরাজ যোগেন্দ্র নাথ সেন "চরকোপস্কার" লিখে আরো আলোক সম্পাত করেন।

কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন, যাঁর ঘুরে পরম পূজ্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরামর্শ করেছিলেন, জটিল রোগের জটিল চিকিৎসার গবেষণায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তখন বহুত কঠিন রোগী আশ্চর্যভাবে সারাতেন। রসবতী এবেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসা বর্তমান সময়ের তুলনায় শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেনি। সেকালের আয়ুর্বেদ গবেষণায় ৺বিজয়রত্ন সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গত যাদবীভূষণ আয়ুর্বেদের অনেকগুলি বিষচিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করেছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺গণনাথ সেন সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্বেদের "এনাটমী" লিখে অপূর্ব গবেষণার পরিচয় দেন; যার জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিদানে পুরস্কৃত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থখানি 'প্রত্যক্ষ শারীরম্' নামে পরিচিত। 'শিরার নিদান' নামে তিনি আর একখানা মৌলিক গবেষণা মূলকগ্রন্থও রচনা করে' গেছেন।

সুশ্রুত সংহিতার উপর ৺নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী কবিরাজ মহাশয়ের টীকা অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অনবদ্য গবেষণার নিদর্শন। স্বর্গত কবিরাজ জ্যোতিশ্চন্দ্র সরস্বতী মহাশয়ও সুশ্রুত সংহিতার উপর চমৎকার গবেষণা করেছেন। এঁরা সবাই আজ থেকে একশত পঁচিশ বৎসরের আগেকার লোক। এঁরা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে হরিনাথ বিদ্যারত্ন, রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, রাজবৈদ্য প্রসন্ন নাথ, শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আরো অনেকে আয়ুর্বেদ নিয়ে গবেষণা করে যশস্বী হয়েছেন। প্রাচীনদের মধ্যে আজো যাঁরা বেঁচে রয়েছেন কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র মল্লিক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যনিধি, শ্রীরাধাগোবিন্দ সেন তাঁদের অন্যতম। এরা সকলেই এই বৃদ্ধ বয়সে আয়ুর্বেদ গবেষণায় নিরত এবং বর্তমানে কলকাতার সর্বজ্যেষ্ঠ সুচিকিৎসক ও যশস্বী আয়ুর্বেদচিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। এঁরা সবাই নিজ নিজ গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। আরো যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সকলের গবেষণার কথা এখানে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি কলিকাতার তিনটি আয়ুর্বেদ-কলেজ-হাসপাতালের আয়ুর্বেদ-গবেষণাগারে শ্লীপদ রোগ, উদরী, যকৃৎ রোগের চিকিৎসা ও ঔষধের উপর গবেষণার জন্য নয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন। কিন্তু আয়ুর্বেদের পীঠস্থান বাংলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক পয়সা ও সাহায্য দিচ্ছেন না গবেষণার জন্য। এসব গবেষণার ফল সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে তা'তে এটুকু বলা যায়, উদরী, যকৃৎরোগ চিকিৎসায় সুবর্ণবঙ্গ ও কুমুদখাড়ার আশ্চর্য্য কার্যকারিতা আবিষ্কৃত হয়েছে। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদে শুদ্ধায়ুর্বেদের বিভিন্নমুখী গবেষণা নিয়ে যে প্রচেষ্টা চলছে তা'তে কবিরাজ শ্রীবঙ্কিমকুমার মজুমদার এম, এ, মহাশয় অক্লান্তভাবে কাজ করে' যাচ্ছেন। সম্প্রতি 'বিমল জ্যোতি' নামে

একটী অপূর্ব আয়ুর্বেদীয় ঔষধ দিল্লীর আয়ুর্বেদ-গবেষক মণ্ডলী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। বহুমূত্রাও রসায়ন চিকিৎসায় ইহার কার্যকারিতা অমোঘ। সংবাদ পত্রে এই খবরই প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধ লেখক বহু আজ তিরিশ বৎসর যাবৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদিরই সন্ধানে' যাবতীয় বন্য বোস ও পশ্যবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তার অভিজ্ঞতাও গবেষণালব্ধ ফল 'পশ্যবিজ্ঞান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। বইখানা শুধু প্রাচ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে তা' নয়; বইটির পঞ্চম সংস্করণ বাজারে চলছে। সেজন্যই, আয়ুর্বেদকে ফেকেলে বলে' যারা নাক চোখ বুজে থাকেন তাঁদের মধ্যে দুটী অযোগ্যতার ক্রিয়া —করছে বলে' লক্ষ্য করা যায়। একটী হচ্ছে— প্রাথমিক সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতার অভাবে জন-সাধারণের মধ্যে আয়ুর্বেদ গবেষণা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব. অপরটী হচ্ছে—পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা প্রচার করে' নব্য বিজ্ঞানের অন্ধ ও অতিরঞ্জিত গুণগানে চারু পিটিয়ে দেশবাসীর মনকে দেশের যাকিছু ভালো তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে' তোলা, জোর করে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে দেশের লোককে তুলিয়ে মুখে সরিয়ে রাখা। আরো খাঁজরে দেখতে গেলে দেখা যাবে এর মূলে রয়েছে ব্রিটিশের দেওয়া এতকালের কিরিঙ্গী শিক্ষার প্রভাব। তাই দেশীয় তাবৎ লোক তথাকথিত স্বাধীনতা পেয়ে সর্বোদয়ের পথে পা' না বাড়িয়ে মনেপ্রাণে বিদেশীর অনুকরণ করে চলেছে। এতে একদল অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের কবল গ্রস্ত হয়ে পড়ছে, অপর এক দল রাশিয়ান ব্লকের কবলগত হয়ে পড়ছে, ফলে এ দু'দলের মধ্যে পড়ে ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি আজ খাবি খাচ্ছে।

বন্ধু, সম্প্রতি আমরা চেষ্টা করছি আয়ুর্বেদ গবেষণা পদ্ধতিতে কিভাবে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের অনুপান বিজ্ঞানকে সহজ সরল উপায়ে অধিকতর কার্যোপ-যোগী করা যায়। ভাবনাবিধির সাহায্যে অনুপানকে ঔষধের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে মকরধ্বজের মতো খাওয়ান যায় কিনা সেটা নিয়ে এখন গবেষণা চলছে।

সুরা, আসব, অরিষ্টকে পরস্পর মিশ্রিত করে' ব্যবহার করলে রোগের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে, তা' ও পরীক্ষা করে' দেখা হচ্ছে। যেমন—মৃত সঞ্জীবনী সুরার সঙ্গে আসবিষ্টি কিম্বা অশ্বগন্ধারিষ্টের মিশ্রিত ব্যবহার, দারিবাসবারিষ্টের সহিত শতমূলারিষ্টের মিশ্রণ ইত্যাদি। কিন্তু এসব গবেষণায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের কে দিচ্ছে!

মন্ত্রীদের ডিরেক্টরদের ছেলে এনে যেখানে তাঁরা মহাবিজ্ঞের মতো মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করেন, যেন আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে তাঁরা সব বুঝে ফেলেছেন। কিম্বা আমার প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাহায্য দেবার নাম করে ধোকা দেন, আর আসলে লক্ষ লক্ষ টাকা বিজাতীয় চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ করে বসেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহলে একশত বৎসরের এলোপাথি বিজ্ঞান একমাত্র ডাঃ ব্রহ্মচারীর 'ইউরিয়া ষ্টীবামিন্' ছাড়া আর কি আবিষ্কার করেছে? এযাবৎ যতো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে এলোপাথি চিকিৎসার পেছনে?

স্বর্ণসিন্দুর, মৃগনিকারস, মৃতসঞ্জীবনী, ব্লাড্ প্রেসার ও ঔষধের দর্পনতা (ছোট টাকর), বিষজ্বরান্তি, ধুলকুড়ি, পুনর্নবা, বাসক, ব্রাহ্মী, এসবের আবিষ্কারে সরকারের কি দান আছে?

আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদ গবেষণায় দেশের ওপর ডিক্টেটর মত সম্প্রতি একটী নতুন ব্যাপার উপলব্ধি এসে জুটেছে। ভারতীয় ডাক্তারগণ বেকার হয়ে পড়বেন এই আশঙ্কায়ই মেডিকেল এসোসিয়েশন থেকে সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে আয়ুর্বেদের সরকারী স্বীকৃতি বিলম্বিত হয়। এ কথাটা প্রকাশ্য সভায় একজন কংগ্রেসী চাঁই সেদিন বলেছেন।

আয়ুর্ব্বেদে উদরাময়

কবিরাজ শ্রীসুধী নাথ রায়, কবিরত্ন

আমাশয় অর্থাৎ অজীর্ণ হেতু সমস্ত রোগই বিশেষতঃ উদরোগ জন্মিয়া থাকে। অজীর্ণ অত্যন্ত দোষজনক বিরুদ্ধভোজন ও পূর্ব্বাহার অজীর্ণ-সত্ত্বে পুনর্ভোজন ইত্যাদি এবং মলমূত্র এইগুলি উদর রোগ জন্মিবার কারণ। উদরে বা স্থান বিশেষে অথবা সমস্ত উদরে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং সমস্ত উদররোগীর শোথ একটী প্রধান লক্ষণ।

আধ্মানা গমনেঽশক্তি র্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা
শোথঃ সদনমন্ত্রানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ।
দারুণত্বাচ্চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তিহি॥

উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অন্ত্রমলের অবসাদ, অধোবায়ু ও মলের অপ্রবৃত্তি এবং দারুণত্ব এইগুলি সর্ব্বপ্রকার উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

সর্ব্বেষু দোষিতঃ প্রায়ো দোষস্তাভ্যেতি যত্নতঃ।
অতো বাতাভিশমনী ক্রিয়া সর্ব্বত্র শস্যতে॥

উদররোগমাত্রই প্রায় ত্রিদোষজনিত। অতএব বায়ু প্রভৃতি ত্রিদোষের শান্তিকারক চিকিৎসাই উদররোগে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

উদরে দোষসম্পূর্ণে ক্ষুধো মন্দা ততোঽনলঃ।
তস্মাদ্ ভোজ্যানি ভোজ্যানি লঘূনি চ॥

উদর দোষপূর্ণ হইলে অগ্নিক্ষীণতা অর্থাৎ নিস্তেজ হইয়া থাকে, অতএব উক্ত রোগে অগ্নিবৃদ্ধি কারক অথচ লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে।

উদররোগ আটপ্রকার—যথা বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, প্লীহাজনিত, মলসঞ্চয় জনিত, রক্তজনিত ও জলসঞ্চয়জনিত।

১। বাতোদরে অর্থাৎ বায়ুজনিত উদর রোগে রোগীর চক্ষুপল্ল, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ জন্মে এবং কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, বস্তি, পৃষ্ঠদেশে ও পর্ব্বস্থানে বেদনা লক্ষিত হয়, শুষ্কাবস্থায় কশা হয়, সর্ব্বাঙ্গেই বেদনা, রোগীর অধোলেপের অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগের গুরুতা, মলরোধ, মুখ, চক্ষু ও মূত্র প্রভৃতির কৃষ্ণ বর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, মন্দাগ্নি, উদরস্থ শোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচিবেধবৎ বেদনা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহ দ্বারা উদর আচ্ছাদিত এবং হাতের অঙ্গুলীদ্বারা আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থলের ন্যায় শব্দ হয়—অনুভব, সময় সময় এই রোগে বায়ু উদরের মধ্যে বেদনা জন্মাইয়া এবং শব্দ উৎপাদন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। এই সকল লক্ষণ বাতোদর রোগীর প্রকাশ পায়।

২। পিত্তজনিত উদররোগে রোগীর জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রান্তি, অতিসার, রক্ত ও নয়নাদির পীতাভা দৃষ্ট হয়। এবং উদর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মযুক্ত ও উষ্ণ-বিশিষ্ট এবং দাহান্বিত বোধ হয়। হরিৎ, পীত, বা তাম্রবর্ণ শিরা সমূহদ্বারা উদর ব্যাপ্ত এবং মুখের ন্যায় উদ্ভার উঠিতে থাকে। পিত্তোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদরে পরিণত হয়।

৩। শ্লৈষ্মিক উদররোগে রোগীর অবসন্নতা, শোথ শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং মুখ ও চক্ষু প্রভৃতির শ্বেতাভা দৃষ্ট হয়। উদর স্তব্ধ স্নিগ্ধ, শুক্লশিরা সমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত, অত্যন্ত বৃহৎ ও দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি,

কঠিন, স্পর্শে শীতল, শুষ্ক এবং নিস্তেজ বোধ হয় অর্থাৎ উদরস্থ মেদে বৃদ্ধি পাইলে উদর দৃঢ় কঠিন এবং স্পর্শ কালে শীতল বোধ হইয়া থাকে।

৪। সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষ জনিত উদর রোগে চলীলা কামিনীগণ কোন পুরুষকে মদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত নখ লোম, মূত্র, বিষ্ঠা অথবা আর্ত্তব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে অথবা কোনও ব্যক্তি শত্রুতাবশতঃ সংযোগ বিষ ছলন করাইলে কিম্বা দূষিত জল প্রভৃতি সেবনদ্বারা ঐ সকল বস্তুর রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় দূষিত হইয়া সান্নিপাতিক উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শীতল বায়ুতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে বর্দ্ধিত হয় ও রোগীর ঘাম উপস্থিত হয়, এই রোগে রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মূর্চ্ছা হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও পিপাসায় কণ্ঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে।

৫। প্লীহোদর রোগে বিদাহী, কফজনিত দ্রব্যভোজনরত ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সাধন করে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা-জনিত উদররোগকে প্লীহোদর কহে। সেই প্লীহা উদরের বাম পার্শ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নিসাদিহীন, কফ পিত্ত উপদ্রবে উপদ্রুত ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। এইরূপ উদরের বাম পার্শ্বে প্লীহার বৃদ্ধিকে প্লীহোদর কহে, আর উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃতের বৃদ্ধিকে যকৃদালুদর কহে।

৬। বদ্ধোদর বা মলসঞ্চয় জনিত উদর রোগে যে সকল ব্যক্তি ভোজন কালে শাক, শালুক, আলুকাযুক্ত অন্ন ভোজন করে, সেই সকল ব্যক্তির জল দূষিত হইয়া মার্জ্জনী (ঝাঁটা) নিক্ষিপ্ত ধূলারাশির ন্যায় ক্রমে ক্রমে অন্ত্র নাড়িতে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেই নাড়িতে মল, রুদ্ধ থাকিয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে উদর ও নাভির অধোবর্ত্তী স্থানে উদরের বৃদ্ধি হয়। ইহাকে বদ্ধোদর কহে।

৭। অন্ত্রোদর রোগে কুদ্রব্যের সহিত কোনপ্রকার কষ্টকাদি মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে বা কোনপ্রকারে উহা উদরে প্রবেশ করিলে অন্ত্র-নাড়িকে ক্ষত করিয়া উদর রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে অন্ত্রের অন্তস্থান হইতে অধিক পরিমিত জল গুড়গুড় দিয়া পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সূচিবিদ্ধ এবং বিদীর্ণবৎ বেদনা অনুভূত হয়। ইহাকে অন্ত্রোদর কহে।

৮। জলোদর বা জল সঞ্চয় জনিত উদর রোগে যে সকল ব্যক্তি স্নেহ পান বা স্নিগ্ধকারী প্রয়োগ করিয়া অথবা বমন, বিরেচন নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিয়া অতি শীতল জল পান করে তাহাদিগের উদরস্থ ধমনীসমূহ দূষিত হয় এবং স্নেহদ্বারা প্রলিপ্ত হয়। এইরূপে রসবহা নাড়ীর বহির্ভাগে অন্তরস সঞ্চিত হইয়া জলোদর উৎপন্ন করে। জলোদরে উদর চক্ষুকে, বৃহৎ, জলপূর্ণ ও প্রায়শঃ স্ফীত এবং নাভিদেশের চতুর্দ্দিক বেদনাযুক্ত ও চরমিদ্রিত জলপূর্ণ থলের ন্যায় কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়। আট প্রকার উদররোগের বর্ণনা করা হইল। সমস্ত উদর-রোগই বহুযত্নে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বলবান ব্যক্তির উদররোগ অল্প দিনের হইলে এবং যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হইতে পারে। যে উদররোগীর চক্ষুতে শোথ, শিরজালা বক্র এবং বল, রক্ত ও অগ্নি নষ্ট হইয়াছে এবং চর্ম্ম শুষ্ক, শ্লেষ্মযুক্ত সেই রোগী অসাধ্য। পার্শ্ব বেদনা, অরুচি, শোথ, অতিসারাক্রান্ত উদর রোগীর রোগ

অসাধ্য। তন্ত্রিম যে সকল উপদ্রবযোগে রোগীর প্রাণ হইলেও উপদ্রব বাহুল্যপূর্ণ লক্ষিত হয় তাহাও অসাধ্য।

১৩০৮ সালে কলিকাতার ৺হরি, জগন্নাথপুর সেনের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতার কঠিন উপদ্রবযোগের চিকিৎসা করি। তাঁহার তখন বয়স ৮৪ বৎসর। সর্ব্বাঙ্গ শোথ উদরে অত্যধিক জলা, নিশ্বাসেও ঘোরতর কষ্ট হইতেছিল, নিদ্রা নাই, যে কোন সময় মৃত্যু হইবে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। নানা চিকিৎসায় হতাশ হইয়া কিরণ বাবু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। মৃত্যু হয় হয় করিয়া হইতেছে না, মাতার কষ্টেরও কিছু লাঘব হইতেছে না দেখিয়া কিরণ বাবু ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন মনঃকষ্টে আলাপিপাত করিতে ছিলেন, এই সময় হাইকোর্টের জাষ্টিস এ, এন, সেন মহাশয় কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিয়া আমাদের কথা বলেন। আমি ঐ সময় তাঁহার মাতার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করি এবং ৩ দিনের ঔষধ সেবনেই তাঁহার মাতার শ্বাস কষ্ট কম হইয়া যায় -পেটও আস্তে আস্তে কমিতে থাকে। ৭দিন ঔষধ সেবনেই বার আনাপরিমাণ রোগ কমিয়া যায়, ২সপ্তাহেই সর্ব্বাঙ্গের শোথ এমন কি পেটে জলা নাই বলিয়াই মনে হয়, কষ্টের লাঘব হওয়ায় মাতার মুখে হাসি ও দেখা যায়। আমি তাঁহাকে পর ১২।১২।৩৫ তারিখে প্রাতঃকালে স্বর্ণপর্পটী ২রতি মাত্রায় মুগ মধু, তাঁহার ১ ঘণ্টা পরে মুগ প্রবর্ত্তক চূর্ণ (সোয়া ৵০ আনা—মকরধ্বজ ১ রতি সহ মিশাইয়া) নলটুনি ২ ডোলা, জল /৷০ সের দিয়া জাল দিয়া /৵০ আধ সোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ঐ ঔষধ মিশাইয়া খাইতে দিয়াছিলাম। এই নলটুনির অন্য কোন নাম আছে কি না জানিনা। নাটোরে এই লতা গাছ বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। তথা হইতে এই লতা সংগ্রহ করা হইত। এখন পাকিস্থান হওয়ায় সেই সুবিধা নাই। পিতৃদেবকে বহু দিন হইতে উহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি—দিবা ১২টায় মকরধ্বজ ১রতি, শ্বেত চূর্ণ ৵০ আনা একত্রে ভাবের জল সহ, বেলা ৪টায় ত্রিকটুচূর্ণ পুনর্ব্বার মধু সহ ও যোগেন্দ্র বল ভাবের জল ও চিনি সহ সেব্য এবং শুদ্ধ মূলাদি তৈল শোথ স্থানে ও পেটে মালিশ করিতে দিয়াছিলাম। এই ব্যবস্থায় অত্যধিক প্রস্রাব হইত। প্রথম ৪দিন দুগ্ধ বার্লি, তৎপর হইতে কেবল দুগ্ধ পানে এবং পিপাসায় ভাবের জল এই পথ্য ছিল। পরে /৩ তিন সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতেন। এইরূপ ভাবে ঔষধ একটু অদল বদল করিয়া, ৪মাস চিকিৎসা করিয়া এই রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। তবে স্বর্ণপর্পটী ১রতি পর্য্যন্ত দিয়াছি, আর বৃদ্ধি করি নাই। ২১।২২ দিন পর হইতে ১ বার দুগ্ধ ভাত পথ্য দেওয়া হইয়াছিল এবং দুগ্ধ ইচ্ছামত খাইতে দেওয়া হইয়াছিল পিপাসায় ভাবের জল দেওয়া হইত। ১৩৫৬ সালের ২১শে বৈশাখ,৪।১ হাজার কোর্ট ষ্ট্রীটস্থ বিদ্যার অনুজ দত্ত (লার অমেন দত্তের পুত্র) উপরোগের জন্য চিকিৎসিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স৭০। ৭১ বৎসর হইবে। পেটে জল, পা ফোলা, হৃৎদর্দ্দ ছিল। ক্ষুধা মোটেই ছিলনা। অম্লটি ও পেটে বায়ু, প্রথম সপ্তাহে প্রাতঃকালে (রোহিত অম্লের লিত্তভাবিত) ত্রিফলাদি আধার রস্ ও মধু সহ দিবা ১০টা ও সন্ধ্যা ৬টায় ত্রিফলাদি এক বটী পুনর্ব্বার রস ও মধু সহ সেব্য বেলা ২টায় শ্বেত চূর্ণ পুনর্ব্বার সহ, মহাশঙ্খ বটী রাত্রি ৯টায় পুনর্ব্বারসহ —প্রথম দিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সুখবিরেচন গরম দুগ্ধ ও মিশ্রী চূর্ণ সহ সেব্য। সাহেব মহাশয়ের উচ্চ লোকে অনুপানাদি দ্বারা ঔষধ সেবন সম্ভব নয়। জীবনে প্রথম আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ সেবন

করতে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কু: শিলা জলাদি প্রস্তুত বিধি যথা—শিলাজতু, হরিতকী, আমলকী, অভ্রক, শুল্‌শুলু মনসাসীজের আঠা প্রভৃতি দ্রব্য সমভাগ গোমূত্র সহ মর্দ্দন ।০ সিকি মাত্রার বটী পুনর্ণবার্ক প্রস্তুত বিধি—কুক্‌-মূল, কাশিয়া মূল, ইক্ষু মূল, নীল মূল, সাদা পুনর্ণবা, গোমূত্র, গন্ধরূপ কাকমাচী ও শুষ্ক মূলা, প্রতিদ্রব্য /৸৹ সোয়া, জল ১।০ এক মন মল সের—ক্বেথে ৪।০ সাড়ে চার সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারে ছাঁকাইয়া লইতে হইবে। উহার বদলে জলের পরিবর্ত্তে এই অর্ক ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। জল খাওয়ার প্রথম অবস্থায় যদি, কু: বালি শিলাপার পুনর্ণবার্ক দেওয়া হইয়াছিল, এইরূপ অবস্থানুযায়ী কিছু অদল বদল করিয়া নবম দিন হইতে প্রাতঃকালে স্বর্ণ পর্পটী ২ রতির সহিত শুলফের চিনি ৶৹ আনা মিশাইয়া মধু সহ দেওয়া হয়, দিবা ৮ টায় মূত্র প্রবর্ত্তক অর্থাৎ সোডা ৶৹ আনা মকরধ্বজ ১ রতি এবং পুনর্ণবা সহ। দিবা ১১ টায় কু: শিলা জলাদি ভাবের জল অথবা পুনর্ণবার্ক সহ। ৪।০ বিকার ঘোল অর্থাৎ ঘোল চূর্ণ শর্করার স্থলাভিষিক্ত। বেলা ১টায় ভাবের জল অথবা পুনর্ণবা সহ ত্রিফলা চিত্রামূল ও এলাচ্‌ চূর্ণ ভাবের জল ও মিশ্রী চূর্ণ সহ মহাশঙ্খ বটী মূত্র প্রবর্ত্তক ৶৹ আনা মাত্রা ১টায় পুনর্ণবার্ক সহ দেওয়া হইয়াছিল, এই রূপ ঔষধ একটু অদল বদল করিয়া দেওয়া হয়। আরও কয়টী উদরী রোগী এইরূপ চিকিৎসায় বেশ উপকার পাইবার পর ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিয়ম পালন করিতে না চাওয়ায় অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ায় পুনরায় উদরে জল হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। অর কাস অরুচি সহ অনেক উদরী রোগীকে পুনর্ণবাষ্টক পাচন মূত্র প্রবর্ত্তক চূর্ণ মিশাইয়া স্বর্ণ পর্পটী কোন কোন স্থলে হল পর্পটী পিপুল চূর্ণ মিশাইয়া দেওয়ায় বেশ জল পাওয়া গিয়াছে।

এসম্বন্ধে আরও আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ইতি—

—কায় চিকিৎসা—

কবিরাজ বৈদ্যাচার্য্য শ্রীঅমলাচরণ সেন, ভিষক্‌শাস্ত্রী, কবিরত্ন।

কায় চিকিৎসা বলিলে আপাততঃ আমাদের ইহাই প্রতীত হয় যে কায় অর্থাৎ শরীর বা সর্ব্বাঙ্গের চিকিৎসা। এই অর্থ করিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের কোনই সার্থকতা থাকে না। মহর্ষি চিকিৎসক চক্রপাণির প্রসিদ্ধ টীকাকার কায় চিকিৎসা শব্দের অর্থ করিতে গিয়া প্রথমে বলিয়াছেন, "কায়ঃ সকলস্য শরীরস্য তন্ত্র চিকিৎসা, প্রায়েণ বলবতঃ সর্ব্বাশ্রয়ব্যাপকস্য দোষসমূহস্য অগ্নিসারসংশুদ্ধিবাতস্য সম্ভবস্তি"। এই প্রায় শব্দের দ্বারা শল্য শালাক্যপ্রভৃতি অঙ্গ হইতে এই কায় শব্দের প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একটী শাস্ত্রীয় পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শাস্ত্রকারই প্রয়োজনানুসারে এইরূপ পারিভাষিক শব্দ স্বীকার করিয়াছেন। যেমন, "দোষ" বলিলে লৌকিক ব্যবহারে কাপড়, পরন, ইন্দ্রিয়াদি বুঝা যায় কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রে এই দোষ শব্দের অলঙ্কারঘটিত, সাহিত্যঘটিত, চিকিৎ

প্রকৃতি অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, আবার আয়ুর্বেদ শাস্ত্র দোষ শব্দে বায়ু, পিত্ত, কফ স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য কায়চিকিৎসা এই শব্দের উল্লেখে চক্রপাণি দত্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "কায়স্যাগ্নিবায়োশ্চিকিৎসা"। বিজয়রক্ষিত এই আঠরাগ্নির অর্থ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "কায়তি শব্দং করোতি, কায়ো জাঠরাগ্নিঃ।"

আমাদের স্বতঃই মনে হইতে পারে শব্দ করোতি এই অর্থে কি করিয়া জাঠরাগ্নি প্রতিপন্ন হয়? বিজয়রক্ষিত এখানে একটি ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া ঐ অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন "অন্ত্রনলী পিহিতে কর্ণমূলে মৃদু ইতি শব্দ শ্রবণাৎ জাঠরাগ্নে বা কায়-শব্দেনাভিধানাচ্চ।" এই কথাটিরই পুনরায় প্রমাণ করিবার জন্য তিনি হেতুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হেতু বলিয়াছেন "জাঠরঃ প্রাণীনামাগ্নিঃ কায় ইত্যভিধীয়তে।"

এই জাঠরাগ্নির বিকৃতাবস্থাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য যাঁহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারাই কায়-চিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হন। পূর্বোক্ত হেতুর শ্লোকের পরার্দ্ধে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। হেতু বলিয়াছেন, "অস্তচিকিৎসেৎ শীঘ্রকৃৎ লঘুরে কায়চিকিৎসকঃ ইতি।" এবং অগ্নিবিকৃতি কোন কোন রোগে হইয়া থাকে মহামতি বিজয়রক্ষিত তাহারও একটী উল্লেখ করিয়াছেন, "যতো অবাতিসারোদরঃ কায়-চিকিৎসাবিষয়া রোগঃ অগ্নিদোষাদেব ভবন্তীতি।"

জাঠরাগ্নি, প্রকৃতি বিকৃতি বা তজ্জনিত রোগ সমূদয়ই আবার নির্ভর করে এমন একটি তত্ত্বের উপর যাহা আয়ুর্বেদের যে কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত। এই ত্রিদোষতত্ত্ব আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ের মূলভিত্তি। কারণ -

"বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যানিলা যথা
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা।"

অর্থাৎ জগতের পক্ষে চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে জীব শরীরের পক্ষেও কফ, পিত্ত ও বায়ু সেইরূপ কার্য্য করে। কফের স্বরূপ গুরু-গুণ সৌম্যাদি, ক্রিয়া বিসর্গ অর্থাৎ বলদান; পিত্তের স্বরূপ অগ্নি—গুণ উষ্ণাদি, ক্রিয়া পরিপাক; বায়ুর স্বরূপ বায়ু গুণ শৈত্যাদি, ক্রিয়া পরিচালনা এই ত্রিদোষের মধ্যে বায়ুই সকলের চালক (প্রেরণাদাতা)। এই বায়ু-পিত্ত-কফরূপ ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থার নাম স্বাস্থ্য এবং হানি বা বৃদ্ধি বশতঃ বিকৃতির নাম রোগ। এই শক্তি ত্রয়ের নাম দোষ ও বটে, ধাতুও বটে ইহারা শরীরে রোগও জন্মায়, আবার শরীরকে ধারণও করে। আয়ুর্বেদের আটটি শাখাতেই এই মূলসিদ্ধান্ত প্রসারিত। এই দোষ বিভাগ ছাড়িয়া দিলেও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক রহিয়াছে। কায়-চিকিৎসাবিষয়ক ত্রিদোষতত্ত্বের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইলেও কায়ারও একেবারে নিরপেক্ষ হইবার উপায় নাই। এছাড়াও বিভাগগুলির পরস্পরিক সম্বন্ধ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন জ্বরে ও উদাবর্তে - অমল তক্র ও ঘৃতবিধান, অর্শ অম্লরী প্রভৃতিতে শল্যতন্ত্রের, বাতরোগে ঘৃতবিধান অভিষেক বর্ত্তমানে। বিশেষতঃ কায়চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত বস্তি ব্যাধিতে শল্যতন্ত্রের অবাধে সহযোগিতা দেখা যায়। বিদ্ধচিতে পাক্ষিবাহ, উদরে ত্রীহিমুখ শস্ত্রের প্রয়োগ, অর্শে অম্লরীতে শস্ত্রপ্রয়োগ এগুলি প্রয়োজনবোধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আবার এমন স্থলও আছে যেখানে কায়চিকিৎসকেরা তন্ত্র ব্যাধক্ষমীয়ানাধিকারে ক্রিয়া বিধৌ।" এই যুক্তিতে শল্যতান্ত্রিকের হস্তেই চিকিৎসার ভার অর্পণ করিয়া থাকেন।

অন্য চিকিৎসাঙ্গ থাকিলেও আয়ুর্বেদ কায়চিকিৎ-

সাধ্য প্রধান স্থির করিয়াছেন। যে রোগ যখনই চিকিৎসিত হউক না কেন প্রথমেই কায়চিকিৎসার প্রভাব দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "চরক সংহিতার" চিকিৎসিত স্থানে অর্শচিকিৎসায় কায়চিকিৎসার প্রাধান্য উল্লিখিত হইয়াছে। অস্ত্রোপচার প্রভৃতি অস্ত্ররোগে প্রযুক্ত হইলেও নিম্ন কায়চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই 'চরকসংহিতা' বলিয়াছেন—

"অধারোগানুলোম্যায় সর্বমিষ্টমসূচ্যতে।
অনুপানৌষধত্বাচ্চ তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ।"

এ স্থলে নিত্য শব্দের দ্বারা অর্শচিকিৎসায় কায়চিকিৎসারই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই কায়চিকিৎসার ব্যাখ্যায় বিকৃত অগ্নির চিকিৎসাকে কায়চিকিৎসা বলিয়া প্রমাণ দেখাইয়াছি; এই শ্লোকে বিকৃত অগ্নির চিকিৎসার জন্য সর্বদা সেবন প্রয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য যে রোগই আমরা দেখিতে পাই, প্রায় রোগে কায়চিকিৎসার ব্যাপকতা বর্তমান। এ সম্বন্ধে বহু রোগ উল্লিখিত হইয়াছে।

এই দোষত্রয় হইতে ব্যাধি দুই প্রকার দেখা যায়—সামান্যজ এবং নানাত্মজ, অর্থ অভিনব প্রকৃতির উপর একত্ব দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতজ ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই সামান্যজ ব্যাধি। নানাত্মজ অর্থাৎ আগন্তু বহু। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার নিজস্ব যে প্রভাব তাহাই নানাত্মজ। যথা আক্ষেপকাদি বায়ুরই নিজস্ব—পিত্ত বা শ্লেষ্মার নহে। এবং ওজোধাদি পিত্তেরই নিজস্ব বায়ু কিংবা শ্লেষ্মার নহে। এইভাবে নানাত্মজ (অসৌকিকবিকারাশ্চ-ধাতিজন্য পিত্তবিকারো বিশেষতঃ শ্লেষ্মবিকারাঃ।"

আয়ুর্বেদে ঋষিগণ সামান্যজ ব্যাধি নির্দেশ করিয়া নানাত্মজের মধ্যে একমাত্র বাতব্যাধির নির্দেশ সম্বন্ধে টীকা গ্রন্থে একমাত্র বাতব্যাধির নির্দেশ বিষয়ে হৈমাদ্রি মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, "বায়োরতিবলত্বেন আশুকারিত্বেন চলত্বিরত্বাৎ রুগ্‌বিকারাণাং দুরাধ্যত্বাৎ আশ্বেবাতায়কত্বাৎ বিশিষ্টচিকিৎসত্বাৎ বাতব্যাধীনাং বহু কল্পিতত্বাচ্চ বাতব্যাধীনাং বহু কল্পিতত্বমাহ। অতএব সুশ্রুতাদিভিরপি বাতরোগাণাং এব নির্দিষ্টো বহু কল্পিতরোগব্যাহ" এই কথাই প্রতিপন্ন করিয়া চক্রপাণি প্রভৃতি টীকাকার প্রধান চিকিৎসক শিরোমণি কেন বহুকল্পিতব্যাধি কেন নির্দেশ করা হয় নাই তাহার একটি স্পষ্ট যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন, "বহুকল্পিতবিকারাণাং যথাবিধিবিধানং বিজ্ঞেয়মসাধ্যাদি-বহুকল্পিতমানস্যচিকিৎসোক্তা চিকিৎসোক্তেতি জ্ঞেয়া"।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান কতকগুলি নূতন রোগের নাম ঘোষণা করিয়া আয়ুর্বেদের ঋষিনির্দিষ্ট গ্রন্থের নির্দিষ্ট রোগসমূহের অতিরিক্ত রোগ এ দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বহু পূর্বেই বর্তমানে যে যে রোগ দেখা যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে যে রোগ জন্মিবে সেই সকলের এবং তাহাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন -

"বিকারাণামনুৎপত্তৌ ন জিজ্ঞাস্যং কদাচন।
যদি সর্ববিকারাণাং নামতোঽভি ন্যা ধিষ্ণি।
ন এব দুষ্পিতো দোষঃ সমুত্থান বিশেষতঃ।
স্থানান্তরগতৈশ্চৈব বিকারান্ জনয়েদ্ বহূন্।
তস্মাৎ বিকারপ্রকৃতিরবিষ্টানস্যাপি চ।
সমুত্থানবিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম সমাচরেৎ।"

আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব পাশ্চাত্য মতের প্রাদুর্ভূত রোগগুলি মূলে

হয়। সকলই ত্রিদোষের অন্তর্ভুক্ত। তাই চরক সংহিতাকার বলিয়াছেন- যদা হি অনুক্তি: সর্ব্বজ্ঞ দিন: পরিপচন্ যাং যাত্রাং নাতিবর্ত্ততে" ইত্যাদি। সুতরাং যে কোন রোগই হউক না কেন উহা ত্রিদোষকে অতিক্রম করিবে না। এই জন্যই সুশ্রুত বলিয়াছেন—"যদিযাত্রিকলক্ষণ মন্যোন্যানি ন তৎ কচিৎ।"

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ।"

ইহার পরই আমাদের মনে পড়ে মহাত্মা সুশ্রুতের রোগপ্রশমক শ্লোকটি—

"হেতু ব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্নবিহারানামুপযোগঃ সুখাবহম্।
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধে র্যস্মি স্যাদ্যেন যস্য যঃ।"

বাঙ্গলার অতীত যুগের প্রধানতম কায়চিকিৎসক অধিকন্তু চরক চতুরানন চক্রপাণি দত্তের চিকিৎসাক্ষমতা আমাদিগের জানিবার ও বুঝিবার বিষয়। যাঁহার চিকিৎসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের মনীষী চিকিৎসকগণ চিকিৎসা ব্যাপারে রোগীদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছেন এবং আজিও করিতেছেন আজ আমি তাঁহারই চিকিৎসা ধারার কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা প্রথমেই চক্রদত্ত গ্রন্থে "সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদান পরিবর্জ্জনম্" মহর্ষি সুশ্রুতের এই গবেষণাপূর্ণ মহাবাক্যটি অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাই।

"সমস্তরে দিবাস্বপ্ন স্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্
ক্রোধ-প্রবাতব্যায়াম কষায়াংশ্চবিবর্জ্জয়েৎ।"

শ্লোকে কষায় শব্দটি লইয়া একটী বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, কারণ কষায় শব্দে কষায় রস এবং পঞ্চকষায় উভয়েরই প্রতীতি হইতে পারে, এই সন্দেহ নিরসনের জন্য জতুকর্ণ সংহিতায় আমরা দেখিতে পাই এখানে কষায় শব্দে কষায় রস উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্যথা "কষায়রসস্তত্রস্থিত স্নানাভ্যঙ্গান্নসমস্তরে বর্জ্জয়েৎ।" ইহার পর আমরা

"অন্নে লঙ্ঘনমেবাদাবুপবিষ্টস্তুতে জ্বরে
অজীর্ণিলক্ষণেঽন্নে কায়শোষেঽন্নমোহবৎ।"

ইত্যাদি সংগৃহীত শ্লোক দেখিতে পাই। এখন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে আমরা চেষ্টা করিব। যথাবিধানে নিদানের পরই সম্প্রাপ্তি অর্থাৎ রোগ সূত্রের সম্যক্ প্রাপ্তি। বস্তুত রোগসূত্রের ক্রিয়া-বিশেষই সম্প্রাপ্তি। এই জন্যই রক্ষিত গুরুত সংক্ষেপতঃ নিদানলক্ষণে "সেতিকর্ত্তব্যতাকস্য রোগস্যোৎপাদকহেতুর্নিদানম ইতি" এই লক্ষণটি সম্প্রাপ্তির সঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার কারণ আমরা ইহাই বুঝিয়েছি যথাবিধানে নিদানের সঙ্গে সঙ্গেই সম্প্রাপ্তি প্রাপ্তি হয় এই নিদান ও সম্প্রাপ্তির জ্ঞান "উৎপন্নস্তত্রস্থ রোগস্যাদৌ" প্রতীত হয় এবং এই সম্প্রাপ্তি জ্ঞানই রোগমুক্তির প্রধান কারণ।

লঙ্ঘন শব্দে দশবিধ লঙ্ঘন বুঝাইলেও এস্থলে উপবাসই বুঝিতে হইবে। চক্রপাণি দত্ত ইহার পরই সম্প্রাপ্তির উল্লেখ পূর্ব্বক লঙ্ঘনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

আমাশয়স্থো হ্যাদৌ সামো বাতাদীন্ নিবাপয়ন্
বিদধাতি জ্বরং দেহিনস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ।"

ইহা দ্বারা আমরা বুঝিয়েছি এই চিকিৎসা প্রকরণে সম্প্রাপ্তি জ্ঞানই মহামতি চক্রপাণি দত্তের উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এ বিষয়ে রক্ষিতও আপনার মত ব্যক্ত করিয়া "রোগোঽপি

সম্প্রাপ্তিলক্ষণস্য রোগস্য বিনাশাৎ রোগস্যাপি বিনাশঃ" বলিয়াছেন। "অতে সন্নয়নে বাপৌ ইত্যাদি এই সংগৃহীত শ্লোকটি এমন নিপুণ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যে আশুকৃত জ্বরের সম্প্রাপ্তি হইতে পৃথক বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতে আশুকৃত জ্বরের সম্প্রাপ্তির পৃথক পাঠ—

"অন্নমন্নাভিষাতেন্দ্রো দোষিনাং কুপিতোঽনিলঃ।
পৃথগ্বিধাখিলং দেহং জ্বরয়ত্যাশুসংজ্ঞকম্।"

অতএব আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে আমাশয়োত্থ শারীরক জ্বরে সম্প্রাপ্তিভঙ্গের উদ্দেশেই লঙ্ঘনের আবশ্যক আছে, কিন্তু আশুকৃত জ্বরে লঙ্ঘনের আবশ্যক নাই।

চক্রদত্তে জ্বরের-প্রথমপ্রস্তাবে আমজ্বরে "জ্বরেষু গ্রামদোষস্য কুর্য্যাল্লঙ্ঘনমাদিতঃ" এই বলিয়া সেখানে উপবাস বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভৈষজ্যরত্নেও যুক্তিপূর্ব্বক উল্লিখিত হইয়াছে। "অপক্যামাদৌষজ্বরো লঙ্ঘনমাদৌ কুর্য্যাৎ" এই সম্প্রাপ্তিভঙ্গই রোগমুক্তির লক্ষণ, এজন্য জ্বরের মুক্তি এবং অতিসারের মুক্তি লক্ষণে আমরা সম্প্রাপ্তি ভঙ্গেরই লক্ষণ দেখিতে পাই।

আমরা পূর্ব্বে যে উপবাসের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি উহা রোগপ্রশমনের পক্ষে সাধারণ সূত্র হিসাবে সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আশু প্রতিকার্য্য কোন কোন রোগে প্রথমেই ব্যাধিপ্রত্যনীক চিকিৎসার অত্যাবশ্যক আছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সুশ্রুত হইতে সংগৃহীত চক্রপাণি ধৃত মূর্চ্ছারোগে—"সেকাবগাহৌ জলজঃ সাধারণঃ শীতাঃ প্রলেপা ব্যজনানিলশ্চ। শীতানি পানানি চ সর্ব্বাণ্যু সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাসুনিবারিতানি।"

এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া ব্যাধিপ্রত্যনীক হিসাবে আশু প্রযোজ্য বলিয়া প্রথমেই এই চিকিৎসা বিধি উল্লেখ করিয়াছেন। "সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাসুনিবারিতানি" ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বরাবতি শিবদাসি সেন বলিয়াছেন "বারকক্ষরাদ্যাঃ মূর্চ্ছাস্বপি হেতুপ্রত্যনীকতয়া চিকিৎসাকালে যোজ্যাঃ। এতে শীতবিধয়ো ব্যাধিপ্রত্যনীকতয়া পিত্তানুবন্ধনাত্ত্ব ন যোজনীয়াঃ ইতি তাৎপর্য্যতি।"

সামান্যতঃ ব্যাধিসূত্রের লক্ষণ আমরা দুই ভাবে দেখিতে পাই—প্রকৃতি সমসমবায় ও বিকৃতি বিষম সমবায়,প্রকৃতি সমবায় লক্ষণ সমবেত রোগে প্রায়শঃই রোগক্ষয় কারক ঔষধের প্রয়োজন। রোগের শক্তি অতি প্রবল এইরূপ রোগহরণকারী বীর্য্যশালী ঔষধ সমূহ প্রয়োজ্য।

বিকৃতি বিষমসমবেত রোগে ব্যাধিক্ষয় কারক ঔষধ প্রযোজ্য। এইরূপ ব্যাধিপ্রত্যনীক ঔষধ দিবার আবশ্যক আছে। চক্রদত্তে বাতরক্তাধিকারে ধনপাক বলাতৈলে ঔষধের ঐ তৈলের পাকের ব্যবস্থা দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। টীকাকারও বলিয়াছেন :-

প্রকৃতিসমসমবেতে বাতে তৈলাদিবস্তুক্তেপি বৃংহণ পাকনীর্য্যোৎকর্ষার্থং যুজ্যতএব। বিকৃতিবিষমসমবেতে তু ঘৃতাদিদানের কার্য্যং সংযোজনক্ষেত্রে চিন্ত্যমাণং তথা বিকৃতিবিষমসমবেতে ব্যাধিমধিত্য ব্যাধিপ্রত্যনীক ভেষজং দাতব্যং ইতি কৃত্বা ঘৃতাদিদানের কার্য্যম্।"

কায়চিকিৎসায় রোগপ্রশমনের আরও বহুবিধ আছে, সে সকলগুলি উল্লেখ করিতে হইলে সংহিতাগ্রন্থের অধ্যায়ের পর অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হয়। প্রাচীন যুগে বাঙ্গলার ধন্বন্তরি চক্রপাণি দত্ত বহু উপায়ের মধ্যে যে সকল উপায় আবিষ্কার করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া গিয়াছেন তাহার দিকমাত্র আপনাদিগের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজ
তৈল
বিজ্ঞানাচার্য্য
স্যার জে, সি, বোস দ্বারা
সুপ্রশংসিত
আর্য্য
ঔষধালয়
কলিকাতা-১৭

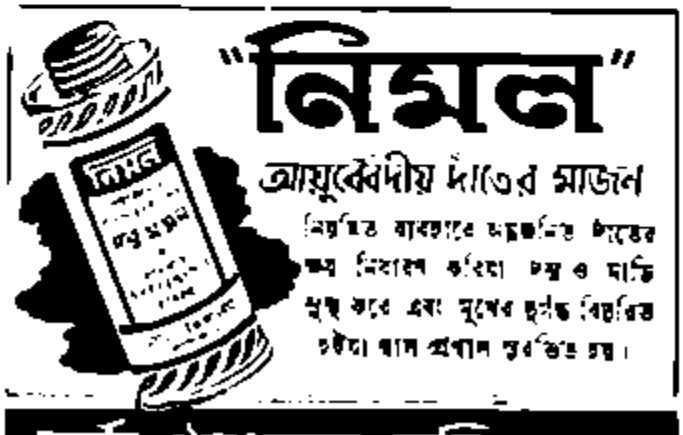
"নিমল"
আয়ুর্ব্বেদীয় দাঁতের মাজন
নিয়মিত ব্যবহারে অল্পদিনে দাঁতের
অস্বাভাবিক কালিমা দূর করে দাঁত
সুন্দর করে এবং মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত
করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস সুরভিত করে।
আর্য্য ঔষধালয়, কলিকাতা-১৭

"ব্লাড্-প্রেসার"

সমস্ত রাত্রি জেগে কেটে গেল। অবশেষে ঘুম ফিরে বেরিয়ে এল,— O sleep, O gentle sleep,

Nature's soft nurse, how have I frighted thee,

That thou no more will weigh mine eye-lids down.

না ঘুমিয়েই রাত্রের শেষ দিক হয়। ঘুম যে একটা রোগ। সারাদিন খাবার কাজ—অফিস, আদালতে তর্কবিতর্ক, মারামারি, তার উপর হাই ব্লাড-প্রেসার। হায় রে ঘুম!

এ চিন্তা ঘুম-হারা লক্ষ লক্ষ মানুষের। তাদের 'ঘুম' ফেরে এক শিশিতে ঘুম। কারণ মাথার উপকারে, বিশেষ করে ব্লাড-প্রেসার উপশমের জন্য নতুন প্রকার ব্যবস্থা করে এই ঔষধ প্রস্তুত। ব্যবহার—

আয়ুর্বেদাচার্য্য এ, এন্, চ্যাটার্জির

"ঘুম"

স্নায়ুকেন্দ্রের শেষ ঔষধ ব্যবহার করুন। ইহা অতিরিক্ত চুল উঠা ও অকালপক্কতা বন্ধ করে নতুন ঘন ও কাল চুল উৎপাদন করে।

প্রস্তুতকারক :

T. G. & CO.

53B, Ultara Road,

Calcutta-9.

প্রাপ্তিস্থান :

A. K. Products.

50, Park Street, Calcutta-17

Phone : 44-6216.

সংক্রামক ব্যাধি!

অত্যাধুনিক পুষ্টিকর খাদ্যাভাবের সমাজ বিনষ্টিতে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে করতে হবে—স্থান দিতে হবে সমাজের বাহিরে।

আর আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যে স্থান পেয়েছে সাধুই গোষ্টির মধ্যে, রোগমুক্ত হচ্ছে-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে।

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরের নব নব আবিষ্কার চিকিৎসা জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় সংক্রামক ব্যাধি ছাড়াও ধবল-কুষ্ঠ, একজিমা, সোরাইসিস্ ও যাবতীয় কঠিন কঠিন চর্মরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হচ্ছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা

১ নং রামপ্রাণ লেন, পুরাণ হাওড়া। ফোন—৬৭—২৩১৯

শাখা—৩১ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

আহারের পর
দিনে দু'বার..

সব খাতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মধু-আসবারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মধু-আসবারিষ্ট হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং সবসময় স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি বহুকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেন চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, শো রা প পা রা রোড, কলিকাতা-৩

ডাঃ রোমেন চন্দ্র ঘোষ, এম-ও, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম.বি.বি.এস, (লণ্ডন), এম.সি.এস, (অষ্ট্রেলিয়া), ভাগলপুর কলেজের বিজ্ঞান শাখের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

ঘরেই চিকিৎসক

বৈদ্যনাথ ঔষধাবলী

বাড়ীতে রাখিলে সময় বিশেষে বহু বহু ডাক্তার-কবিরাজের কাজ করে এবং আকস্মিক রোগে প্রাণ রক্ষা করে।

বৈদ্যনাথ ঔষধাবলী

আপনার স্বাস্থ্য ও বিপদত্তার জন্য সবসময় ঘরে রাখুন।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

শ্রী*বৈদ্যনাথ*

আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিঃ

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ, ৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবরদা কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীমন্ত প্রেস, ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবিশ্বেশ্বর নাথ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত।